বাংলা নাটকে মন্মথ রায়

তত্ত্বাবধায়ক
ড. নূরুর রহমান খান
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপস্থাপক
খাদিজা আক্তার
এম.ফিল. (গবেষক)
রেজিস্ট্রেশন নং–১
সেশন–১/২০০৪-২০০৫
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন-পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, খাদিজা আক্তার কর্তৃক উপস্থাপিত **'বাংলা নাটকে মন্মথ রায়'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ গবেষক, অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নি।

ড. নূরুর রহমান খান
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
ও
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ কথা		
ভূমিকা		পৃ. ৫
প্রথম অধ্যায়	মন্মথ রায় ও ঊনিশ শতকের নাট্যধারা	পৃ. ৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	মন্মথ রায়ের নাট্যকর্ম	
	১ম পরিচ্ছেদ: পৌরাণিক নাটক	পৃ. ৪১
	২য় পরিচ্ছেদ: ঐতিহাসিক নাটক	পৃ.৬৭
	৩য় পরিচ্ছেদ : সামাজিক সমস্যা সম্বলিত নাটক	পৃ. ৮৫
তৃতীয় অধ্যায়	নাটকের গঠন শৈলী	পৃ. ১৪০
	১ম পরিচ্ছেদ : পৌরাণিক নাটক	পৃ. ১৪৯
	২য় পরিচ্ছেদ : ঐতিহাসিক নাটক	পৃ. ১৭৬
	৩য় পরিচ্ছেদ: একাঙ্ক নাটকের উৎস ও পরিচিতি	পৃ. ১৮৬
	৪র্থ পরিচ্ছেদ: বাংলা একাঙ্ক নাটক ॥ মন্মথ রায়	পৃ. ১৯৪
চতুর্থ অধ্যায়	মন্মথ রায়ের নাট্যকর্মে যুগের প্রভাব	পৃ. ২৭০
উপসংহার		পৃ. ২৬৯
গ্রন্থপঞ্জি		পৃ. ২৮৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ কথা

আমার এম.ফিল. অভিসন্দর্ভের শিরোনাম **'বাংলা নাটকে মন্মথ রায়'** এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের (অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক) ড.নূরুর রহমান খান-এর তত্ত্বাবধানে আমি এম.ফিল. কোর্সে নিবন্ধন লাভ করি। বাংলা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক আহমদ কবির এবং অধ্যাপক মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন-এর কাছে এম.ফিল. প্রথম পর্বের কোর্সসমূহ অধ্যয়ন করি।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপরেখা নির্মাণে আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ড. নূরুর রহমান খান-এর নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। তাঁর আন্তরিক, সুচিন্তিত পরামর্শ ও প্রাজ্ঞ নির্দেশনা আমার গবেষণাকর্মকে সহজসাধ্য করে দিয়েছে। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

গবেষণাকালে নানা পর্যায়ে প্রাজ্ঞ পরামর্শ ও মূল্যবান অভিমত দিয়ে অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক প্রমুখ আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। এঁদের কাছে আমি গভীরভাবে ঋণী। তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরি থেকে বিশেষভাবে সাহায্য পেয়েছি এবং গবেষণাকালে এসব গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ-সূত্রে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারিবৃন্দকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সর্বোপরি আমার এম.ফিল. অভিসন্দর্ভের কাজ সম্পাদনে উপর্যুক্ত ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

রবীন্দ্র-পরবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে মন্মথ রায় অন্যতম। তিনি সমকালীন নাট্য আন্দোলনের নির্ভীক নেতা ছিলেন। সত্যনিষ্ঠ সংগ্রামী নাট্য সাধক মন্মথ রায় দীর্ঘ ষাট বছরের বেশি সময় ধরে নাট্য জগতের সাথে যুক্ত ছিলেন। এই বিস্তৃত সময়ের নাট্য ইতিহাসের তিনি এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছেন। প্রধানত মঞ্চ নাটক রচয়িতা হলেও নাটকের সবরকম প্রকাশ-মাধ্যমের সাথে তাঁর স্বচ্ছন্দ্য সংযোগ ছিল। শুধু নাট্য রচয়িতা নন, তিনি একাধারে অভিনেতা, পরিচালক, নাট্য সংগঠক, প্রচারক, নাট্য আন্দোলনের প্রবক্তা ও অবিসংবাদিত নাট্য প্রতিভা বিশেষ।

১৯৪৭ সালের পূর্ব অংশে বাংলা নাটকের যে সমৃদ্ধ ধারা জাতীয় নাট্যামোদী দর্শকশ্রেণিকে গড়ে তুলেছে পুরাণ ইতিহাসের অবলম্বনে রচিত তাঁর নাটকসমূহ সেই ধারারই অন্তর্গত। গিরীশ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই ধারায় নাটক রচনা করেছেন। কিন্তু মন্মথ রায় কখনও আধ্যাত্মিকতা বা ভাবালুতায় আপ্লুত হননি, তাঁর নাটকে ভক্তির জোয়ার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেনি। পুরাণকে অবলম্বন করে দক্ষতার সাথে আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসা, মানুষের মনস্তত্ত্বকে প্রকাশ করেছেন। ঘটনা ও চরিত্র পুরাণ থেকে গৃহীত হলেও ঘটনা-চরিত্রের মাধ্যমে সমকালীন জীবনবোধ, নানাবিধ সামাজিক সমস্যাকে উপস্থাপন করেছেন। এর ফলে পৌরাণিক নাটকের ঘটনা ও চরিত্র দেশ কালের গণ্ডী পেরিয়ে আধুনিক হয়ে উঠেছে। আর একই সাথে কালের প্রবহমানতায় সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। মন্মথ রায়ের নাট্যসমগ্রকে গবেষণার বিষয় হিসাবে নির্বাচিত করার মূলে যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা হলো পুরাণের সংকীর্ণতামুক্ত উদার ব্যবহার। এর ফলে ঐতিহাসিক কাহিনী ও চরিত্র নিয়ে নাটক

রচিত হলেও চরিত্রগুলো মানবিক ও সার্বজনীন হয়ে উঠতে দেখা যায়। সামাজিক নাটকগুলোতে সমাজে বিদ্যমান নানাবিধ সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে। কখনও কখনও নাট্যকার সমস্যার সমাধানের জন্য সহজ ও স্বাভাবিক পথ নির্দেশ করেছেন। মন্মথ রায় রচিত একাঙ্ক নাটকগুলো বাংলা নাট্যসাহিত্যে সার্থক ও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলা যায়। তাঁর নাটকের বিষয় সবসময় গভীর না হলেও নির্মাণের গুণে অভূতপূর্ব দর্শকপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রে তিনি বিচিত্র মানব মনস্তত্ত্বকে উপস্থাপন করেছেন। মূলত বিষয়ের ব্যাপ্তিতে একাঙ্ক নাটকগুলোতে বিভিন্ন দিকের সমাবেশ ঘটেছে। মন্মথ রায় নিজেকে যেমন উজাড় করে তাঁর সকল নাট্যসম্পদ দেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন, কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাকে সম্মান স্বীকৃতি ও সংবর্ধনা দিয়ে তার যৎকিঞ্চিৎ প্রতিদান দিয়েছে।

মন্মথ রায় পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখেছেন সর্বমোট ৫১ টি, একাঙ্ক নাটক ২৭৬ টি, চিত্রকাহিনী ও চিত্রনাট্য বেতার নাটক এবং গ্রামোফোন রেকর্ড নাট্যের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৯, ৪০ এবং ৪০টি। ভাষান্তরিত নাটকের সংখ্যা ১৭ টি। এত বিস্তৃত নাট্যসম্ভার বাংলা নাটকের ইতিহাসে গৌরবজনক বটে। মন্মথ রায় প্রথম সার্থক একাঙ্ক নাটক (মুক্তির ডাক) রচনার গৌরব অর্জন করেন। সর্বোপরি ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক নাটক রচনার মাধ্যমে সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক ঘটনাকে প্রাসঙ্গিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। আর তাই এতটা সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও নাট্যকার মন্মথ রায় প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। সম্পূর্ণ গবেষণাকর্মে নাট্যকার মন্মথ রায়ের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক

জীবনের সাথে তাঁর নাট্যকার জীবনের বিবরণ দেয়া হয়েছে। মন্মথ রায় রচিত বিস্তৃত কলেবরে সমস্ত নাটকের মধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ নাটকের আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণাকর্মে নাট্যকার মন্মথ রায়ের সমগ্র নাট্যকর্মের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক নাটকগুলো আলোচনা করা হল। একাঙ্ক নাটকগুলোর মধ্যে বিশেষ কিছু নাটকের আলোচনা করা হয়েছে। মূলত নাট্যকার মন্মথ রায়ের নাট্যকর্মের ব্যাপ্তি ও গুরুত্বকে তুলে ধরাই মূল লক্ষ্য। এমনকি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে নাট্যকার মন্মথ রায়ের নাটকের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। তাঁর নাট্যকর্মকে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করে এই নাট্য ব্যক্তিত্বকে স্বকীয়তার স্বতন্ত্র স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই এই গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য।

এই গবেষণাকর্মের জন্য বিভিন্নভাবে তথ্য সংগ্রহ ও কাজের অগ্রগতির জন্য সাহায্য নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, নাটক বিষয়ক পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী থেকে বিভিন্ন পুস্তক সংগ্রহ ও তথ্যের জন্য সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। সমগ্র নাট্যকর্মের আলোচনার জন্য অভিসন্দর্ভটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া অবশিষ্ট চারটি অধ্যায়ে নাট্যকার মন্মথ রায়ের জীবন ও কর্মের আলোচনা এবং পূর্ণাঙ্গ নাট্যকর্মের বিশেষ বিশেষ দিক আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

মন্মথ রায় ও উনিশ শতকের নাট্যধারা

গালা-পর্ব (১৮৯৯–১৯০৫)

ক.সূচনা

শিল্পী যখন জলরঙ, তেলরঙ, ক্রেয়ন বা প্যাস্টেলে ছবি এঁকে তার সৃষ্টিকে জীবন্ত করেন, তখন বোঝা যায় ঐটিই তার শিল্পসৃষ্টির সঠিক মাধ্যম। শতাব্দীর সমবয়সী নাট্যকার মন্মথ রায়ের সৃষ্টির ক্ষেত্রটি প্রসঙ্গে কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। সাহিত্যের বিচিত্র বিভাগ থাকা সত্ত্বেও তিনি বেছে নিলেন নাটক–তাঁর প্রথম ও শেষ ভালবাসা। উপলব্ধ জীবনবোধ, দেশপ্রেম, সামাজিক দায় থেকে তিনি একের পর এক একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গের আঙ্গিকে নাটক রচনা করলেন। দীর্ঘ ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি বাংলা নাটক ও প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনকে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন ভাবাদর্শ নিয়ে তিনি বাংলা নাট্যাঙ্গনে আবির্ভূত হলেন এই বিশ্বাস নিয়ে যে নাটক ও নাট্যশালা যদি জাতির চেতন ও অবচেতন মনে ভালোমন্দ সম্পর্কে, অথবা অবনমনের ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে চৈতন্যের জাগরণ না ঘটায়, জাতিকে যদি সংকট–উত্তরণের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত না করে তবে সে নাটক ও নাট্যশালা হয় লক্ষ্যভ্রষ্ট, পথভ্রষ্ট। ধর্মান্ধতা, অজ্ঞতা ও প্রথাবদ্ধতাকে মন্মথ রায় জাতীয় সংকটের মূল কারণ বলে মনে করতেন। আদর্শহীনতা ও নৈতিক মূল্যবোধের অভাব তাঁকে যন্ত্রণা দিত। তাই আজীবন তিনি একই লক্ষ্যে নিজেকে–নিজের সৃজনশীলতাকে স্থিত রেখেছেন। ১৮৯৯ থেকে ১৯৮৮ সাল–এই দীর্ঘ সময়কাল জুড়ে যাঁর পদচারণা,

প্রাচীন ও আধুনিকের মেলবন্ধনকারী হিসাবে যিনি চিহ্নিত, তাঁর নাট্যকার হয়ে ওঠার বিষয়টিকে ঘিরে তরঙ্গায়িত হচ্ছে নানা জিজ্ঞাসা–অবশ্যই ঐতিহ্যবাহিত নাট্যনির্মাণের ধারাটিকে কেন্দ্রে রেখেই।[১]

খ. জন্মস্থান, বংশ ও পারিবারিক পরিচয়

মন্মথ রায় বঙ্গাব্দ ১ আষাঢ় ১৩০৬, ইংরেজি ১৬ জুন ১৮৯৯, বৃহস্পতিবার, ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত গালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[২] অবিভক্ত বাংলাদেশে ময়মনসিংহ সবচেয়ে বড় জেলা ছিল। ওই জেলার নদনদী ও পাহাড়বেষ্টিত মানুষের জীবন উদ্দাম ও উদ্ধত, বেনিয়মী ও বেপরোয়া ছিল। জেলার বিল, হাওড়, পলিমাটি ও উপত্যকার মধ্যে প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্য-সমারোহ, তারই পটভূমিতে গান, কবিতা, গীতিকা, যাত্রাপালা–তেজস্বিনী মহুয়া, দুঃখময়ী মলুয়া, প্রেমের ব্রতচারিণী চন্দ্রাবতীর কথা রচিত হয়েছিল। হয়তো মন্মথ রায়ের বাল্যস্মৃতিতে চরিত্রগুলি গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। তাই দেখতে পেলাম তিনি তাঁর নাটকে মহুয়ার নবরূপ দিয়েছেন। তাঁর নিজস্ব বাক্‌ভঙ্গিতে ময়মনসিংহ জেলার ভাষা-উচ্চারণের ঝোঁক রয়েছে। নদীপ্রধান জেলার প্রমত্ত বন্যা প্লাবন ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর নাটকে (‘বন্যা, একাঙ্ক–উদ্ধার), কৃষিপ্রধান অঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষের জীবনচিত্র ‘চাষীর প্রেম, ‘লাঙল’ প্রভৃতি নাটকে প্রকাশ পেয়েছে। যে মাটি ও মানুষকে তিনি ছেড়ে এসেছিলেন শৈশবে তাদের অস্পষ্ট,স্বপ্নময় স্মৃতি তাঁর অন্তরকে সুবাসিত করে রেখেছিল এবং তাঁর সৃষ্টিকর্মে তারা বারবার প্রত্যক্ষ হওয়ার চেষ্টা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

গালা গ্রামের তিনমাইল দক্ষিণে টাঙ্গাইল শহর, পূর্বদিকে নদী, পশ্চিমে লোকাল বোর্ডের রাস্তা। নদীর পাড়ে বারোয়ারি কালীবাড়ি। রায়বাবুরা কালীভক্ত ছিলেন। মন্মথ রায় স্বয়ং আজীবন কালীভক্ত ছিলেন। কালীপূজা উপলক্ষে উৎসব ও যাত্রাগান হত, সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এতে যোগদান করত। গ্রামের উর্বর মাটিতে সারা বছরই ফসল হত। নৌপথ যাতায়াতের প্রধান উপায় ছিল। তবে ঘোড়া, ডুলি ও পালকির ব্যবহারও ছিল।

সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে গ্রামটির পত্তন হয়। গ্রামের মধ্যে ছোট-বড় দুটি দিঘি ছিল। বড় দিঘিটির উত্তর-পূর্ব কোণে রায়-পরিবারের বসতবাড়ি অবস্থিত ছিল। শিক্ষাদীক্ষা, সম্পদ, আভিজাত্য ও জনহিতকর কাজকর্মে রায়-পরিবারের প্রধান ভূমিকা ছিল। গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমোর, ছুতোর, তিলি ও জোলা ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ের লোক বাস করত। গ্রামের কালীবাড়ি, পাঠশালা ও ডাকঘর সবই রায়-পরিবারের দানে ও উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গ্রামের পাঠশালায় মন্মথ রায় ছ-বছর বয়স পর্যন্ত পড়াশোনা করেন।

রায়-পরিবারের পূর্বপুরুষ রামসেন মল্লভূমি-নিবাসী ছিলেন। রামসেনের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ সহস্রাক্ষ রায় ও তাঁর ভাই জটাধর সেন পাবনা জেলার গণের গতি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। জাতিতে বৈদ্য, সম্ভবত মুসলিম শাসনকর্তাদের কাছ থেকে রায়-পরিবার রায় পদবি পেয়েছিলেন। জটাধরের পুত্র মধুসূদন গণের গতি গ্রাম থেকে এসে টাঙ্গাইলের তিন মাইল উত্তরে গালা গ্রামে বাস করতে থাকেন। সম্ভবত কলেরা-মহামারী থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যেই তিনি সপরিবারে নিজেদের গ্রাম ত্যাগ করে গালায় এসে বসবাস শুরু করেন। মন্মথ রায় মধুসূদন রায়ের অধস্তন একাদশ পুরুষ ছিলেন।

মধুসূদন রায় গণের গতি গ্রামের কলেরার আক্রমণে বিপন্ন লোকেদের নিয়ে এসে টাঙ্গাইলের তিন মাইল উত্তরে যে নতুন বসতি স্থাপন করেন সে জায়গার নাম দেওয়া হল গালা গ্রাম। মধুসূদন ও তাঁর বংশধরের উদ্যোগে ও বদান্যতায় গালা ক্রমে ক্রমে একটি জনবহুল উন্নত ও সমৃদ্ধ গ্রামে পরিণত হয়। গ্রামের অনেকেই উচ্চশিক্ষা লাভ করে সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সংস্কৃত ও ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপক চর্চা ছিল। উৎসবে আনন্দমুখর গ্রামে দুর্গোৎসব ও চৈত্রোৎসবই প্রধান উৎসব ছিল। উৎসব উপলক্ষে সং ও অভিনয়ের প্রচলন ছিল। যাত্রাভিনয় উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। রামগতি রায় মধুসূদনের অষ্টম বংশধর ছিলেন। রামগতির পুত্রের নাম গুরুগতি (স্ত্রী বরদাসুন্দরী)। গুরুগতির পুত্র হলেন দেবেন্দ্রগতি (স্ত্রী সরোজিনী)। দেবেন্দ্রগতির এক পুত্র ও চার কন্যা। পুত্র মন্মথ রায় সকলের জ্যেষ্ঠ (স্ত্রী চিত্রলেখা), চার কন্যা–অমিয় (স্বামী প্রমথ গুপ্ত), জ্যোৎস্না (স্বামী সত্যপদ), ঊষারাণী (স্বামী ভূপেন্দ্রমোহন দত্তগুপ্ত), লীলা (স্বামী অমল দে)।

মন্মথ রায় ও চিত্রলেখা রায়ের পুত্রকন্যারা হল জয়ন্তী–ডাকনাম ফুল (স্বামী-সচ্চিদানন্দ রায়), প্রদীপ (স্ত্রী মিত্রা), চন্দন রায় (স্ত্রী কল্যাণী), কুমকুম (স্বামী বিশ্বরঞ্জন দাশগুপ্ত)।

পিতামহ গুরুগতি পুলিশের সাব ইন্সপেক্টার এবং পরে ইন্সপেক্টার হয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘদেহ, বলিষ্ঠগঠন, ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ ছিলেন। দারোগার পদে উপযুক্ত চেহারার মানুষ। তাঁর স্ত্রী বরদাসুন্দরীও স্বাস্থ্যবতী, দীর্ঘাঙ্গী ও সুদর্শনা ছিলেন। তিনি বীর স্বামীর যোগ্য বীরজায়া ছিলেন। স্বামীর মতো তিনি বন্দুক ছুঁড়তেও পারতেন। এই বরদাসুন্দরীর নামেই বালুঘাটে রায়-পরিবারের

বাড়ির নাম বরদাভবন রাখা হয়েছিল। বালুরঘাটে লেখা মন্মথ রায়ের সব নাটকে বরদাভবন নামটি লেখা থাকত।

মন্মথ রায়ের পিতা দেবেন্দ্রগতিও দীর্ঘকায়, পৌরুষদৃপ্ত, বলশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি এফ.এ. পর্যন্ত পড়েছিলেন, সাহিত্যের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। তিনি বালুরঘাট শহরের উত্তরে মাহীনগর গ্রামে একটি জমিদারি এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। পুরাতত্ত্বের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল, তিনি মূল্যবান অনেক প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলি পরে বরেন্দ্র গবেষণা-সমিতিকে দান করেন। তিনি দীর্ঘকাল বালুরঘাট কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন এবং স্থানীয় বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বালুরঘাটের বাড়িটি তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। মন্মথ রায়ের মা সরোজিনী রায় এক অসামান্যা নারী ছিলেন। রায়-পরিবারের ছেলেদের মতো মেয়েদেরও সমান যত্নের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হত। সরোজিনী দেবী যেমন ধর্মপরায়ণা তেমনই বিদ্যানুরাগী ছিলেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। দেবেন্দ্রগতি স্ত্রীকে নানা বই উপহার দিতেন। সেগুলি তিনি আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন এবং সযত্নে রেখে দিতেন। তিনি কবিতা লেখাতেও পারদর্শিনী ছিলেন। রান্নাঘরে তাঁর কবিতার খাতা থাকত, রান্নার ফাঁকে ফাঁকে কবিতা রচনা করতেন। মন্মথ রায় অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। তিনি বলতেন, নাটক লেখার অনুপ্রেরণা তিনি মায়ের কাছ থেকে পেয়েছেন। প্রতি দিন ঈশ্বর-উপাসনার পর মাকে প্রণাম করতেন এবং তাঁর আশীর্বাদ নিয়েই সর্বত্র যেতেন। মৃত্যুর আগে তিনি বলেছিলেন,“ মা এসে গেছেন আর চিন্তা নেই।”

মন্মথ রায়ের পরবর্তী বোন অমিয় (টুলু) বিয়ের পরে অকালে মারা যান। তাঁর পরের বোন জ্যোৎস্না (পটোল) মায়ের মৃত্যুর পরে পরিণত বয়সে মারা যান। তৃতীয় বোন ঊষারাণী দত্তগুপ্ত এক জায়গায় লিখেছেন,"মা মারা গেলে দাদা ভীষণ অস্থির হ'য়ে পড়েছিলেন। দাহ কাজ সম্পন্ন হবার পর দাদা-বৌদি আর আমরা তিন বোন সে রাত্রি একসাথে কাটিয়ে ছিলাম। ১৯৬৩ সালের ২৫ আগস্ট দাদা বলেছিলেন, "এই রাত্রি অবিস্মরণীয়। মা নেই, আমরা আছি। আমরা যে যতদিন বাঁচবো, এ রাত্রি আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।" মন্মথ রায় আগে যে বাড়িতে সপরিবারে থাকতেন (৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট) সেই বাড়িটি তিনি বোন ঊষারাণীকে দিয়ে নিজে তাঁর পরিবার নিয়ে বিবেকানন্দ রোডের বাড়িতে চলে যান। মন্মথ রায়ের সবচেয়ে ছোট বোন লীলাকে নিজের হাতে মানুষ করে তুলেছিলেন এবং তাঁর অশেষ স্নেহের পাত্রী এই বোনকে বিদেশে উচ্চতম শারীরশিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন এবং পরে উচ্চ সরকারি পদে নিযুক্ত হতে সাহায্য করেছিলেন। সেই সময়ে (১৯৪৭) খুব কম বাঙালি মহিলাই বিদেশে এরূপ শিক্ষা লাভ করে এ ধরনের বিশিষ্ট পদে নিযুক্ত হয়েছেন। লীলা রায় (পরে দে) কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে আমেরিকার সল্ট লেক সিটি ঊটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরশিক্ষা বিষয়ে পাঠ শেষ করে MS অর্থাৎ Master of Science উপাধি লাভ করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি মাদ্রাজ সরকারের অধীন শারীরশিক্ষার পরিদর্শিকার পদে নিয়োগপত্র পেলেন। কিন্তু ডা. বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন শারীরশিক্ষা বিভাগ খুলে লীলা রায়কে পরিদর্শিকার পদে নিযুক্ত করলেন। বর্তমানে আমেরিকাবাসী লীলা দে দাদা মন্মথ রায় সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি আমাকে মাতৃস্নেহ, পিতৃস্নেহ ও ভ্রাতৃস্নেহ দিয়ে লালন পালন করেছেন।"

মন্মথ রায়ের স্ত্রীর আসল নাম ছিল তপোবালা। তিনি নাম দিয়েছিলেন চিত্রলেখা, ডাকতেন 'লেখা' বলে। আকৃতি ও প্রকৃতিতে তিনি স্বামীর বিপরীত চরিত্রের ছিলেন। তিনি হ্রস্বকায়া, মৃদুভাষী, অন্তর্মুখীন ও অবগুণ্ঠিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর উচ্চনাদী, উচ্ছ্বাসপ্রবণ ও মাতোয়ারা স্বামীকে অলক্ষিত স্থান থেকে নিরন্তর সেবাযত্নে আগলে রাখতেন, সংসারের সকল প্রকার কাজে প্রাণ ঢেলে দিতেন, আর স্নেহ ও মাধুর্যের অকৃপণ দানে সকলকে ভরিয়ে রাখতেন। মন্মথ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রদীপ মায়ের সম্বন্ধে লিখেছেন, "আমার মা ছিলেন অত্যন্ত পরোপকারী। মানুষকে সেবা দিয়ে, আনন্দ দিয়ে তিনি পরিতৃপ্ত হতেন।" এই সাধ্বী, পূণ্যবতী নারীর শেষদিনগুলি বড় কষ্টের ছিল। পর্বতচূড়ার মতো স্বামী অন্তর্হিত, গুরুতর রোগের আক্রমণে পঙ্গু হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে সব জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলেন। মন্মথ রায়ের সন্তানদের মধ্যে মেয়ে জয়ন্তী সবচেয়ে বড় ছিলেন। তার ডাকনাম ফুল। একসময়ে মন্মথ রায়ের আর্থিক অনটনের অবস্থায় জয়ন্তী সংসারের হাল ধরেছিলেন। মন্মথ রায় বলতেন জয়ন্তী ফুল নয় ফল জোগাচ্ছে, আদর করে তাকে ফলবাবা বলে ডাকতেন। জয়ন্তীর পরে বড় ছেলে প্রদীপ, থাকতেন কল্যাণীর বাড়িতে। ছোট ছেলে সুদর্শন, সুঅভিনেতা চন্দন বাবার কাছে থাকতেন, বাবার সকল কাজকর্মে তিনি সাহায্য করতেন। তাঁর স্ত্রী কল্যাণীও অভিনয়কুশলী এবং সঙ্গে সঙ্গে নিপুণ হাতে সংসারের সকল কাজকর্ম চালিয়েছেন। স্বামীর অকালমৃত্যুর পর সংসারের সব দায়িত্বই তাঁকে পালন করতে হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত শ্বশুর মহাশয়কে তিনি সব সময় আদর-যত্নে ও স্নেহের শাসনে আগলে রেখেছিলেন, রোগবিধ্বস্ত অসহায় শাশুড়িকে

প্রাণঢালা সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন। ছোট মেয়ে কুমকুম সম্পর্কে দাদা প্রদীপ লিখেছেন, "অনুজা কুমকুম...পরিবারের সকলের প্রতি সমান নজর দিয়ে আমাদের মায়ের অভাব সে ভুলিয়ে রাখে।"

মন্মথ রায়ের পারিবারিক বৃত্তটির পরিচয় দিয়ে এবার আমরা ফিরে যাব তাঁর আদি বাসস্থানে অর্থাৎ গালা গ্রামে। এই গ্রামেই তাঁর শৈশবের ছ'টি বছর কেটেছিল। গ্রামের পাঠশালায় তিনি ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানে যেমন তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ হয়েছিল, তেমনই শিক্ষার সঙ্গে শরীরচর্চাও শুরু হয়েছিল। পাঠশালায় বিদ্যাচর্চা ও শরীরচর্চা সমানভাবে চলত। ছোটবেলা থেকে নিয়মিত শরীরচর্চা করেছিলেন বলেই তিনি এরূপ দীর্ঘাকৃতি দৃঢ় দেহের অধিকারী হয়েছিলেন।

রায়বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপের সামনের প্রশস্ত প্রাঙ্গণটি গ্রামের সকল আনন্দোৎসবের প্রাণকেন্দ্র ছিল। সেখানে যাত্রা-নাটক, কবিগান, মনসার ভাসান, চৈতিগাজন উৎসব, নাচগান, সং সব ধরনের অনুষ্ঠানই হত। এই প্রাঙ্গণেই নাট্যকারের ছ-বছর বয়সে থিয়েটারের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল 'বাংলার সাধারণ মঞ্চ ও আমি' প্রবন্ধে তারই বর্ণনা তিনি করেছেন। তিনি লিখেছেন, "গালাতে আমাদের পুরোহিত-বংশের শ্রীযুক্ত সুরেন ঠাকুর কলকাতার শ্যামাদাস কবিরাজের ছাত্র ছিলেন। ছুটিতে গালাতে এসে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিসর্জন নাটকের অভিনয় করার জন্য মেতে উঠলেন। আমার কাকা তাঁর প্রাণের বন্ধু ছিলেন। ঠিক হল আমাকে অভিনয় রাত্রে ধ্রুব সাজানো হবে। প্রায় সত্তর বছর আগে গালার মত একটা ক্ষুদ্র গ্রামে বাঁশ আর তক্তা দিয়ে মঞ্চ বেঁধে থিয়েটার হতে যাচ্ছে, না যাত্রা নয়, একটা সম্পূর্ণ নতুন জিনিস থিয়েটার। এতে গোটা অঞ্চলের লোক মেতে উঠল।" বালক ধ্রুব তার পিতামহী বরদাসুন্দরীর কোলে ছিল। তিনি তার কাছে শুনেছিলেন, ধ্রুবকে বলি দেওয়া হবে, তাই

কিছুতেই তাকে কোল থেকে নামাবেন না। সকলে তাঁকে বোঝালেন, এটা অভিনয়, শুধু খেলা। তিনি হয়তো বুঝলেন, কিন্তু যখন ধ্রুবর অভিনয়ের সময় হল তখন সে ঘুমে অচৈতন্য। তাই ধ্রুবর ভূমিকা পেয়েও শেষ পর্যন্ত শিশু অভিনেতা মঞ্চে অবতরণের সুযোগ আর পেল না। পরবর্তীকালে যিনি নাটক ও থিয়েটারে মগ্ন হয়েছিলেন এভাবেই থিয়েটার ও অভিনয়ের সঙ্গে শিশু অবস্থায় তাঁর নিজের গ্রামে প্রথম পরিচয় ঘটল।

মমতাময়ী জন্মস্থান, শৈশবের লীলাভূমি শিশু অবস্থাতেই ছাড়তে হল। যে গ্রাম পত্তন করেছিলেন রায়-পরিবার শিক্ষাদীক্ষা, উন্নত চিন্তাভাবনা ও আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে যে গ্রামটিকে তাঁরা প্রগতিশীল ও প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন সেখান থেকে রায়-পরিবারের একটি অংশ অন্যত্র চলে গেলেন, তার কারণ কী? মন্মথ রায় বলেছেন, "ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে গালা ছেড়ে আমার পিতা-পিতামহ যখন আমাকে নিয়ে চিরতরে বালুরঘাটে চলে আসেন, তখন আমার বয়স বছর ছয়েক।" ম্যালেরিয়ার প্রকোপ গ্রাম ছাড়ার একটি কারণ হতে পারে, কিন্তু আরও কারণ আছে। যতদিন মানুষ ভূমিস্বত্ব ও কৃষির উৎপাদনের উপর নির্ভর করে থাকে ততদিন গ্রামের সঙ্গে তার সম্পর্ক অটুট থাকে। কিন্তু যখন জমির আয় থেকে ক্রমবর্ধমান পরিবারের আর চলে না, তখন পরিবারের শিক্ষিত লোকেরা শহরে কিংবা জনবহুল শিল্প অথবা বাণিজ্য কেন্দ্রে চাকরিতে নিযুক্ত হয়ে পড়েন। ক্রমেই তাঁদের পরিবার চাকুরি স্থলে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে সকল সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবেশে নতুন বাসগৃহ নির্মিত হয়। গ্রামে হয়তো বছরে একবার কী দুবার যাওয়া হয়, তারপর তাও বন্ধ হয়ে যায়। অযত্নে অনাদরে মেরামতের অভাবে বাড়িগুলি জীর্ণ ভগ্নস্তুপে পরিণত হয়।

এইভাবে বাংলার গ্রামগুলি শ্মশানে পরিণত হয়। রায়-পরিবার বালুরঘাটে গেল কেন ? তার কারণ, মন্মথ রায়ের পিতা দেবেন্দ্রগতি রায় বালুরঘাট শহরের উত্তর উপকণ্ঠে সাহীনগরে কাছারির ম্যানেজার নিযুক্ত ছিলেন। বালুরঘাটে তিনি একটি বাড়িও নির্মাণ করেছিলেন। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে দেবেন্দ্রগতি অবসরপ্রাপ্ত পিতা গুরুগতি, মাতা বরদাসুন্দরী, স্ত্রী সরোজিনী এবং ছ-বছরের পুত্র টুকুকে (মন্মথ রায়) বালুরঘাটে নিয়ে আসেন। জন্মভূমি গালা গ্রাম থেকে কৈশোর ও যৌবনের কর্মভূমি বালুরঘাটে মন্মথ রায়ের জীবন স্থানান্তরিত হল। এই বালুরঘাট-পর্বে তাঁর শিক্ষা, কর্মজীবন এবং উজ্জ্বলতম নাট্যজীবন শুরু হল।

বালুরঘাট-পর্ব (১৯০৫-১৯৩৮)

ক.স্কুলে শিক্ষালাভ

মন্মথ রায় বালুরঘাট স্কুলে পড়া শুরু করলেন। তাঁর অধ্যয়নস্পৃহা ছিল প্রবল এবং নিজের উপরে আত্মবিশ্বাসও প্রচুর ছিল। প্রতি বছর ক্লাসে প্রথম হতেন। তাঁর পিতা খুশি হয়ে তাঁকে একটি গরদের কোট দিয়েছিলেন। পরে তাঁর বিদ্যোৎসাহী বাবা দ্বিতীয় আর-একটি পুরস্কার দিয়েছিলেন। সেটি হল একটি বাইসাইকেল। মহা খুশি হয়ে তিনি বন্ধুদের নিয়ে সেই সাইকেলে চড়ে বেড়াতেন।

কিন্তু মন্মথ রায়ের পড়ার নেশা শুধু কয়েকখানি পাঠ্যবইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর বাবা তাঁর মাকে অনেক বই উপহার দিতেন। বালক মন্মথ রায় লুকিয়ে লুকিয়ে সেসব বই পড়তেন। নাটকের বই-ই বেশি পড়তেন। তিনি নিজেই বলেছেন, "ঐ বয়সেই থিয়েটারের সব নাটক লুকিয়ে

লুকিয়ে পড়তে শুরু করেছিলাম। পড়েছিলাম গিরিশ গ্রন্থাবলীর নাটকগুলি, রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকগুলি, অমৃতলাল বোস-এর নাটকগুলি, এবং হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের যাত্রাপালাগুলো।" কিন্তু নভেল-নাটকের প্রতি অত্যধিক অনুরাগের জন্যে পাঠ্যবইয়ের প্রতি অবহেলা ঘটল। ফলে পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হল না। তাঁর নিজের কথায়, "কিন্তু বাবা মা দুজনেই হঠাৎ ক্ষান্ত হয়ে গেলেন সেইদিন যেদিন দেখা গেল, স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেও প্রত্যেক বিষয়ে আমি দ্বিতীয় হয়েছি। লুকিয়ে নাটক নভেল পড়াই এর একমাত্র কারণ–যেই সেটা তাঁরা বুঝলেন, নাটক-নভেল মা'র বাক্সবন্দী হয়ে গেল। ১৯১৭-তে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সকলে আশা করেছিলেন মন্মথ রায় স্কলারশিপ পাবেন, কিন্তু তিনি পেলেন না, পেল যে সব পরীক্ষায় দ্বিতীয় হত। বাবা বললেন, "এ যে হবে আমি জানতাম। পড়ার বই না প'ড়ে থিয়েটারের বই পড়লে এমনি যবনিকাই পড়বে।"[৩]

খ. অভিনয় ও থিয়েটারের সঙ্গে প্রাথমিক যোগ

থিয়েটারের বই শুধু পড়া নয়, বালুঘাটে ছাত্রাবস্থায় থিয়েটারের সঙ্গে মন্মথ রায়ের প্রত্যক্ষ যোগ ঘটে। তিনি যখন অষ্টম কী নবম শ্রেণিতে পড়তেন তখন হেডমাস্টার পণ্ডিত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর নির্দেশে স্কুলে ডাকঘর নাটকে অমলের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৯১৩-১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে একটি স্কুলে সাংকেতিক নাটক ডাকঘর অভিনীত হচ্ছে–এই ঘটনার মধ্য দিয়ে স্কুলের কর্তৃপক্ষ ও দর্শকের প্রগতিশীল নাট্যচেতনার পরিচয়ই পাওয়া যায়।

মন্মথ রায়ের কৈশোরকালে বালুরঘাট থিয়েটারের প্রতি বড়ো বেশি আকর্ষণ ছিল। যুবক ও মধ্যবয়সিদের যাঁরা থিয়েটার নিয়ে খুব উৎসাহী ছিলেন তাঁদের মধ্যে আশুতোষ, চিন্তাহরণ

মুখোপাধ্যায়, ক্লারিয়োনেট বাদক মতিলাল মুখোপাধ্যায়, উকিল রাধাচরণ ভট্টাচার্য, মোক্তার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মুহুরি সুরেন্দ্রনাথ সেন–মন্মথ রায় এসব ব্যক্তির নাম করেছেন। পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ওখানকার শ্রেষ্ঠ উকিল নলিনীকান্ত অধিকারী, তাঁর পিতৃদেব দেবেন্দ্রগতি রায় প্রমুখ ছিলেন। বালুরঘাট থেকে বাইরে গিয়ে কলেজে পড়ার সময়েও বালুরঘাটের নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে তাঁর পুরোপুরি যোগ ছিল। শুধু অভিনয় নয়, এই বালুরঘাটেই নাটক লেখার চেষ্টাও শুরু হয়েছে। বক্তিয়ার খিলজি কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাহিনী অবলম্বনে লিখলেন 'বঙ্গে মুসলিম' বহু দৃশ্যসমন্বিত পাঁচ অঙ্কের নাটক। এ নাটকটি অভিনয় হতে পাঁচ-ছ'ঘণ্টা সময় লেগেছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য মন্মথ রায় তাঁর একাঙ্ক নাটকের পক্ষে যুক্তি দেয়ার জন্যেই এই দীর্ঘকালীন পঞ্চাঙ্ক নাটকের বিরোধিতা করেছিলেন। তবে এ ধরনের নাটক যে তিনি পরিহার করেছিলেন তা নয়। দেবাসুর, কারাগার, সাবিত্রী, অশোক ইত্যাদি প্রসিদ্ধ নাটকগুলিই তো পাঁচ অঙ্ক ও অঙ্কের অন্তর্গত বহু দৃশ্যযুক্ত নাটক।

গ. কলেজে শিক্ষালাভ

প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে মন্মথ রায় রাজশাহী কলেজে আই.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। সেখানে পড়বার সময় 'পাণ্ডব গৌরব' নাটকে দণ্ডীরাজের ভূমিকায় অভিনয় করে প্রশংসা পেলেন। প্রথম বিভাগে আই.এ. পাস করলেন। এরপর কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হলেন।

১৯২৯ সালে মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল। বাবা নিষেধ করেছিলেন, পরীক্ষা বর্জন করে অসহযোগ আন্দোলনে যেন জড়িয়ে না পড়েন। তিনি পরিবারের একমাত্র ছেলে, তাঁকে তো ভবিষ্যতে রোজগার করতে হবে। কিন্তু প্রথম দিন পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখলেন, অশ্বারোহী মিলিটারি

সৈন্যরা সেনেট হাউসের সামনে মেয়ে পিকেটারদের উপর হামলা চালাচ্ছে। তখন আর তিনি বাবার নির্দেশ মানতে পারলেন না। বইপত্র ছুঁড়ে ফেলে মহাত্মা গান্ধি কি জয় বলে পিকেটারদের সাথে শামিল হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে নেমে পড়লেন। পূর্ণোদ্যমে ভারত সেবক সংঘের সভ্য রূপে তিনি দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

কিন্তু ওই বছর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে গান্ধিজির প্রতিশ্রুত স্বাধীনতা এল না। তখন বাধ্য হয়ে তিনি সুভাষচন্দ্র ও অন্য দেশনেতাদের চালিত গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন থেকে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাস করেন।

বি.এ. পাস করার পর তিনি সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। তিনি জগন্নাথ হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ড.নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ছিলেন। তখন মন্মথ রায় খেলাধুলা ও ব্যায়ামচর্চা নিয়েই বেশি মেতে ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলা ও শরীরচর্চার অভ্যাস ছিল বলেই তিনি বলিষ্ঠ শরীরের অধিকারী ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাথলেটিক বিভাগের সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টস ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকও নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে যিনি নাট্য-আন্দোলনের নেতা রূপে নাট্যকর্মীদের চালিত করেছিলেন, ছাত্রাবস্থায় ছাত্রদের নেতারূপেই তাঁর আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ঠিক হল যে জগন্নাথ হলের ছাত্ররা থিয়েটার করবে। প্রভোস্ট ড. সেনগুপ্ত বললেন, "নিজেরা নাটক লিখে সেই নাটক অভিনয় করো।" মন্মথ রায় প্রলোভন ত্যাগ করতে পারলেন না। ইতিপূর্বে লিখিত ও অভিনীত 'বঙ্গে মুসলমান' নাটকের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল।

সেজন্য সেদিকে আর গেলেন না। একটিমাত্র অঙ্কে সীমাবদ্ধ দেড় ঘণ্টার অভিনয়যোগ্য একটি নাটক 'মুক্তির ডাক' তিনি লিখে ফেললেন। অ্যাথলেটিক সেক্রেটারি নাটক লিখেছেন শুনে ড.সেনগুপ্ত ঠাট্টা করে বললেন, "ফুটবলের নাটক নাকি ?"[৪]

নরেশ সেনগুপ্ত নাটকটি পড়ে বললেন, সব ছাত্রই অভিনয় করতে চায়, সুতরাং এত কম চরিত্রের নাটক দিয়ে তাদের খুশি করা চলবে না। তবে তিনি আশ্বাস দিলেন, কলকাতায় গিয়ে নাটকটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশ করবার জন্যে চেষ্টা করবেন। ১৯৩২ সালেই বালুরঘাটে গিয়ে কল্‌হনের রাজতরঙ্গিণীর কাহিনী অবলম্বনে 'দেবদাসী' নামে একটি একাঙ্ক নাটক লিখলেন। ১৯২৩ সালে জগন্নাথ ড্রামাটিক অ্যাসোসিয়েশন চন্দ্রশেখর-এর নাট্যরূপ ও দেবদাসী ২১ ও ২২ ডিসেম্বর অভিনয় করেন। 'দেবদাসী'তে মন্মথ রায় বিনয়াদিত্যের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ড.সেনগুপ্ত নাট্যকারকে আশ্বস্ত করে বললেন, "নাটকটি 'ভারতবর্ষ'–পত্রিকায় প্রকাশ করা হল না কারণ আর্ট থিয়েটারের ডিরেক্টর হরিদাস চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, তাঁরা নাটকটি বড়দিনের ছুটিতে স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ করবেন।"[৫]

যথাসময়ে 'মুক্তির ডাক' স্টারে অভিনীত হল। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী স্বয়ং পরিচালনা করলেন। কৃষ্ণভামিনী, নীহারবালা প্রমুখ স্টারের শ্রেষ্ঠ শিল্পীবৃন্দ অভিনয় করেছিলেন। তখন সকল থিয়েটারের মধ্যে স্টারের আকর্ষণই বেশি ছিল। এতদসত্ত্বেও নাটকটি চলল না। নাট্যকারের উক্তি, "অভিনয় চমৎকার, সাজসজ্জা নিখুঁত, শুধু দর্শকদের সাড়া মিলছে না। অধিকাংশ দর্শকই বলছেন, এ আবার কি নাটক, এল আর গেল!" নাট্যকার স্বীকার করলেন, চাঁর, পাঁচ ঘণ্টার নাটক দেখতে অভ্যস্ত দর্শকবৃন্দ

দেড় ঘণ্টার নাটক নিতে পারছেন না। অর্থাৎ 'বঙ্গে মুসলমান' নাটকের অভিনয়ের সময় দর্শকদের সম্পর্কে নাট্যকারের যে ধারণা হয়েছিল তা ভ্রান্ত নয়। দর্শকরা তখন দীর্ঘকালস্থায়ী নাটকই চাইত। স্টারের সেক্রেটারি প্রবোধচন্দ্র গুহ হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে ঠিক কথাই বলেছিলেন "এ যুগের নাটক এটা নয়।" হরিদাস চট্টোপাধ্যায় নাট্যকারকে আশ্বস্ত করে বললেন, "তিনি নাটকটি ছেপে দিচ্ছেন।" নাটকটি ছাপা হলে অনেকেই তার প্রশংসা করলেন। তখনকার দিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও সমালোচক প্রমথ চৌধুরী নাট্যকারকে লিখলেন, "আপনি শুনে খুশি হবেন যে, মুক্তির ডাক আমার খুব ভালো লেগেছে। আপনার নাটকখানির মহাগুণ এই যে, এখানি যথার্থই একখানি ড্রামা।"[৬] প্রমথ চৌধুরীর এই প্রশংসাপত্র নাট্যকারের পিতার মনেও পুত্র সম্পর্কে বিশ্বাস জাগাল। এতদিন পুত্রের নাট্যচর্চায় বিরক্ত ছিলেন। এখন তিনি যেন পুত্রের জন্যে গর্ববোধ করলেন, চিঠিটা পড়ে নাট্যকার–পুত্রকে ডেকে বললেন, "তা-না-হ্যাঁ-তুমি লিখে যাও।" পিতার সম্মতি পুত্রের প্রাণে অনেকখানি উৎসাহ এনে দিল, সন্দেহ নেই। জগন্নাথ হল থেকে প্রকাশিত বার্ষিকী 'বাসন্তিকায়' তাঁর নাটক 'সেমিরেমিস' প্রকাশিত হল । নাট্যকার এটিকে একাঙ্ক নাটক বলেছেন, কিন্তু তিন অঙ্কের এই নাটকটি একাঙ্ক নয়, পূর্ণাঙ্গ নাটক। নাটকটি পড়ে কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন, "এক বুক কাদা ভেঙ্গে পথ চলে এক দীঘি পদ্ম দেখলে দুচোখে আনন্দ যেমন ধরে না তেমনি আনন্দ দুচোখ পুরে পান করেছি, আপনার লেখার-এ বললে আপনি কী মনে করবেন জানি নে, তবে আমার প্রাণের আনন্দ এর চেয়ে ভালো করে প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই বলে লজ্জা বোধ করছি।"[৭]

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. বালুরঘাটে ওকালতি–নাট্যজগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর যোগ

১৯২৪-এ এম.এ. এবং ১৯২৫-এ বি.এল. পাস করে ১৯২৬ সাল থেকে মন্মথ রায় বাবার ইচ্ছা পূরণ করে বালুরঘাট মহকুমা শহরে ওকালতি শুরু করলেন। ১৯২৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বগুড়া জেলার প্রসিদ্ধ ডাক্তার সুরেন্দ্রমোহন বকসীর (গুপ্তের) দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী তপোবালাকে বিবাহ করেন। আগেই উল্লেখ করেছি, মন্মথ তাঁর স্ত্রীর নাম দেন চিত্রলেখা, সংক্ষেপে লেখা। বালুরঘাটে ওকালতির ফাঁকে ফাঁকে তাঁকে নাটকের অভিনয় উপলক্ষে প্রায়ই কলকাতায় আসতে হত। কলকাতায় এসে গোড়ার দিকে সাহিত্যিক বন্ধু অখিল নিয়োগীর ৫ নম্বর অভয় গুহ রোডের বাড়িতে থাকতেন ।

বালুরঘাটে নানারকম লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি বালুরঘাট স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক (১৯২৭-১৯২৮) ছিলেন। ১৯২৪-এ 'হিতসাধনমণ্ডলী' স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের তিনি সভাপতিও ছিলেন। দেশাত্মবোধ জাগানো এবং সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল গ্রন্থাগার ও ক্লাবের সম্পাদকও নির্বাচিত হন। ১৯২৯ সালে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি মাহীনগর কাছারির ম্যানেজার-পদে স্থায়ীভাবে যোগদান করেন। তা ছাড়া তিনি স্কুল বোর্ড ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। বালুরঘাট ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেও ১৯৪২ সাল পর্যন্ত তিনি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য ছিলেন। স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ, গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জনশিক্ষা প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ, সংবাদপত্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগরক্ষা, দুর্ভিক্ষগ্রস্ত বালুরঘাটবাসীদের সেবায়

আত্মনিয়োগ ইত্যাদি নানা ধরনের দেশহিতকর ও সমাজসেবামূলক কাজে বালুরঘাটে ১৯২৬ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত মন্মথ রায় অতিমাত্রায় ব্যস্ত ছিলেন।

সমাজ ও স্বদেশ সেবার সঙ্গে তাঁর নাট্যসাধনার জনসংবর্ধিত উজ্জ্বল সূচনাপর্ব তাঁকে রাতারাতি নাট্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিল। অনেক নাট্যকারকে তিল তিল করে চেষ্টার পরে দীর্ঘকালীন সংগ্রামের পর প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে হয়। কিন্তু মন্মথ রায় মাত্র চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সেই খ্যাতির স্বর্ণাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। ছাত্রাবস্থায় তাঁর নাটক কলকাতার শ্রেষ্ঠ থিয়েটার স্টারে অভিনীত হচ্ছে। এটা অভাবনীয় ঘটনা বলেই মনে হয়। অথচ তখন কলকাতায় তাঁর কোনো বাসস্থান নেই। সেখানকার সমাজে পরিচিতি নেই, তখন তিনি এক অজ্ঞাতপরিচয় সুদূর মফস্বলের ব্যক্তিমাত্র। তাঁর কয়েকজন একান্ত শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তির অকৃত্রিম চেষ্টার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ড.নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র গুহ ও অহীন্দ্র চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নরেশচন্দ্র তখন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্সের একজন নামকরা লেখক ছিলেন। তিনিই গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্সের মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে অজ্ঞাত ছাত্রনাট্যকার মন্মথ রায়ের নাটকটি পেশ করেন। সুতরাং কলকাতার নাট্যজগতের সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক যোগস্থাপনের কৃতিত্ব নরেশচন্দ্রের। হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের আনুকূল্যও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি নাটকটি স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ করেন, পরে নাটকটি প্রকাশ করেন। তাঁরই অনুরোধে মন্মথ রায় পূর্ণাঙ্গ 'চাঁদ সদাগর' নাটকটি লেখেন এবং ওই নাটকের সাফল্যমণ্ডিত অভিনয়ের ফলে নাট্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। প্রবোধচন্দ্র গুহ তাঁর নাটকের মঞ্চায়নে সব সময়ে আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং নানাপ্রকার সাহায্য

করেছেন। অহীন্দ্র চৌধুরীর চাঁদ সদাগরের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয়ের ফলেই নাটকটি মঞ্চে অত জনপ্রিয় হয়েছিল এবং নাট্যকারের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। চাঁদ সদাগরের পর বৃত্রাসুর (দেবাসুর), শ্রীবৎস (শ্রীবৎস), বরাহ (খনা) প্রভৃতি ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর বীর্যদীপ্ত, বিচিত্র আবেগরঞ্জিত অভিনয় দর্শকদের মধ্যে প্রচণ্ড উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। অহীন্দ্র চৌধুরী ছাড়া অন্য যেসব অভিনয়শিল্পীর অভিনয়ের মধ্য দিয়ে মন্মথ রায়ের নাটক দর্শকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল তাঁদের মধ্যে দানীবাবু, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র, ছবি বিশ্বাস, নীহারবালা, সরযুবালার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তাঁর নাটক স্টার, মনোমোহন, নাট্যনিকেতন, রঙমহল ও মিনার্ভায় অভিনীত হয়েছিল। ১৯২৪ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত কলকাতার থিয়েটার জগতে বহুকণ্ঠে নন্দিত একটি উজ্জ্বল নাম-মন্মথ রায় !

সাধারণ নাট্যশালায় তাঁর যেসব নাটক শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত হয়ে দর্শকদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেছিল সেগুলি হল পূর্ণাঙ্গ নাটক। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলোর পাশাপাশি তিনি অসংখ্য একাঙ্ক নাটক রচনা করেছেন। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার, সাধারণ নাট্যশালায় তো নয়ই, এমনকি পরবর্তীকালে একাঙ্ক নাটকে প্লাবিত অপেশাদার নাট্য-আন্দোলনের যুগেও তাঁর খুব কম নাটক অভিনীত হয়েছে। এর কারণ, শুধু নাট্যকার হলে চলবে না। নাট্যকারের সঙ্গে একটা নাট্যদল থাকা দরকার, সেই দলই নাট্যকারের নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে প্রচার করতে পারে। অপেশাদার মন্মথ রায়ের কোনো নাট্যদল ছিল না। সে–কারণে তাঁর শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক নাটকগুলো অনভিনীত হয়েই রয়েছে। তাঁর প্রথম দিককার পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলো প্রধানত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

গঠনের পারিপাট্যে, চরিত্রের সজীব ব্যক্তিত্বে এবং কবিত্বময় ও নাট্যরসাশ্রিত সংলাপের প্রয়োগে নাটকগুলো পাঠ্য নাটক রূপেও বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। চাঁদ সদাগর, মহুয়া, দেবাসুর, কারাগার, খনা–এগুলি বাইরে মফস্বলের বহু জায়গায় অভিনীত হয়েছে। অবশ্য পাঠ্য ও অভিনয়ের উপযোগী নাটক রূপে 'কারাগার'–এর সঙ্গে অন্য কোন নাটকের তুলনাই হয় না। ১৯২৩ থেকে ১৯৩৮-এই পনেরো বছর তাঁর নাট্যজীবনের সবচেয়ে ফলবান সময়। যৌবনের অমিত তেজে এই মহাসৃষ্টিধর পুরুষ বিপুল বিক্রমে কুসুমাস্তীর্ণ পথে শুধু এগিয়ে চলেছেন।

তবে নাট্যজগতে এই ক্রমবর্ধমান খ্যাতি সত্ত্বেও তাঁর পারিবারিক জীবন নানা সমস্যায় বিব্রত ছিল। বালুরঘাটে ওকালতিতে অবিচ্ছিন্নভাবে মনোনিবেশ করতে পারছিলেন না, তাই উপার্জনও আশানুরূপ হচ্ছিল না। ১৯৩৫-এ তিনি ডায়েরিতে নিদারুণ অর্থাভাবের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেই অর্থসংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে তিনি আরও বেশি সংখ্যায় নাটক লিখবেন বলে মনস্থির করলেন। কিন্তু তা হলে তো তাঁকে কলকাতায় থাকতে হয়, অথচ ওকালতির জন্যে আবার বালুরঘাটে থাকা প্রয়োজন। এই উভয়সংকটে পড়ে তিনি বিব্রতবোধ করেছেন। এতদিন তাঁর মুহুরির সঙ্গে পারিবারিক বিষয় নিয়ে তীব্র মতভেদ ছিল। এর ফলে ওকালতি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গেল। এর আগে কলকাতায় থাকার সময় কখনও বন্ধু অখিল নিয়োগীর বাড়িতে, কখনও কোনো মেসে উঠতেন। সম্ভবত ১৯৩৬ সাল নাগাদ কলকাতায় তাঁর একটা স্থায়ী ঠিকানা হল–৩০, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, ফ্ল্যাট নম্বর ৮। বহু নাটক তিনি এ বাড়িতে বসে লিখেছেন। সেসব নাটকে ঠিকানাটি লেখা থাকত।

অবশেষে বালুরঘাট ছেড়ে তাঁর নাট্যজগতের কেন্দ্রস্থল কলকাতায় থাকার সিদ্ধান্তই তিনি গ্রহণ করলেন। বালুরঘাট ও দিনাজপুর জেলার এত লোক, এত প্রতিষ্ঠানের আকর্ষণ তিনি কাটালেন কীভাবে ? তেত্রিশ বছর বাসের পিতৃভিটা, জমিদারি, ওকালতি সব ছেড়ে, সমাজসেবা, স্বদেশি আন্দোলন, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, প্রাতিষ্ঠানিক কাজকর্ম–সব দায়িত্ব ও বন্ধন ত্যাগ করে তিনি নাট্যজগতের দিকে ছুটলেন। নাটক, মঞ্চ ও চিত্রের নেশাই তাঁর পেশা হয়ে উঠল। আর সবকিছু থেকে নিজেকে মুক্ত করে তিনি হলেন শুধু নাট্যকার-নাট্যকার মন্মথ রায়। তাঁর চিত্ত পূর্ণবিকশিত, সেখানে নানা বর্ণ নানা গন্ধ-সবকিছু নাটকের। তবে নতুন যাত্রাপথও নিষ্কণ্টক হল না। শুরু হল অনিশ্চিত জীবনের কষ্টকর পথ চলা।

অনিশ্চিত জীবন-পর্ব (১৯৩৯-১৯৪৬)

১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি বালুরঘাট ছেড়ে কলকাতায় ৩০ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে এসে উঠলেন। তাঁর সঙ্গে নয়জনের একটি বৃহৎ পরিবার। পরিবারের এতগুলি লোক নিয়ে সচ্ছলভাবে চলবার যে আর্থিক সংগতি থাকা প্রয়োজন তা তাঁর ছিল না। তবে এত আর্থিক অভাব অনটনের মধ্যে কখনও মনোবল হারাননি। বাইরে এত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা কিন্তু সংসারজীবনে নিরন্তর কঠোর সংগ্রাম। মঞ্চে নাটকের অভিনয়ের জন্যে এবং বিক্রীত নাটকের মূল্যস্বরূপ যা পেতেন তা ছিল অনিয়মিত এবং সংসারের প্রয়োজনের পক্ষে অপ্রচুর।

এই দুঃসময়ে তাঁর আরেকজন অকৃত্রিম উপকারী বন্ধু মধু বসু মঞ্চ ও চিত্রজগতের সঙ্গে তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করার ফলে যেমন তাঁর আর্থিক সমস্যার অনেকটা সমাধান হল তেমনই নব নব সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিজের প্রতিভা বিকাশের সুযোগও পেলেন। এতদিন ছিলেন শুধু মঞ্চজগতের নাট্যকার, এখন মঞ্চনাটকের পাশাপাশি চিত্রনাট্যকারের নতুন ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেন। এর ফলে মঞ্চের সঙ্গে যোগ যেমন তাঁর কমে এল, নাটক লেখার ধারাও সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেল। ১৯৩৮-এর পর চোদ্দ বছর তিনি আর পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখেননি। অবশ্য মাঝে মাঝে একাঙ্ক নাটক লিখেছেন।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের সঙ্গে মধু বসু চুক্তিবদ্ধ ছিলেন যে, তাঁদের পরবর্তী ছবি তাঁকে করতে হবে। সেই সময় মন্মথ রায় মধু বসুর কাছে নিয়মিত আসতেন। মধু বসু তাঁকে পরিকল্পিত ছবির জন্যে একটি গল্প লিখতে বললেন। সেই ছবির নাম দেওয়া হবে 'অভিনয়'। মন্মথ রায় গল্পটি শেষ করে মধু বসুকে দিলেন। গল্পটি সকলেরই পছন্দ হল। শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের সঙ্গে 'অভিনয়' সম্পর্কে চুক্তি সম্পন্ন হল। এরপর মধু বসু ও মন্মথ রায় দার্জিলিং গেলেন। সেখানে চিত্রনাট্য লেখা সম্পূর্ণ হল। 'অভিনয়'-এর শুটিং চলতে লাগল। সেই সময় মন্মথ রায়ের 'রাজনটী' নাটকটি সকলকে পড়িয়ে শোনানো হল। নাটকটি সকলেই পছন্দ করলেন। তখন 'অভিনয়'-এর জন্যে নাটকটির মহড়া চলতে থাকল। ১৯৩৭–এর ৩০ ডিসেম্বর নাটকটি ফার্স্ট এম্পায়ারে অভিনীত হল। অহীন্দ্র চৌধুরী ও সাধনা বসু প্রধান ভূমিকায় ছিলেন। সি.এ.পি(ক্যালকাটা অ্যামেচার প্লেয়ার)-র পরবর্তী নাটক মন্মথ রায় রচিত 'রূপকথা' ১৯৩৮-এ ফার্স্ট এম্পায়ারে অভিনীত হল।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারির শেষাশেষি মধু বসুর সঙ্গে মন্মথ রায় বোম্বাই যান নাট্যকারের কুমকুম দি ডান্সার নাটকটি মুভিটোনের মালিক চিমনভাই দেশাইকে শোনাবার জন্যে। সাগর মুভিটোনের চিত্র নির্মাণ করবার জন্যে মধু বসু চিমনভাইয়ের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। চিমনভাই গল্পটি শুনে খুশি হলেন এবং ছবির চুক্তিপত্রে মধু বসু ও মন্মথ রায় স্বাক্ষর করলেন। মার্চ মাসে তাঁরা পুনরায় বোম্বাই গেলেন এবং সেখানে কুমকুম–এর চিত্রনাট্য লেখা শেষ হল। কুমকুম-এর মধ্যে চলচ্চিত্রে প্রথম সমাজতান্ত্রিক ভাবনার পরিচয় পাওয়া গেল। ধনিক ও শ্রমিকের সংঘাত, ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে বিরোধই এই ছবিতে দেখানো হয়েছে। ১৯৪০ সালে ছবিটির বাংলা সংস্করণ রূপবাণীতে এবং হিন্দি সংস্করণটি বোম্বাইয়ের ইম্পিরিয়াল সিনেমায় মুক্তি লাভ করে। ছবিটি দর্শকদের কাছে জনপ্রিয় হয়েছিল।

এরপর ওয়াদিয়া মুভিটোনের পতাকাতলে মন্মথ রায়ের 'রাজনটী'র ত্রিভাষী চিত্রসংস্করণের কাজ শুরু হল। বাংলা ও হিন্দি নাম হল 'রাজনর্তকী' আর ইংরেজি সংস্করণের নাম হল *The court Dancer*. হিন্দি ও ইংরেজি সংস্করণে নায়কের ভূমিকায় পৃথ্বীরাজ কাপুর ছিলেন ।

নিউ থিয়েটার্সের বীরেন্দ্রনাথ সরকার মন্মথ রায়ের মারফত মধু বসুর কাছে প্রস্তাব পাঠালেন, তাঁরা নিউ থিয়েটার্সের পক্ষে একটি দোভাষী চিত্র করতে রাজি আছেন কি না। মধু বসু রাজি হয়ে গেলেন। মন্মথ রায় ছবির কাহিনিকার ও চিত্রনাট্যরচয়িতা। ১৯৪১-'মিনাক্ষী' নামে এই ছবিটির কাজ শুরু হল। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪১-এ এম.পি.প্রোডাকশনের জন্যে মন্মথ রায় 'হাসপাতাল' ছবিটির কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখলেন। পরে ছবিটির নাম হয়েছিল 'যোগাযোগ'। হিন্দি সংস্করণের নাম হল 'হসপিটাল'। ১৯৩৯-এ বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। জাপান যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে যুদ্ধ একেবারে ঘরের কাছে চলে

এল। কলকাতায় দু-জায়গায় বোমা পড়ার ফলে কলকাতাবাসীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হল। দলে দলে কোলকাতার লোক মফস্বলের নানা জায়গায় পালাতে শুরু করল। মন্মথ রায়ও পরিবার নিয়ে বিপাকে পড়লেন। এই অনিশ্চিত অবস্থাতেও তিনি সাধনা বসুর অনুরোধে অমর পিকচার্সের জন্যে পয়গাম ছবির কাহিনি ও চিত্রনাট্য লিখলেন।

১৯৪২-এ মন্মথ রায় তাঁর পরিবারের লোকেদের বগুড়ায় তাঁর শ্বশুরবাড়িতে রেখে এলেন। তিনি নিজে বগুড়া ও কলকাতায় যাতায়াত করতে লাগলেন। তাঁর ছোট বোন লীলা স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ১৯৪২-এ বি.এ. পাস করেন। তিনি দিনাজপুরের রায়গঞ্জে সরোজিনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকার পদে যোগদান করেন। সেখানে তাঁর জন্যে তাঁর দাদা একটি ভাড়াবাড়ি ঠিক করে দেন এবং ১৯৪৩-এ পরিবারের লোকদের সেখানে নিয়ে আসেন। পরে লীলা মেয়েদের শারীর শিক্ষা কলেজে ছাত্রী হিসেবে ভর্তি হন। তখন তাঁর দাদা সমগ্র পরিবারকে কৃষ্ণনগর নিয়ে আসেন। কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় যাতায়াত করার সুবিধা, তাই কৃষ্ণনগরে পরিবারের সদস্যদের রাখা তিনি সমীচীন মনে করলেন।

১৯৪৪-এ মন্মথ রায় সরকারের সহকারী প্রচার-সম্পাদক পদের জন্যে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেন এবং ৩০০ টাকা বেতনে ওই পদে নিযুক্ত হন। এর পরে ১৯৪৫-এ ফিল্ড পাবলিসিটি বিভাগের অধীন লেখক রূপে নিযুক্ত হন। বেতন মাসিক ৩৫০ টাকা। ১৯৪৬-এ সরকারের অধীন প্রচার বিভাগে প্রোডাকশন অফিসারের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৭-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-প্রযোজকের পদে নিযুক্ত হন। ওই পদে তিনি ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।

আর্থিক সমস্যা মেটাতে মন্মথ রায়ের জন্য এ চাকরি অতি প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু চাকরির জন্যে তিনি কখনও আত্মমর্যাদা খোয়াতে প্রস্তুত ছিলেন না। চাকরিতে যোগ দেয়ার কিছুদিন পরেই প্রচার-অধিকর্তার এক হুকুম পেলেন, বাইরের জন্যে তিনি যা লিখবেন তা প্রকাশের আগে প্রচার-অধিকর্তার অনুমতি নিতে হবে। এই ধরনের নির্দেশ তাঁর পক্ষে অপমানজনক মনে করে সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগপত্র পেশ করেন। তখন কংগ্রেস নেতা কিরণশঙ্কর রায় প্রচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। প্রচার-অধিকর্তার নির্দেশ তিনি বাতিল করে দেন। মনে রাখতে হবে সরকারি কাজ করার সময়েই তিনি 'ধর্মঘট', 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' প্রভৃতি প্রতিবাদমূলক নাটক লিখেছিলেন।

এই সময়ে পারিবারিক জীবনের কিছু খবর নেওয়া যাক। ১৯৪৬-এর ১ ফেব্রুয়ারিতে মন্মথ রায় কৃষ্ণনগর থেকে পরিবারের সকলকে নিয়ে কলকাতার নতুন স্থায়ী ঠিকানায় এসে উঠলেন। সেই ঠিকানা হল ২২৯ সি, বিবেকানন্দ রোড। ওই বাড়ির তিনতলার ফ্ল্যাটটিতে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত চল্লিশ বছরের অধিককাল কাটিয়েছেন। মানিকতলা অঞ্চলের ওই ফ্ল্যাটটিতে নাট্যজগতের এমন কোনো লোক নেই যিনি আসেননি। এই বাড়িতে থাকার সময়েই তিনি সকল সম্মান, সংবর্ধনা, নাট্যজগতের নেতৃত্বপদ সবই যেমন পেয়েছিলেন, তেমনই ধীরে ধীরে ভগ্নদেহে, অবসন্ন মনে শেষ বিদায়ের মুহূর্তটির দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এখানেই তার বর্ণাঢ্য জীবনলীলার অবসান ঘটে।

১৯৪৬-এ বিবেকানন্দ রোডের বাড়িতে চলে আসার আগে ৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের ফ্ল্যাটটি তাঁর বোন ঊষারাণী দত্তগুপ্তকে দিয়ে যান। ঊষারাণী এক জায়গায় লিখেছেন, "আমি যে বাড়িতে থাকি এ

Dhaka University Institutional Repository

বাড়িটা আমাকে দিয়ে দাদা বিবেকানন্দ রোডের বাড়িতে যান।" ছোট বোন লীলা ১৯৪৭-এর ডিসেম্বর মাসে কানাডা যাত্রা করলেন।

স্থায়ী কলকাতাবাস পর্ব (১৯৪৬-১৯৮৮)

ক. ভূমিকা

মন্মথ রায় সরকারি কাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তাঁর আর্থিক সমস্যা অনেকখানি মিটল এবং বিবেকানন্দ রোডের ফ্ল্যাটে সপরিবারে নিশ্চিন্তভাবে বসবাস শুরু করার পরে অনিশ্চিত বাসের চিন্তা ও উদ্বেগ দূরীভূত হল। তখন আবার তিনি নাট্য সৃষ্টিকর্মে মন দিলেন। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে পুনরায় এসে দেখলেন, নাট্যজগৎ থেকে তিনি অনেক দূরে সরে এসেছেন। চিত্রজগতের ক্ষণিকের মায়ায় তিনি নাট্যজগৎ ছেড়ে দূরে চলে গিয়েছিলেন। সেই মায়া যখন কাটল তখন দেখলেন, থিয়েটারও তাঁকে ভুলেছে–যা যায় তা আর ফিরে আসে না। চোদ্দ বছরে যে সবকিছু বদলে গেছে। বদলে গেছে তাঁর দেহ ও মন, বদলেছে সমাজ ও পরিবেশ এবং সবচেয়ে বড়কথা, নাটকের বিষয়, রূপ ও রীতি এবং থিয়েটারের কেন্দ্রবিন্দু ও অভিনয় প্রণালি একেবারে বদলে গেছে। মন্মথ রায়ের নাট্যরচনার পরবর্তী পর্বগুলির সামগ্রিক পরিচয় দিয়ে আমরা তাঁর জীবনের অন্য দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

Dhaka University Institutional Repository

খ . দ্বিতীয় নাট্যপর্ব

১৯২৩ খেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত প্রথম নাট্যপর্ব স্থায়ী হয়েছিল। চোদ্দ বছর পরে ১৯৫২–তে তাঁর দ্বিতীয় নাট্যপর্ব শুরু হল। তাঁর একাঙ্ক নাটকের প্রথম সংকলন একাঙ্কিকার দ্বিতীয় সংস্করণের কিছু কিছু নাটক এই সময়ে (১৯৫২-৬৩) লেখা হয়েছিল। এই সময়ে লেখা নাটক নিয়েই পরবর্তী একাঙ্ক সংকলন গ্রন্থগুলি যথা: 'নবএকাঙ্ক, 'ফকিরের পাথর, 'বিচিত্র একাঙ্ক' এবং 'একাঙ্কগুচ্ছ' প্রভৃতি গড়ে উঠেছিল।

ব্যক্তিগত জীবনে মন্মথ রায়ের বিচিত্র বর্ণময় যৌবনের উদ্দাম বেগ শান্ত হয়ে এসেছে, প্রৌঢ়ত্বের স্পর্শে উষ্ণ ও চঞ্চল রক্তধারা তখন স্থির ও শান্ত। তাঁর সৃষ্টিতে তখন আবেগের ঘাতপ্রতিঘাতে উত্তাল হৃদয়বৃত্তির প্রমত্ত উচ্ছ্বাস আর নেই, প্রজ্ঞা ও মননের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তখন তিনি জীবনকে বিচার-বিশ্লেষণ করছেন। আগে ইন্দ্রধনুরঞ্জিত কল্পনার আকাশে তাঁর অতৃপ্ত দৃষ্টি বিচরণ করত, এখন কাছের কাদামাটি দিয়ে গড়া বাস্তব অসুন্দর জীবনকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে শুরু করেছেন। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের বর্ণোজ্জ্বল, স্বপ্নময় জগৎ শেষ হয়ে গেছে। সমস্যাক্ষুব্ধ বাস্তব জগতের বিরূপ ও বিকৃত রূপ তাঁর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

গ.তৃতীয় নাট্য-পর্ব (১৯৬৩-১৯৮৬)[৮]

তৃতীয় নাট্য-পর্বে সমসাময়িক অনেক ঘটনা, বহু মনীষীর স্মরণোৎসব, জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মন্মথ রায় রচিত নাটকের বিষয় হিসাবে এসেছে। সারদা মাতা (শ্রীশ্রীমা), স্বামী বিবেকানন্দ (মহা-উদ্বোধন), তারাস শেভচেঙ্কো, লালন ফকির, মুজিবুর রহমান (আমি মুজিব নই, জয় বাংলা),

শরৎচন্দ্র (শরৎ বিপ্লব), লালন ফকির, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (অমর প্রেম), মহেন্দ্রলাল সরকার (ড.সরকার), লেলিন (এ দেশে লেলিন) প্রমুখ মনীষীদের নিয়ে জীবনী-নাটক লিখলেন। তেমনই সমসাময়িক কিছু স্মরণীয় ঘটনা, যথা : দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের শতবর্ষপূর্তি (দুর্গেশনন্দিনীর জন্ম), নাট্যশালার শতবর্ষপূর্তি (আঠার শ বাহাত্তর) উপলক্ষে তিনি ওইসব ঘটনা নিয়ে নাটক লিখেছিলেন। মাত্র দুখানি নাটকের মধ্যে তিনি তাঁর মৌলিক কল্পনাশক্তির আশ্রয় নিয়েছিলেন, যথা : দিগ্বিজয় (পালানাটক) ও মহাভারত। জীবনী-নাটকগুলি তথ্যনিষ্ঠ বটে, কিন্তু তথ্যকে রসে পরিণত করতে হলে স্বাধীন কল্পনাশক্তির বিচরণভূমি থাকা দরকার। রূপ, রং,চিত্র, ধ্বনির শিল্পসম্মত সমাবেশ থাকা দরকার। সেগুলির অভাবে নাটকগুলি আমাদের কৌতূহল মিটিয়েছে বটে, কিন্তু রসপিপাসা চরিতার্থ করতে পারেনি। উপর্যুক্ত নাটকগুলি 'একাঙ্ক অরণ্য (১৯৮৩), ও 'একাঙ্ক অর্ঘ্য (১৯৮৩), এই দুটি একাঙ্ক নাটকের সংকলন-গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল।

ঙ. সম্মান-স্বীকৃতি-সংবর্ধনা

মন্মথ রায় যেমন নিজেকে উজাড় করে তাঁর সকল নাট্যসম্পদ দেশবাসীকে দিয়েছিলেন, তেমনই কৃতজ্ঞ দেশবাসীও তাঁকে প্রভূত সম্মান স্বীকৃতি ও সংবর্ধনা দিয়েছে। ১৯৬৩ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে আমন্ত্রিত হন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা। তাঁর অনন্য নাট্য কৃতিত্বের জন্যে ১৯৬৪ সালে বিশ্বরূপা রত্নপদক পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬৭-তে তিনি সোভিয়েট ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬৮ সালের ম্যাক্সিম গোর্কি আন্তর্জাতিক শতবর্ষ উৎসবে তিনি চারজন ভারতীয় প্রতিনিধির

অন্যতম রূপে সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণ করেন। ১৯৬৭-তে উল্টোরথ সাহিত্য পুরস্কার পান। ১৯৬৯-এ দিল্লির সংগীত-নাটক আকাদেমীর পুরস্কার ও রাষ্ট্রপতির সংবর্ধনা পেলেন। সংগীত-নাটক আকাদেমীর পুরস্কার পাওয়ার পর শিল্পীসংসদ তাঁকে সংবর্ধনা জানায়। ২৮.১ .৭০ তারিখে শিল্পীসংসদের সভাপতি উত্তমকুমার তাঁকে একটি পত্রে লেখেন, "কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাটক একাডেমী আপনাকে পুরস্কৃত করে ধন্য হয়েছে। বাংলা নাট্যমঞ্চ এবং বাংলাদেশের অভিনেতা-অভিনেত্রী আপনার এই সম্মানে গৌরববোধ করে। শিল্পী সংসদ আপনার এই সম্মান লাভে আনন্দিত।"[৯] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রিডারশিপ বক্তৃতা(১৯৭০-৭২) দান করেন। ১৯৭১ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত রাজ্য সংগীত-নৃত্য-নাট্য আকাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৭২ সালে মন্মথ রায়কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সুধাংশুবালা পুরস্কার প্রদান করেন। ১৯৭৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাট্যকীর্তির জন্যে তাকে বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শতবার্ষিকী স্মারক স্টার থিয়েটার স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। ১৯৭৯-তে মন্মথ রায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্মানিক ডি.লিট. উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৮১ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্বদ্যিালয় তাকে সাম্মানিক ডি.লিট. প্রদান করে। ওই বছরই বিশ্ব শান্তিসংবাদ কর্তৃক শান্তি আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকার জন্যে তাকে পদক দ্বারা সম্মানিত করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮১ সালে মন্মথ রায়কে সংবর্ধনা দেন। মানপত্রে সরকারের পক্ষ থেকে লেখা হয়েছিল, "আপনার মহান গৌরবোজ্জ্বল কৃতিত্বে আমরা গর্বিত। স্বদেশের ও বিদেশের বহুতর

সম্মানে আপনি ভূষিত হয়েছেন। সেই সঙ্গে যুক্ত হ'ল আমাদের এই সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য।" ১৯৮২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক সংবর্ধিত হন। ১৯৮৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক মন্মথ রায়কে নাট্যজগতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দীনবন্ধু নাট্য পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাঁকে তাম্রপত্র দিয়ে সংবর্ধিত করে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বললেন, "নাট্য আন্দোলনে আপনার বিরাট অবদান। আপনাকে সম্মানিত ক'রে আমরা নিজেরাই সম্মানিত হয়েছি।"

১৯৮৬ সালে মন্মথ রায় নাট্যকার গিরিশ মঞ্চ উদ্বোধন করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাটক ও নাট্যমঞ্চের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য যে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি প্রতিষ্ঠা করেন মন্মথ রায় তার প্রথম সভাপতির পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ওই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি জীবনে অনেক উচ্চ সম্মানিত পদ অলংকৃত করেছিলেন বটে, নাট্য আকাদেমির এই সভাপতির পদই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ। এই পদে থেকেই তিনি নাট্যজগৎ থেকে শেষবিদায় নিলেন। ১৯৮৭ সালে রবিবাসরের পক্ষ থেকে মন্মথ রায়কে সংবর্ধনা জানানো হয়।[১০]

ছ. জীবনের অন্তিম দিনগুলি[১১]

যশের আলোকে সমুজ্জ্বল বাইরের জীবনের ভিতরটা সায়াহ্নের বিষাদম্লান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল। মন্মথ রায় ১৯৪৭-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সরকারের প্রচার-প্রযোজকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তিনি আকাশবাণীর প্রযোজকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই ক'বছরে তিনি পরিবারের আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। নানারকম ঝামেলা মিটিয়ে বিবেকানন্দ রোডের বাড়িতে তিনি সপরিবারে সুস্থিত হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অনেক পারিবারিক ও সামাজিক দায়দায়িত্বও মন্মথ রায় এই সময়ের মধ্যে পালন করেছেন। ছোট বোন লীলাকে আমেরিকায় শারীরশিক্ষা লাভের জন্যে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। আবার ফিরে আসার পর তাঁকে চাকরিতে বহাল করার বিষয়ে সাহায্যও করেন। ১৯৪৮-সালে সচ্চিদানন্দ রায়ের সঙ্গে তাঁর প্রথমা কন্যা জয়ন্তীর বিবাহ দেন। বোন লীলা ও তাঁর ছোট মেয়ে কুমকুমকেও সৎপাত্রস্থ করেন। ১৯৫৯-এ বড় ছেলে প্রদীপকে নিয়ে তিনি কল্যাণীতে তাঁর নিজস্ব বাড়িতে গৃহপ্রবেশ করেন।

নির্দিষ্ট চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর আবার আর্থিক সমস্যার মধ্যে তাঁকে পড়তে হয়। তাঁর বোন লীলা এবং মেয়েরা বিশেষ করে বড়ো মেয়ে জয়ন্তী যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সের শেষ দিন পর্যন্ত বিরাট সংসার চালাবার মূল দায়িত্ব তাঁর উপরেই ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশ্য নানাভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। সরকারের অনুদানেই তাঁর নাট্য-গ্রন্থাবলি প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সেরা নাট্যকারের নাটকও বা ক'খানা বিক্রি হয় ? নাটকের পাঠক কোথায় ? যাঁরা নাটকে অভিনয় করেন তাঁরাও সামান্য রয়্যালটির টাকা নাট্যকারকে দেন না। নাট্যকারদের অধিকার ও ন্যায্য পাওনা আদায়ের জন্যেই নাট্যকার সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মন্মথ রায় কয়েক বছর এই সংঘের সভাপতি ছিলেন। কিন্তু নাট্যকারদের সমস্যার বিশেষ প্রতিকার হয়নি।

বয়স যত বাড়তে লাগল ততই নানা ব্যাধির আক্রমণ হতে লাগল। ১৯৭৫-এ বুকে প্রথম পেসমেকার যন্ত্র বসানো হল। ১৯৭৭ সালে আবার দ্বিতীয় পেসমেকার বসে। হাইড্রোসিল অপারেশন হল, স্পন্ডিলাইটিসের আক্রমণও হল। আর হাঁপানির কষ্ট তো আছেই। নিজে বার্ধক্যে ও রোগে জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হচ্ছেন, প্রাণপ্রদীপের শিখা প্রায় নিভন্ত, এই সময়ে তাঁর সেবাযত্নপরায়ণা ছায়াসঙ্গিনী

Dhaka University Institutional Repository

সহধর্মিনী মারাত্মক সেরিব্রাল থ্রমবোসিস-এ আক্রান্ত। এ যে মধুসূদন–হেনরিয়েটার অবস্থা। কে কাকে দেখে !

সেই পর্বতচূড়ার মতো দীর্ঘ ও অটল দেহটি ক্ষয় হতে হতে জীর্ণ ভগ্ন হয়ে পড়ছে। লোলচর্ম, শিরাগুলি প্রকটিত, মাংসপেশিগুলি ঝুলন্ত অবস্থায়–যে কোন মুহূর্তে যেন খসে যেতে পারে। কিন্তু এই ভগ্নপ্রায় দেহ থেকে তেজের কণাগুলি ঠিক আগের মতোই ঠিকরে বেরোয়। যেন মৃত পাহাড়ের ভিতর থেকে হঠাৎ আগুনের লাভা ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবাদের ভাষা তেমনই কঠোর, প্রতিরোধের আন্দোলনে তেমনই দুর্জয়।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। একা তাঁর ছোট ঘরটিতে বসে থাকেন। মাঝে মাঝে ভগ্নকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠেন, "এই কে আছিস?" কেউ আসে না। যিনি অন্তরাল থেকে সদা সযত্ন দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখতেন, তিনি চেতনারহিত জড়বস্তুতে পরিণত। এরকমই হয়। দুজনের মধ্যে যদি একজন মৃত অথবা মৃতপ্রায় হয়ে পড়েন তবে আরেকজনের জীবনে নেমে আসে শূন্যতার নিস্তরঙ্গ নিঃসঙ্গতা।

একের পর এক বিপর্যয় ঘটছে। তাঁর ছোট ছেলে, পরম আদরের প্রিয়দর্শন চন্দন হঠাৎ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে নীলরতন হাসপাতালে ১৯৮৮ সালের ১২ জুলাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে ১৭.৮.৮৮ তারিখে লেখা একটি পত্রে জানিয়েছিলেন, "সবচেয়ে বড় দুঃখ রয়ে গেল তেতলা থেকে একতলায় আমাকে নামতে না দেওয়ায়

এন.আর.এস. হাসপাতালে গিয়ে পুত্রটিকে দেখে আসতে পারিনি। এমন কি তার মৃতদেহও তেতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে হয়েছে। এর চেয়ে মর্মান্তিক পুত্রশোকের ঘটনা আর কী হতে পারে !"

অবশেষে মন্মথ রায়ের মহাপ্রয়াণের দিন ঘনিয়ে এল। তাঁর অবস্থার ক্রমাবনতি হওয়ার ফলে ১৯৮৮ সালের ২৩ আগস্ট নীলরতন সরকার হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হল। কিন্তু হাসপাতালে মোটেই সুচিকিৎসা হয়নি। ১৯৮৮ সালের ২৬ আগস্ট বেলা ২টা ২৫ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হয়।

সন্ধ্যার পর মন্মথ রায়ের মরদেহ বিবেকানন্দ রোডের বাড়ির প্রাঙ্গণে এনে তাঁর চন্দনলেপিত, পুষ্প ও মাল্যশোভিত বরতনু শায়িত রাখা হল। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এসে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। সকলের হৃদয় শোকে মোহ্যমান। শুধু তিনতলার ফ্ল্যাটে তাঁর সারা জীবনের সঙ্গিনীর চৈতন্যহীন সত্তায় কোনো শোকের আঘাতই স্পর্শ করতে পারল না। কয়েকদিন আগে তাঁর স্নেহের পুত্র চলে গেছে। আজ তাঁর দেবতার মতো ঐশ্বর্যবান স্বামী চলে গেলেন। কিন্তু লুপ্ত চেতনায় কোনো প্রতিক্রিয়া নেই।

রাত ৯টা ১৫ মিনিটে মৃতদেহ বাগবাজার গিরিশ মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে সারারাত অনুরাগী বন্ধু ও ভক্তজন এসে শ্রদ্ধা জানান। পরদিন রবীন্দ্র সদনে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হল। সেখান থেকে নিমতলা মহাশ্মশানে তাঁর দাহকার্য সম্পন্ন হল।

মন্মথ রায় রচিত নাটিকা 'জন্মদিন'–এ মৃত্যুপথযাত্রী এক বৃদ্ধের কাছে মৃত্যু পরাজিত হয়েছিল। আর জন্মদিন-এর স্রষ্টা কিন্তু মৃত্যুর কাছে এসে শেষ পরাজয় স্বীকার করলেন। তবে নিশ্চয়ই তাঁর যাত্রা অন্ধকার রাজ্য থেকে অমৃতের আনন্দলোকে অব্যাহত আছে।

তথ্যসূত্র

১. জয়তী ঘোষ, "মন্মথ রায়: জীবন ও সৃজন", কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১১

২. অজিতকুমার ঘোষ, 'মন্মথ রায়' পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জীবনী গ্রন্থমালা ২৯, কলকাতা-২০০১, পৃ. ১

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ১ম পরিচ্ছেদ

খ.পূর্ণাঙ্গ নাটক

প্রথম পর্ব : পৌরাণিক নাটক

পৌরাণিক নাটক বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ। যথার্থ পৌরাণিক নাটক ঊনবিংশ শতকে বাঙালী দর্শক সমাজের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। আর ঐ শতকের শেষদিকে যথার্থ পৌরাণিক নাটক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায়, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি নাট্যকারদের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে লিখিত হয়েছিল। নব্য হিন্দুধর্মের উত্থান, বিনাশ ও সমৃদ্ধির সঙ্গে বাঙালী দর্শক সমাজে পৌরাণিক নাটকের বিপুল চাহিদা দেখা দিয়েছিল তারই ফল পৌরাণিক নাটক। সাধারণভাবে আমরা বুঝি, যে নাটকের বিষয়বস্তু বা বৃত্ত পুরাণ থেকে গৃহীত তাই হল পৌরাণিক নাটক। পুরাণ বলতে আমাদের প্রাচীন অর্বাচীন অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ সবই বুঝতে হবে।[১]

পৌরাণিক জগৎ এমন একটি রাজ্য যার সঙ্গে আমাদের বর্তমান বাস্তব জগতের মিল খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এ জগতের রাজকীয় ঐশ্বর্য, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, অতিপ্রাকৃত সংঘটন, একালের যুক্তিবাদী মানুষের কাছে রূপকথার রাজ্য বলে মনে হবে। এ জগতের মানুষের সঙ্গে স্বর্গের দেবদেবীদের এক অতি নিকট সম্পর্ক–মর্ত্যমানুষের সঙ্গে স্বর্গের দেবতার সংযোগ অনায়াসেই ঘটে থাকে। দুই দেশের অধিবাসীদের মধ্যে ব্যবধানও তেমন কিছু নয়–স্বর্গের দেবতারাই মর্ত্যের মানুষের জীবন-যাত্রাকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন। অভিশপ্ত অনেক দেবতা নরদেহে মর্ত্যে আসছেন–শাপান্তে আবার তাঁদের মুক্তি ঘটছে। দেবতারা কখনো বা সশরীরে মর্ত্যে আবির্ভূত হচ্ছেন,

কখনো তাঁদের প্রতিনিধি স্বরূপ কাউকে অবতাররূপে কিংবা স্বয়ং ভগবান অবতাররূপে মর্ত্যে লীলা দেখাচ্ছেন। এই সব দেবতাদের লীলা-মহিমার কথা, কিংবা দৈবশক্তিতে মানুষের কথা যখন উপরি-উক্ত পৌরাণিক পরিবেশের মধ্যে নাট্যগুণান্বিত হয়ে ওঠে, তখনই তা প্রকৃতপক্ষে পৌরাণিক নাটক। এ নাটকের অঙ্গীরস হবে 'ভক্তিরস'। দর্শকচিত্তেও ভক্তিরসোদ্রেক করা পৌরাণিক নাট্যকারের লক্ষ্য।

পুরাণের কাহিনী আশ্রয় করে লিখিত নাটক মাত্রই যথার্থ পৌরাণিক নাটক নয়। এতে পৌরাণিক একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে পুরাণের অন্তরঙ্গ লক্ষণগুলিকেও ফুটিয়ে তুলতে হবে। যদি কাহিনীটি পুরাণ থেকে গৃহীত না হয়, অথচ তাতে যদি পৌরাণিক পরিমণ্ডলের অলৌকিকত্ব ও ভক্তিরস প্রধান হয়ে ওঠে (যেমন রামপ্রসাদ বা ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবন নিয়ে লেখা নাটক) তাহলে তাকে পৌরাণিক নাটক বলা যাবে না। কিংবা যদি এমন হয় যে, আধুনিক যুগের নাট্যকারগণ যুক্তির ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে পুরাণের ভক্তিরসধারা ও অলৌকিক সংঘটনকে বর্জন করে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে পুরাণ-কথার নাট্যরূপ দিচ্ছেন, তাহলেও তাকে ভক্তিরসাত্মক যথার্থ পৌরাণিক নাটক বলা যাবে না; দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের *'পাষাণী'*, *'ভীম'* ও *'সীতা'* নাটক, মন্মথ রায়ের *'কারাগার'*, *'দেবাসুর'*, *'সাবিত্রী'* প্রভৃতি নাটকের কথা উল্লেখ করতে পারি। এই সমস্ত নাটকে দেবমহিমা নয়–মর্ত্য-মানুষের সুখ-দুঃখানুভূতি যুগোচিত তাৎপর্য লাভ করেছে।

ঊনিশ শতকের মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র যেমন পুরাণের কাহিনীকে যুগোচিত রূপ দিয়ে নবপুরাণ সৃষ্টি করেছিলেন কাব্যের ক্ষেত্রে, এঁরাও ঠিক সেই পথেই অগ্রসর হয়েছেন। তাই এঁদের নাটককে 'নব পৌরাণিক' নাটক বলাই সঙ্গত। আবার তারাচরণের *'ভদ্রার্জুন'*, কালীপ্রসন্ন সিংহের

'বিক্রমোর্বশী', *'মালতীমাধব'*, *'সাবিত্রী সত্যবান'*, হরচন্দ্র ঘোষের *'কৌরব বিয়োগ'*, রামনারায়ণের *'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'*, *'রুক্মিণীহরণ'*, প্রভৃতিতে পৌরাণিক পরিমণ্ডল বা পুরাণের বিশিষ্ট লক্ষণ নেই–নবপুরাণ-সৃষ্টিরও প্রয়াস নেই। অথচ পুরাণের কাহিনী এগুলিতে আছে। তাহলে এগুলির কি নাম দেওয়া যাবে? অবশ্য এগুলির মধ্যে অনেক নাটক সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। মূল সংস্কৃত নাটকগুলো যখন পৌরাণিক নামে আখ্যাত নয়, তখন এগুলিকে পৌরাণিক বলা সঙ্গত নয়। এগুলির মধ্যে পুরাণের বিষয় নিয়ে লেখা মৌলিক নাটকগুলিকে 'ছদ্ম পৌরাণিক' নাটক বলা সঙ্গত। আমাদের বাংলাভাষায় পুরাণ থেকে বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত নাটকে দীর্ঘকালের বিবর্তনে মাঝে মাঝে প্রকৃতি-বদল যে-রকম হয়েছে, তাতে তার শ্রেণি বিভাগ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তাই আমাদের শ্রেণি-বিভাগে এ নাটকের তিন শ্রেণি–ক. ছদ্ম পৌরাণিক, খ. ভক্তিরসাত্মক পৌরাণিক ও গ. নব পৌরাণিক।[২]

মন্মথ রায় রচিত পাঁচ অঙ্কের পৌরাণিক নাটক ***'চাঁদ সদাগর'***। ১৯২৭ সালে আর্ট থিয়েটারের পরিচালক, নাট্যকার, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার কর্ণধার হরিদাস চট্টোপাধ্যায়-এর অনুরোধে নাট্যকার মন্মথ রায় এই নাটকটি রচনা করেন। লৌকিক পুরাণ মনসামঙ্গলের পরিচিত কাহিনীকে নাট্যকার নতুনভাবে উপস্থাপন করলেন। পৌরাণিক কাহিনী কাঠামোর মধ্যে তিনি আধুনিক মনন ও সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদ সঞ্চারিত করেন। মনসা ও চাঁদ সদাগরের বিরোধকে এ নাটকে হয় বৃহত্তর শক্তির দ্বন্দ্বের প্রতীক হিসাবে প্রতিভাত করা।

মর্ত্যে মনসার পূজা প্রচারকে কেন্দ্র করে চাঁদ সদাগর ও মনসার বিরোধ এবং তার ফলে চাঁদের জীবনে নেমে আসে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়––সপ্তডিঙা মধুকর জলে তলিয়ে যাওয়া, ছয় পুত্রের মৃত্যু, লখীন্দরের মৃত্যু–মৃত স্বামীকে নিয়ে পুত্রবধূ বেহুলার কলার ভেলায় ভেসে যাওয়ার অনমনীয় তপস্যা কিছুতেই চাঁদের সুকঠিন দৃঢ়তাকে বিচ্যুত করতে পারে না। দেবদ্রোহী চাঁদ সদাগরের বজ্রকঠোর অমিতবীর্য, অসম্ভব সাহস পাঠক এবং দর্শককে আবেগে উদ্বেল করে। নাটকটির চরিত্রাঙ্কন, ঘটনা সংস্থাপন অত্যন্ত প্রশংসনীয়। লেখক নিজেই 'চাঁদ সদাগর'-এর ভূমিকায় 'লেখকের কথা' অংশে উল্লেখ করেছেন, "চাঁদ সদাগর লিখিতে বসিয়া দ্বিপ্রহর রাত্রিতে সর্প-বিভীষিকায় চমকিত হইয়াছি।" বিদ্রোহী চাঁদ-এর সংগ্রামী মনোভাব আধুনিক জীবনচেতনা বহন করে আনে। পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষ মনসা ও চাঁদ সদাগরের বিরোধের মধ্যে শাসকের সঙ্গে শোষিতের দ্বন্দ্বের ছবি আভাসিত হতে দেখে। কিন্তু সব ছাপিয়ে পৌরাণিক দেবী-চরিত্রের আধুনিক মানবীকরণ এ নাটকে বড় হয়ে উঠেছে। 'মনসা' হয়ে ওঠে নাট্যকারের অভিনব সৃষ্টি। চাঁদবেনে বেহুলা লখীন্দরের পুরোনো কাহিনীকে নতুন শৈলীতে নাট্যকার নতুন করে আধুনিক সংলাপে, চরিত্রায়ণের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উপস্থাপিত করলেন। বেহুলা প্রচলিত বিধি নিয়মকে অস্বীকার করে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন। 'চাঁদ সদাগর' নাটকের প্রথম মঞ্চায়ন হয় মনোমোহন থিয়েটারে, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়।

'*চাঁদ সদাগর*' প্রযোজনায় বেশ কিছু নতুনতর চিন্তাভাবনা ছিল। সংলাপ ছিল যেমন সাধারণ-বোধ্য, তেমনি তীক্ষ্ণ। কবি নরেন্দ্র দেব এ নাটকের গান লিখে দিয়েছিলেন। নাটকে নৃত্যের ব্যবহার ছিল এবং তাতেও নতুনত্ব ছিল। যেমন: 'সাপ দুধ খেতে আসছে বা বাঁশি শুনে আনন্দে দুলছে বা

দংশন করতে চলেছে ইত্যাদি সর্প গতিকে হাত বা দেহ ভঙ্গিমার দ্বারা নৃত্যের কৌশল শিক্ষক ললিতমোহন গোস্বামী প্রয়োগ করে দেখিয়েছিলেন। ফলে এতে নৃত্যে নতুনত্ব এসেছিল।[৩]

মন্মথ রায়ের *'চাঁদ সদাগর'* মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে মানবিক সংগ্রামী চরিত্রের নাট্যরূপ। চাঁদ সদাগর দেবী মনসার বিরুদ্ধে যে কঠিন সংগ্রামী প্রতিজ্ঞা নিয়ে অটল চরিত্রশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, বিংশ শতকের পরাধীন বাঙালী চরিত্রে সেই তেজ ও বীর্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন বলেই নাট্যকার পুরাণের পরিবর্তে বাঙালীর পুরাণকেই তাঁর প্রথম আদর্শ বলে মনে করেছেন। আর তখন তাঁর এ উপলব্ধি এল যে সাধারণ নাট্যশালার ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক তাঁকে হতে হবে। সে ঐতিহ্যটি হল নাটকের মাধ্যমে সমাজসংস্কার এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম। শুধু স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম নয়–অত্যাচার, নিপীড়ন, শোষণ এবং দুঃশাসনের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম। যার ফলে সাধারণ নাট্যশালার নাট্যকাররূপে মন্মথ রায় চিহ্নিত হয়ে গেলেন।

মন্মথ রায় আর্ট থিয়েটারের জন্য **'দেবাসুর'(১৯২৮)**'নাটকটি লেখেন। গ্রন্থটির ভূমিকায় 'লেখকের কথা' অংশে এই নাটকের পরিকল্পনা বিষয়ে তাঁর মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে,..."ঋগ্বেদে দেবাসুর সংগ্রামের যে সুপ্রচুর ইঙ্গিত রহিয়াছে, সেই ইঙ্গিতে এই নাটক পরিকল্পিত হইয়াছে।"[৪] জাতির মুক্তিযজ্ঞে দধীচির আত্মদানকে কেন্দ্র করে বৈদিক কাহিনী অনুসরণে এ নাটকটি গড়ে উঠেছে। ঋগ্বেদে উল্লিখিত দেবাসুর সংগ্রাম ভারতবর্ষে আর্য-অনার্য যুদ্ধরূপে পরিচিত, তারই অনুসরণে এ নাটকটি রচিত হয়েছে।

পাহাড় আর অরণ্যে ঘেরা একদুর্গে বৃত্রাসুরের আবাস। সূর্যের কন্যা সূর্যা এখানে বন্দিনী। তাকে বলাসুর পাহারা দিচ্ছে। সূর্যাকে হারিয়ে সূর্য, ইন্দ্র, বরুণ, দধীচি–সবাই বিমর্ষ। একদিন দধীচি বৃত্রাসুরের কাছে সূর্যার মুক্তি চাইতে এল। বৃত্রাসুর দধীচির কাছে পৌলমীকে (শচী) বিবাহ করবার জন্যে সম্মতি চাইলেন। দধীচি জানালেন পৌলমী কখনও তার পিতৃহন্তাকে স্বামীত্বে বরণ করবে না। তখন বৃত্রাসুর শর্ত আরোপ করলেন যে পৌলমীকে পেলেই তিনি সূর্যাকে মুক্তি দেবেন। দধীচি ইন্দ্রের হাতে পৌলমীকে তুলে দিলেন। বৃত্রাসুর ক্ষিপ্ত হয়ে ইন্দ্রকে আক্রমণ করল। দেবতা ও অসুরদের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধে পরাক্রমশালী বৃত্রাসুর ক্রমশ দেবতাদের পরাস্ত করতে লাগল। দেবতাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে দেখে দধীচি চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বৃত্রাসুরের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করল। বৃত্রাসুর দধীচির প্রস্তাবে সম্মত হয়। বৃত্রাসুর দধীচিকে জানালো যতক্ষণ দধীচি নদীতে ডুবে থাকবেন সে সময়টুকুর মধ্যে যে দেবতারা সেতু পার হয়ে যাবেন তারা ছাড়া বাকি যাঁরা এপারে থাকবেন, দধীচি নদী থেকে ওঠার পর তাদের সকলকে সে হত্যা করবে। দধীচি তাতেই রাজি হয়ে নদীতে ডুব দিলেন। একে একে দেবতারা সেতু পার হয়ে গেলেন কিন্তু দধীচি নদী থেকে উঠলেন না, আত্মদান করে তিনি অসুর নিধনের আগুন জালিয়ে গেলেন। দধীচি বলেছিলেন আজ না হয় এক যুগ পরেও দেবতাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ অসুরের অত্যাচার থেকে দেবভূমিকে রক্ষা করবে। এই দধীচির অস্থি থেকে নির্মিত বজ্র-অস্ত্রে দেবরাজ ইন্দ্র পরে বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন। দেবতার হৃত স্বাধীনতা এভাবে পুনরায় উদ্ধার হয়েছিল।

নাট্যকার মন্মথ রায়ের মতে, এটি তাঁর প্রথম দেশাত্মবোধক নাটক। অত্যন্ত সচেতনভাবে এ নাটকে তিনি পৌরাণিক কাহিনীর আবরণে সমকালীন রাজনৈতিক চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সময়ের দাবি মেনে দেশপ্রেমিক নাট্যকার ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমকালীন ঘটনাকে নাটকের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। পরাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে যখন সরাসরি রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করা যেত না সেই সময়ে তিনি দেবতা অসুর দ্বন্দ্বের প্রাচীন কাহিনীর মোড়কে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান কামনা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রকাশের ইঙ্গিত ফুটিয়ে তুলেছেন। বৃত্রাসুরের হাতে দেবরাজ ইন্দ্রের পরাজয়, বৃত্রাসুরের স্বর্গরাজ্য অধিকার, শেষ পর্যন্ত দধীচির দেহের অস্থি দিয়ে তৈরি বজ্রে বৃত্রাসুরের মৃত্যু, স্বর্গে দেবতাদের প্রতিষ্ঠা–এ কাহিনীতে যেন সমকালীন ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস রূপে দ্যোতিত হয়ে ওঠে। নাটকের দেবভূমি যেন পরাধীন ভারতবর্ষ, দেবতারা স্বাধীনতাকামী দেশবাসী আর অসুররা পররাজ্যলোভী অত্যাচারী ইংরেজ। নাটকটি যখন মনোমোহন থিয়েটারে (২৮ এপ্রিল ১৯২৮) অভিনীত হয় তখন দর্শকমহলে একই সাথে সৃষ্টি হয় দেশকে ভালোবাসার আবেগ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হবার সাহস।[৫]

মানুষ সম্পর্কে বিচিত্র আগ্রহ, কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা থেকেই মন্মথ রায় রচিত লোককাহিনী ভিত্তিক **'মহুয়া' (১৯২৯)** নাটক রচনার সূত্রপাত হয়। এ নাটকটি লেখার ব্যাপারে মনোমোহন থিয়েটারের তৎকালীন পরিচালক প্রবোধচন্দ্র গুহ তাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন বলে জানা যায়। ১৯২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর 'মহুয়া' নাটক রচনা শুরু করে কিছুদিনের মধ্যে শেষ করেন এবং প্রবোধচন্দ্র গুহের উদ্যোগে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৯ সালে নাটকটি 'মনোমোহন' থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়।

এটি ময়মনসিংহ গীতিকার কাহিনী অবলম্বনে লেখা পঞ্চাঙ্ক রোমান্টিক নাটক। প্রতিটি অংকে একটি করে দৃশ্য রয়েছে। কবি কাজী নজরুল ইসলাম নাটকের সংগীত রচনা করেন।[৬]

নাটকের কাহিনী সরল এবং তাতে কোনো উপকাহিনী অধিকতর গুরুত্ব বহন করেনি। বামনকান্দা নগরের রাজা কীর্তিধ্বজ চক্কোর্ত্তি, তার একমাত্র কন্যাকে ডাকাতরা চুরি করে নিয়ে যায়। সন্তানের শোকে রাজা অচিরেই মৃত্যুবরণ করেন। নগরের শ্যামসুন্দর মন্দিরের সেবাইত নদেরচাঁদ, রাজা কীর্তিধ্বজ চক্কোর্তি মৃত্যুর সময় মন্দিরের সমস্ত সম্পত্তি সেবাইত নদেরচাঁদকে দিয়ে যান। শ্যামসুন্দর মন্দিরের সামনে এসে বেদের দল নাচগান করে। সেবাইত নদেরচাঁদ তাতে খুব খুশি হয়। বেদের দলের মহুয়া ভানুমতীর খেলা দেখাতে চায়। নদেরচাঁদ হরিণীর মতো চঞ্চল মহুয়াকে দেখে মুগ্ধ হয়। মহুয়া মন্দিরের প্রতিমা শ্যামসুন্দরের থেকে চোখ ফেরাতে পারে না।...মহুয়া নদেরচাঁদের প্রতিও আকৃষ্ট হয়। এদিকে হুমড়া বেদে ছলে-কৌশলে নদেরচাঁদের কাছ থেকে রাজা কীর্তিধ্বজ চক্কোর্ত্তির সম্পত্তি হস্তগত করতে চায়। নদেরচাঁদ মহুয়াকে ভালবাসে তাই হুমড়া বেদের কাছে মহুয়াকে প্রার্থনা করে। হুমড়া বেদে অসম্মতি জানালে নদেরচাঁদ ও মহুয়া পালিয়ে যায়। হুমড়া বেদে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এখান থেকে নাটকীয় সংকট ঘনীভূত হতে থাকে। বেদে দলের প্রধান হুমড়া জোর করে মহুয়াকে নদেরচাঁদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। পালঙ্কসই হুমড়ার পালিত পুত্র সুজনকে ভালোবাসে, কিন্তু সুজন মহুয়াকে চায়। হুমড়া সুজনের সঙ্গে মহুয়ার বিয়ের আয়োজন করে, কিন্তু পালঙ্কসইয়ের সাহায্যে মহুয়া নদেরচাঁদের সঙ্গে পালিয়ে যায়। মহুয়া ও নদেরচাঁদ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর। খাবার ও জলের খোঁজে হুমড়ার তাঁবুতে প্রবেশ করে। ঘুমের ঘোরে হুমড়া মহুয়াকে চিনেও

চিনতে পারে না। মহুয়া ও নদেরচাঁদ পালিয়ে গিয়ে অনেক বিপদে পড়ে। প্রথমে এক সদাগর, তার পর এক সন্ন্যাসী মহুয়ার উপর অত্যাচার করতে চেষ্টা করে। মহুয়া দুজনকেই খুন করে। হুমড়া বেদে দলবল নিয়ে তাদের খোঁজে আসে। কিন্তু মহুয়া ও নদেরচাঁদ একটি ঘোড়ায় চড়ে পালায়। অবশেষে তারা ধরা পড়ে। হুমড়া বেদে নদেরচাঁদকে হত্যা করার জন্যে মহুয়াকে ছুরি দেয়। মহুয়া সেই ছুরি নিজের বুকেই বসিয়ে দেয়। তীরবিদ্ধ করে নদেরচাঁদের মৃত্যু ঘটানো হয়। নাটকের অন্যতম দ্বন্দ্বের দিকটি হল–এই মহুয়াই চুরি যাওয়া রাজকন্যা আর ডাকাতরা হল এই বেদের দল। হুমড়া বেদে নিজে রাজা কীর্তিধ্বজ চক্কোর্ত্তির কন্যাকে অপহরণ করে বেদে কন্যা হিসাবে বড় করেন। নাটকের মহুয়া ও নদেরচাঁদ পালিয়ে গেলে হুমড়া বেদের কথা থেকে এই তথ্যটি জানা যায়।

নাট্যকার মন্মথ রায়ের এই ধরনের নাটক থেকে দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি গভীর ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। যে ঐতিহ্যকে বৃহত্তর অর্থে পৌরাণিক-ই বলতে হবে। সাধনকুমার ভট্টাচার্য ঐতিহাসিক যুগের পূর্ববর্তী কালের কাহিনীকে 'পৌরাণিক' বলে সংজ্ঞা দিয়েছেন।[৭] সেদিক থেকে ব্যাপকতর অর্থে আলোচ্য নাটকগুলোকে লোককাহিনী ভিত্তিক নাটক হিসাবে চিহ্নিত করাই যৌক্তিক। এর মধ্যে পৌরাণিক লক্ষণ ও ধর্মের কিছুমাত্র প্রকাশ ঘটেনি, তবুও এ নাটকে যে ধরনের ঘটনার সমাবেশ হয়েছে–তা একই সঙ্গে অতীতের আবার বর্তমানেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের নাটকে তিনি পুরাতনের মধ্য দিয়ে আধুনিক জীবন সংকটকে ছুঁতে চেয়েছেন। তিনশ বছর আগেকার কাহিনী নিয়ে পূর্ববঙ্গের পল্লীকবি দ্বিজ কানাই-এর লেখা 'মহুয়া' পালাটিতে জাতিধর্ম সংস্কারের ঊর্ধ্বে মানুষী প্রেমের সংস্কারমুক্ত রূপের জয়গান গেয়েছেন। মন্মথ রায় তাকেই উপজীব্য করে অতীত ঐতিহ্য,

মানবতাবাদ, সংস্কার-মুক্তি ও জীবনের জয়গানকে সমন্বিত করে 'মহুয়া' নাটকটি রচনা করেন। এ নাটকে নাট্যকার বাংলার প্রকৃতির বুকে বেড়ে ওঠা ভবঘুরে মানুষগুলোর বিচিত্র জীবনযাত্রাকে চিত্রায়িত করেন। লোকগাথার মধ্যে যে বলিষ্ঠ জীবনধর্ম প্রকাশ পায় তাকে মূলধন করে নাট্যকারের রোমান্টিক কবিসত্তা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে।

'মহুয়া' রাজার মেয়ে, হুমড়া বেদে তাকে শিশুকালে অপহরণ করে বেদেনীরূপে বড় করেছে। আলাদা পরিবেশে সে বেদেদের আচার ব্যবহার গ্রহণ করেছে, সেই ভবঘুরে জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। বংশের গরিমা নয়, পরিবেশ যে স্বতন্ত্র মানুষ সৃষ্টি করতে পারে, এ নাটকের মধ্যে তা দেখা যায়। নাট্যকার সচেতনভাবে বাংলার প্রকৃতির বুকে বেড়ে ওঠা এ ধরনের মানুষগুলোর এক অপূর্ব রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। নদনদী, বনজঙ্গলে ঘেরা মাটি মাখা জীবনের গন্ধ নাটকে ভিন্নমাত্রার এক ব্যাপ্তি এনেছে। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বেপরোয়া আবেগ, প্রেম, প্রতিহিংসা–এ যেন জীবনের এক অপরূপ আলেখ্য। জাতি ধর্ম সংস্কারের ঊর্ধ্বে মানুষী প্রেমের সর্বসংস্কারমুক্ত রূপটিকেই তিনি মহুয়া ও নদেরচাঁদের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করেছেন। নাম-গোত্রহীন অন্ত্যজ, অবহেলিত বেদে-সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনাকে নাট্যকার দক্ষতার সাথে প্রস্ফুটিত করেছেন। এ নাটকে একদিকে নাট্যকারের উদার মনোভাবের আঙ্গিকে সমাজতান্ত্রিক চেতনার যে বিকাশ, চমৎকারভাবে বদ্ধজীবনের যে ছবি তা ফুটে উঠেছে। উপেক্ষিত মানুষগুলি তাদের প্রচণ্ডতা, অশান্ত প্রমত্ততা নিয়েই যেন বাস্তব জীবন থেকে উঠে এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

যখন দেশ জুড়ে চলছে আইন অমান্য আন্দোলন। শ'য়ে শ'য়ে লোক দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য গান্ধীজীর নেতৃত্বে কারাবরণ করছে। সেই ১৯৪২ সালে প্রখ্যাত অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করেন ও নাট্যকার মন্মথ রায়কে তাঁদের জন্য একটি নাটক লিখে দিতে অনুরোধ করেন।[৮] সমকালীন দেশকালের এই উন্মাদনাময় ঘটনার দ্বারা নাট্যকার প্রভাবিত হয়েছিলেন, নাট্যকারের নিজের কথাতে জানা যায়:

> দলে দলে লোক কারাবরণ করছিল।...এই পটভূমিকায় মহাভারতে বর্ণিত কংস-কারাগার এর কথা আমার মনে এসেছিল। যে কারাগারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল সেই কারাগারেই আজ উদিত হবে আমাদের জাতীয় জীবনের স্বাধীনতা সূর্য।...এই ভাব থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল আমার **'কারাগার' (১৯৩০)** নাটক।[৯]

নাট্যকার 'কারাগার' নাটকের পৌরাণিক কাহিনী কাঠামোর মধ্যে সমকালীন সময়ের ছবি তুলে ধরেছেন। কারাগার কাহিনীর যে প্রধান দুই প্রতিপক্ষ–অত্যাচারী রাজা কংস ও বসুদেবের নেতৃত্বে পরিচালিত যদুবংশের মানুষগুলির মধ্যে সমকালীন ভারতবর্ষের অত্যাচারী শাসক ইংরেজ ও ভয়কাতর পরাধীন ভারতের প্রজাদের ছবি ফুটে ওঠে। ভারতবর্ষে সমসাময়িক ইতিহাসভূমি থেকে উঠে আসা এই দুই শ্রেণির চরিত্রের সংঘাত সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। পুরাণের কংস-কারাগার এই নাটকে ব্রিটিশ শাসিত ভারত-কারাগারে রূপান্তরিত হয়। বসুদেব সংগ্রামী মুক্তিকামী জনতার নায়ক হিসেবে গণ্য হন। কঙ্কন ও কঙ্কা সেখানে সংগ্রামী যুবশক্তির প্রতীক। অগণিত সাধারণ

মানুষ যেন পরাধীন ভারতবাসী। শাসকশ্রেণির নির্মম অত্যাচারে তারা ভয়কাতর। মনুষ্যত্বহীন ভয়কাতরতার প্রতি প্রবল ধিক্কার এ নাটকের প্রধান বক্তব্য। নাট্যকারের বিশ্বাস কংসকে নিধন করার জন্য তারই কারাগারে ভূমিষ্ঠ হন কৃষ্ণ, তেমনি আগামীদিন পরাধীন ভারতবর্ষের বুকে দেশের মুক্তিদাতা সেই মহান নেতা জন্ম নেবেন। অত্যাচার নিপীড়ন ব্যর্থ হবে–"যে কারাগারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল সেই কারাগারেই আজও উদিত হবে আমাদের জাতীয় জীবনের স্বাধীনতার সূর্য। চল সব সেই মহাতীর্থে–এইভাব থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল আমার এই কারাগার নাটক।"[১০]

গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহ নীতিকে সমর্থন করে লক্ষ মানুষ ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলন ও ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাই কারাগার নাটকে তার প্রতিফলন দেখে মানুষ তাকে অভিনন্দিত না করে পারেনি। পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তিদূত রূপে গান্ধীজীর এই ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রদ্ধা জানালেন ; তিনি বললেন–"গান্ধীজী হলেন সেই মানুষ যে সব মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নিজেদের শিরে অপমানের বোঝাকে নিত্যকালের বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে সেই সব মানুষের হৃদয়ে তিনি সাহস ও আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করিয়া দিয়াছেন।"[১১] গান্ধীজীর এই মহান ভূমিকা, দুঃসাহসী দুঃখবরণের কঠিন তপস্যা, জাতিকে অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত করার দুর্জয় শক্তি নাট্যকার মন্মথ রায়কে অভিভূত করেছিল। তাই তিনি 'কারাগার'-এ ব্রিটিশ শাসনের শোষণ নিপীড়ন, লাঞ্ছনা বঞ্চনার বিকৃত জীবন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দেশের মানুষকে যে বিদ্রোহী ও বিক্ষোভে ক্ষুব্ধ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে, অত্যাচারীর অত্যাচার প্রতিরোধ করতে হবে–বিশ্বাসের এই শক্ত জমি তৈরি করলেন। গান্ধীজীর মহান ব্যক্তিত্বকে মনে রেখে তাঁরই আদলে

গড়ে তুললেন 'বসুদেব'কে–যিনি পরাধীন জাতির মধ্যে মুক্তির আবেগ সঞ্চারিত করলেন। মানবতার বেদীতে সর্বজাতিক সংগ্রাম প্রতিষ্ঠা করলেন। এর ফলে পৌরাণিক নাটক সাধারণ মানুষের কঠিন জীবন সংগ্রামের আলেখ্য হয়ে উঠল।

১৯৩০-এর ২৪শে ডিসেম্বর মনোমোহন থিয়েটারে 'কারাগার' মঞ্চস্থ হয়। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের পরিচালনায়, হেমেন্দ্রকুমার–নজরুলের গানে ও সুরে, বিখ্যাত অভিনেতাদের অভিনয়ে, সে-যুগের বহু পত্রপত্রিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় এ নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। প্রযোজনাটির জনপ্রিয়তা সে যুগের পত্রপত্রিকাতেও পাওয়া যায়।

'ভগ্নদূত'(৩.১.৩১) পত্রিকা এই নাটকের সমালোচনা করে যে মন্তব্য করে তা নিম্নরূপ : "নাটকখানি পৌরাণিক হইলেও বর্তমান আবহাওয়ার সহিত বেশ খাপ খাওয়ানো হইয়াছে।"[১২]

একইভাবে 'দীপালী' পত্রিকায় (১ ১০.৩৭) প্রশংসা করে লেখা হয়: "কাহিনী পুরাতন হলেও শক্তিমান নাট্যকারের হাতে পড়ে সে আখ্যায়িকা যেন সম্পূর্ণ নতুন হয়ে উঠেছে। কোন বিশেষ দেশকাল পাত্রের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, কারাগারের যে ছবিটি মন্মথবাবু এঁকেছেন তা বিশ্বজনীন হয়ে দেখা দিয়েছে।"[১৩]

'কারাগার' যেমন পৌরাণিক নাটক তেমনি বিস্তারিত অর্থে এটিকে রূপক নাটকও বলা চলে। আর সেকারণেই রূপকের সেই বাতাবরণ ভেঙে বারবার দর্শকের কাছে কংসের কারাগার নয়–অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের কারাগার হিসাবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল। সে কারণেই ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৩১

সালের অষ্টাদশতম অভিনয়ের পর বৃটিশ সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করে 'কারাগার'–এর অভিনয় বন্ধ করে দিলেন। শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির অভিযোগে নাটকটি বাজেয়াপ্ত হল।[১৪] বিদেশী শাসকের এই স্বেচ্ছাচার-নিষেধাজ্ঞা দেশবাসী সেদিন নীরবে মানেনি। নাট্যশালার কণ্ঠরোধ, স্বাধীন শিল্প সৃষ্টির প্রতিবন্ধকতায় চারিদিকে––পত্রপত্রিকায়, প্রাদেশিক আইন সভায় ও আরো নানা স্তরে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। মঞ্চ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেও প্রতিবাদ আসে । নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে শক্তিশালী জনমত গড়ে ওঠে। ফলে ব্রিটিশ সরকার তার পূর্ব আদেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। সম্পূর্ণ অক্ষত ও অপরিবর্তিত রূপে নাট্যনিকেতনে (৮ আগস্ট ১৯৩৯) নাটকটি পুনরায় মঞ্চস্থ হয়। নাটকটির জনপ্রিয়তা ও আকর্ষণ সাধারণ মানুষের কাছে বহুলাংশে বেড়ে যায়। মন্মথ রায়ের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' ভারতবর্ষের জনগণকে 'স্বদেশীমন্ত্রে' উদ্বুদ্ধ করেছিল। পরাধীন জাতির স্বাধীনতা স্পৃহাকে উদ্দীপিত করতে গিয়ে তিনি পরাধীন দেশবাসীর দুঃখ, দুর্দশা, পীড়ন, শোষণ, ভীরুতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা, অসহায়তা, ধর্মান্ধতার জীবন্ত আলেখ্য এই 'কারাগার' নাটকটিকে রূপক অর্থে দাঁড় করিয়েছেন। কী প্রযোজনায়, কী পাঠ্য নাটকরূপে 'কারাগার' তাই বাংলা নাট্য সাহিত্যে এক উজ্জ্বল স্মরণীয় ব্যতিক্রম বলা যায়। এমনকি পরাধীন জাতির মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত করার এই মহান ভূমিকা পালনের প্রতিশ্রুতি বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যনির্মাণের ইতিহাসে চিরন্তন হয়ে আছে।

নাট্যনিকেতনের অধিকারী শ্রী প্রবোধচন্দ্র গুহের অনুরোধে মন্মথ রায় **'সাবিত্রী' (১৯৩১)** নাটকটি রচনা করেন।[১৫] ভারতীয় নারীর উজ্জ্বল সতীত্বের সেই কাহিনীর মর্মগত সত্য অক্ষুণ্ন রেখে তিনি

আধুনিক চিন্তাধারাকে 'সাবিত্রী'র মধ্যে প্রবাহিত করে দিলেন। প্রত্যেকটি দৃশ্যে কৌতূহল ও কারুণ্যের মধ্যে দিয়ে 'সাবিত্রী' অনাড়ম্বরে স্তরে স্তরে বিকশিত হয়ে এক আনন্দময় পরিণতি লাভ করল। 'সাবিত্রী' চরিত্রে যমের সঙ্গে কথোপকথন থেকে সাবিত্রীর দৃঢ় প্রত্যয়ী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যমের কাছ থেকে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে নেয়ার জন্য সাবিত্রীর যে অদম্য প্রচেষ্টা অবশেষে স্বামী সত্যবানের জীবন ফিরে পাওয়ার মধ্য দিয়ে সে সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো। 'সাবিত্রী' নাটকে বাৎসল্য ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের পরিবেশ রচিত হয়েছে। সাবিত্রীর প্রতি পিতা অশ্বপতির বাৎসল্য, কন্যার ভাগ্যলিপি স্মরণ করে অস্থিরতা, অশান্ত পিতৃহৃদয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বময় সত্তার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

এ নাটকে পৌরাণিক প্রেক্ষাপটেও নাট্যকারের সমাজ সচেতনতার প্রকাশ ঘটেছে। ধনী ও দরিদ্রের চিরন্তন বৈষম্য একালের প্রেক্ষাপটে পৌরাণিক কাহিনীর আধারে পরিবেশিত হয়েছে। নাট্যকারের মনে সাম্য ও মৈত্রী সম্পর্কে যে চিন্তা তা যেন এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মহাভারতের অশ্বপতি চরিত্রের সঙ্গে এ নাটকের অশ্বপতির মূল তফাৎ এখানেই ঘটে গেছে। মহাভারতের রাজা অশ্বপতির রাজকীয় সম্ভ্রম, মর্যাদা, আভিজাত্য সত্যবানকে জামাতা হিসাবে বরণ করতে কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু এ নাটকে অশ্বপতি একজন বনবাসী ভিক্ষুককে জামাতারূপে বরণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত। কারণ: "এতে যে আমার রাজমহিমা কলঙ্কিত হবে। আমার উচ্চশির ধূলায় লুণ্ঠিত হবে।"–এই ছিল তার যুক্তি। শ্রেণিদ্বন্দ্বের কী স্পষ্ট রূপায়ণ। পিতা হিসেবেও অশ্বপতি বাস্তব ও জীবন্ত। সাবিত্রী অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রামের দৃঢ়তায় পৌরাণিক হয়েও সমসাময়িকতার দেশকালগত অর্থে তাৎপর্যময়।

১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে, বাংলা ১৬ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার 'সাবিত্রী' নাট্যনিকেতনে মঞ্চস্থ হয়। নাট্যকার এ নাটকটি লেখার ব্যাপারে প্রবোধচন্দ্র ও অখিল নিয়োগীর সাহায্যের কথা স্বীকার করেছেন। নির্মলেন্দু লাহিড়ীর পরিচালনায় কাজী নজরুল ইসলামের লেখা গান ও সুর সংযোজনায় 'সাবিত্রী' সে যুগের একটি উল্লেখযোগ্য নাট্য প্রযোজনা হিসেবে চিহ্নিত হলো।[১৬]

নাট্যনিকেতনে 'সাবিত্রী' নাটকটির প্রযোজিত রূপ দেখে সেযুগের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নাটক, নাট্যকার ও প্রযোজনাটি সম্বন্ধে বিস্তর লেখালেখি হয়।

'বঙ্গবাণী' (৩য় খণ্ড, ২৬শে সংখ্যায় ৩০ শে আষাঢ় ১৩৩৮)পত্রিকায় এই নাটকটি সম্পর্কে যে মন্তব্য করে তা নিম্নরূপ: "মন্মথবাবুর এই নূতন গ্রন্থখানি অতি অল্প সময়ের মধ্যে অর্ডার মাফিক রচিত হইলেও ইহার সৌন্দর্য কোথাও নষ্ট হয় নাই। ঘটনা সন্নিবেশ ও রচনার কৌশলে মন্মথবাবু বেশ দক্ষ হইয়াছেন।"[১৭]

'আনন্দবাজার' (২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮)পত্রিকায় এই নাটকটি সম্পর্কে যে মন্তব্য লেখে তা হল: "....ইহা (সাবিত্রী) পুরাতনকে নতুন করিয়াছে, আধুনিককে সনাতন সত্যের অচল প্রতিষ্ঠা বেদী দেখাইয়াছে।...নাটকখানির রচনা সুসংবদ্ধ অনাবশ্যক বাহুল্য ও আড়ম্বরহীন।"[১৮]

'সাবিত্রী' নাটকে চরিত্রগুলিকে সহজ, স্বাভাবিক, সরল ও দৃঢ় রেখে নাট্যকার মন্মথ রায় আধুনিক মননের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এ নাটকের ভাষা সতেজ ভাবাবেগে ভরপুর, স্নিগ্ধ অথচ স্বচ্ছন্দ্যগতি। দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজিয়ে ভাববৈচিত্র্যে নাটককে কী করে দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা

যায়–কী করে হাসি ও অশ্রু , প্রতীক্ষা ও উৎকণ্ঠাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শক-মনকে সঞ্চারিত করে দেওয়া যায়–এ প্রক্রিয়াটি মন্মথ রায়ের সহজাত অধিকারের মধ্যেই ছিল।

দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থেকে মন্মথ রায় একধরনের পৌরাণিক নাটক রচনা করেছেন, যেখানে ঐতিহাসিক যুগের পূর্ববর্তী কালের কিছু ঘটনা, কিছু বিশ্বাস, কিংবদন্তী, পৌরাণিক কাহিনী প্রবাদ হিতোপদেশ, রূপকথা প্রভৃতি বিষয় অঙ্গীভূত হয়েছে, **'খনা' (১৯৩২)** তাঁর সেই ধরনের নাটক। লেখকের 'কথা' অংশে এ নাটকটির রচনা সম্বন্ধীয় যে তথ্য পাওয়া যায় তা হল–"খনা লিখিয়াছিলাম নিজের প্রেরণায় ১৯৩২ সালে পূজার ছুটিতে। খনার মতই এ নাটকখানির ভাগ্য বিচিত্র। আর্ট থিয়েটার লিমিটেড পরিচালিত 'স্টার' থিয়েটারে ইহা প্রথম পঠিত ও গঠিত হয়। দিনাজপুর নাট্য সমিতি কর্তৃক ইহা প্রথম অভিনীত হয়, অধুনালুপ্ত নাট্যকুঞ্জ (কলিকাতা) কর্তৃক ইহা প্রথম বিজ্ঞাপিত হয়। 'বাঙলার বাণী' সাপ্তাহিক পত্রে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়, অবশেষে বর্তমানরূপে রূপান্তরিত হইয়া রাজধানীর নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয়, 'নাট্যনিকেতনে' গত ১১ই জুলাই ১৯৩৫ সালের বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়।...খনা'র কোন ইতিহাস পাই নাই। এই নাটকের বার আনা কল্পনা এবং চারি আনা কিংবদন্তি।"[১৯]

'খনা'র কাহিনী: বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন জ্যোতিষার্ণব বরাহ। তাঁর পুত্র মিহিরের জন্মের পর তিনি পুত্রের ভুল আয়ু গণনার ফলে শতায়ু পুত্রকে মাত্র দশ বছরের পরমায়ু মনে করে তাকে একটি তাম্রপাত্রে নদীতে ভাসিয়ে দেন। মিহিরের জন্মলগ্নে জাত ক্রীতদাস ভৈরবের কন্যা মদনিকাকে অচেতন পত্নী ধরণীর কোলে তুলে দেন। এদিকে জলে ভাসতে ভাসতে শিশু মিহির এসে

সিংহলে পৌঁছায়। সিংহল রাজার পালিত পুত্ররূপে সে বড় হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে পরম বিদুষী সিংহল রাজকন্যা খনার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। খনার গণনায় মিহির তার পিতৃপরিচয় লাভ করে। দুজনেই ভারতবর্ষে ফিরে বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় এসে জ্যোতিষ বিচারে বরাহকে পরাস্ত করেন। বিক্রমাদিত্য খনার স্বর্ণমূর্তি নির্মাণ করে তাঁর নবরত্ন সভায় বরাহের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। মিহির পিতার অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে খনাকে ভর্ৎসনা করেন। খনা বরাহের অপমান ও লাঞ্ছনা এবং মিহিরের ভর্ৎসনা সহ্য করতে না পেরে নিজের জিহ্বা কেটে প্রাণ বিসর্জন দেন।

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মন্মথ রায় 'খনার' কাহিনীকে নবরূপ দেন। নাট্যকারের কাছে প্রেম এক পারস্পরিক ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা মানবিক অনুভূতি। প্রেমের কাছে তাই কোন জাতি, ধর্ম নেই। প্রেমের জন্যে কৌলীন্য বিচারের প্রয়োজন হয় না। প্রেম সম্পর্কে নাট্যকারের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন দেখতে পাই 'খনা'-য়। খনা সিংহলের রাজকন্যা হয়েও তাই গোত্রহীন, গৃহহীন, অজ্ঞাতকুলশীল যুবক মিহিরকে ভালোবাসে। বিশ শতকের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যময়ী একটি উজ্জ্বল চরিত্ররূপে তাকে চিত্রিত করে তোলেন। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর ব্যক্তিসত্তা যেখানে লাঞ্ছনায় বঞ্চনায় অপমানে পদদলিত হয় সেই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 'খনা'র আত্মহননের মধ্যে দিয়ে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। মূলত 'খনা' নাটকে খনার করুণ পরিণতি এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে যে নারীর জ্ঞান-বিদ্যা চর্চাকে সমাজ মেনে নেয় না। সমাজ নারীর স্বতন্ত্র সত্তাকে গ্রহণ করে না। মূলত খনা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কাছে বলি হওয়া এক অসহায় নারী মাত্র। জ্যোতিষশাস্ত্রে তার অভূতপূর্ব দক্ষতাকে মায়া, ইন্দ্রজাল বলে কটাক্ষ করা হয়। তাকে রাক্ষসী, মায়াবিনী বলে উপহাস করা হয়।

চারদিকের প্রতিকূল পরিবেশ খনাকে ক্রমান্বয়ে নিঃসঙ্গ, একাকী করে দেয়। প্রতিনিয়ত উপহাস, মানসিক নির্যাতনে খনা বাধ্য হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

ক্যালকাটা থিয়েটার্সের প্রযোজনায় অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় নাট্যনিকেতনে 'খনা' মহাসমারোহে চলেছিল। অখিল নিয়োগী সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। ভীষ্মদের চট্টোপাধ্যায় সুরকার ছিলেন। নীহারবালা নৃত্য পরিকল্পনায় ছিলেন। নরেন দত্ত দৃশ্যপট এঁকেছিলেন।[২০]

মঞ্চ প্রযোজনা কেমন হয়েছিল সে সময়ের পত্র-পত্রিকার সমালোচনার কিছু অংশ তুলে দিলেই বোঝা যাবে:

'দেশ'(২০.৭.৩৫) পত্রিকায় এই নাটকটি সম্পর্কে যে মন্তব্য করে তা হল: "...মন্মথবাবু অতি দক্ষতার সহিত এই খনা চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় ক্যালকাটা থিয়েটার্স ইহার রূপ দিয়াছেন।...দীর্ঘ চার ঘণ্টা ধরিয়া এইরূপ বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয়, দর্শকচিত্ত যাহাতে ভারাক্রান্ত না হইয়া ওঠে তজ্জন্য লেখক অতি নিপুণতার সহিত এই কামন্দক (জ্যোতিষার্ণব বরাহের শিষ্য,পরবর্তীতে জামাতা) চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ক্রীতদাস ভৈরব চরিত্র মন্মথ রায়ের আর একটি স্মরণীয় সৃষ্টি।"[২১]

'সতী' নাটকে 'লেখকের কথা' অংশে পাওয়া যায়, নাট্যকার মন্মথ রায় 'ক্যালকাটা থিয়েটার্স কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুরুদ্ধ' হয়ে ১৯৩৭ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১০ই এপ্রিল–এই ষোল দিনে 'সতী' নাটক রচনা করেন। নাট্যকার বলেছেন "রায়বাহাদুর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডি লিট্, প্রণীত 'সতী' আমাদের পাঠ্য পুস্তক ছিল। এই নাটক রচনায় ডঃ সেনের ঐ আখ্যায়িকা হইতে প্রভূত সাহায্য লাভ

করিয়াছি।"[২২] 'সতী' পঞ্চাঙ্ক নাটকটি দক্ষের কন্যা, শিবের পত্নী সতীকে নিয়ে প্রাচীন কাহিনীর একটি উজ্জ্বল নাট্যরূপ। একদিকে পিতা অন্যদিকে স্বামীর আকর্ষণকে কেন্দ্র করে এ নাটকে নাট্যসংঘর্ষ গড়ে উঠেছে।

নারদকে সাক্ষী রেখে শাঁখারী বেশে এসে শিব সতীকে শাঁখা পরিয়ে দিলেন। পিতা দক্ষের অমতে স্বয়ংবর সভা ডেকে তিনি সর্বসমক্ষে শিবকে স্বামীরূপে বরণ করলেন। দক্ষ ক্রুদ্ধ হয়ে শিবহীন যজ্ঞ করতে মনস্থ করলেন। কেবল শিব ছাড়া ত্রিভুবনের সকলে নিমন্ত্রিত হল। ঐশ্বর্যের আজ এত স্পর্ধা যে সে স্বেচ্ছাকৃত বৈরাগ্যকে এমনি করে অপমান করে ?–তাই তাপসী বেশে সতী পিতৃগৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলেন। শিবহীন দক্ষযজ্ঞে নানা বিঘ্ন দেখা দিল। দক্ষ শিবনিন্দা করলেন সর্বসমক্ষে এবং সতীকে যজ্ঞশালা ত্যাগ করতে বললেন। পতিনিন্দা সইতে না পেরে সতী ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে শিব মহিমা ঘোষণা করে দেহত্যাগ করলেন। ত্রিভুবনে তাণ্ডব শুরু হল। ঝড়, বজ্র, তাণ্ডবের মধ্যে দিয়ে প্রলয় মূর্তিতে এলেন শিব, সতীদেহ কাঁধে নিলেন–আকাশ বাতাস কেঁদে উঠল। পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে সতী-মাহাত্ম্যের এ নাটক সেযুগে দর্শকের খুব মনোরঞ্জন করেছিল। কাজী নজরুল ইসলাম এ নাটকের গান লিখে দিয়েছিলেন। সুরকারও তিনি ছিলেন। ১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্যে সতীর সখীরা বিবাহের মাঙ্গলিক গান গেয়েছে–"দেব আশীর্বাদ লহ সতী পুণ্যবতী।" বিজয়া সতীকে উদ্দেশ্য করে গেয়েছে–"বিরূপ আঁখির কি রূপই তুই আঁকলি হৃদয়পটে।" ১ম অঙ্ক ২য় দৃশ্যে সতী শিবের বিবাহে খুশি হয়ে ভূত, প্রেত, নন্দী, ভৃঙ্গী নৃত্যসহ গেয়েছে–"বাবার হল বিয়ে, ষাঁড়ের পিঠে চড়ে।" ৩য় অঙ্কে ১ম দৃশ্যে দক্ষালয়ের অলিন্দে সহচরীরা গেয়েছে –"বাজো বাঁশরী বাজো।" সতীর পতিগৃহে

বিদায়ের সময় ২য় দৃশ্যে গাওয়া হয়েছে –"পাষাণীর মেয়ে আয় বুকে আয়, জগৎ জননী হয়ে কী মাগো জননীরে কাঁদায়।" সে যুগের পৌরাণিক নাটকে নৃত্যগীতের বহুল প্রয়োগ দর্শক চাহিদার ফলেই ঘটত। তাই কথায় ও সুরে গানগুলিকে আকর্ষণীয় করার কথা নাট্যকার স্বয়ং বলেছেন। সে যুগের বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিকেরা তার নাটকের প্রয়োজনে গান রচনা করে দিয়েছেন–সে যুগে সেগুলির জনপ্রিয়তা ও নাটকের পক্ষে সেগুলির প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

একটি কিংবদন্তিকে আশ্রয় করে বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীই **'রঘু ডাকাত' (১৯৪৮)** নাটকটির বিষয়। নাটকটি 'সংহতি' মাসিক পত্রিকার ১৩৫৫ (ইং ১৯৪৮) সালের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে গ্রন্থাকারে ১৯৫৫ সালে প্রকাশ হয়।[২৩] তিন অঙ্কের নাটক। দুর্বলের উপর যখন প্রবলের অত্যাচার ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে তখন নিপীড়িত মানবাত্মার আর্তনাদের মধ্যে যুগে যুগে জন্ম নেয় রঘু ডাকাত এবং সেই দুর্ধর্ষ রঘু ডাকাত প্রেমের পরশ পাথর স্পর্শে কৃষ্ণভক্তে রূপান্তরিত হয়ে সন্ন্যাসীর জীবন বরণ করে নেয়। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় (২৭.০২.৫৩) 'রঘু ডাকাত' নাটকটি সম্পর্কে মন্তব্য ছিল, ''মেদিনীপুর অঞ্চলের সম্ভবত একটি ইতিহাস মিশ্রিত লোকগাথার কাহিনী আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। চরিত্র চিত্রণ ভাবব্যঞ্জনা সুষ্ঠু দৃঢ়, নাট্য গ্রন্থন অপূর্ব।"[২৪]

মন্মথ রায় বাল্যে ও কৈশোরে বহু পৌরাণিক নাটক দেখেছিলেন, যৌবনে মাঝে-মধ্যে অভিনয়ও করেছিলেন। তাই এটি মনে করা অনুচিত হবে না যে, তাঁর মনের মধ্যে পৌরাণিক নাটক সম্বন্ধে একটি ধারণা তৈরিই ছিল। কিন্তু যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে অন্য সব কিছুর মত সাহিত্যের রূপরীতি প্রকরণের সংজ্ঞার পরিবর্তন ঘটে, নতুন অর্থে দ্যোতিত হয়ে তার পরিধি ক্রমশ ব্যাপকতর হয়ে পড়ে।

পুরাণে বর্ণিত বিষয়বস্তু অবলম্বন করে যে নাটক রচিত হয় তাকেই পৌরাণিক নাটক বলে–এটি পৌরাণিক নাটকের সাধারণ ও সহজ সংজ্ঞা। কিন্তু 'পুরাণ বর্ণিত' বিষয়বস্তু অর্থেই যদি শুধু এর ব্যবহার ঘটানো হয় তবে পুরাণে বর্ণিত হয়নি অথচ ঐতিহাসিক যুগের কোনো ঘটনাও নয়–এমন ঘটনা অবলম্বনে যে নাটক সৃষ্ট তার শ্রেণি নিরূপণ করায় তখন সমস্যা দেখা দেয়। তাই 'পৌরাণিক' শব্দটি একটু ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করতে হবে।[২৫]

সর্গ (সৃষ্টি), প্রতিসর্গ অর্থাৎ প্রলয়কালে পূর্বসৃষ্টি ধ্বংসের পর নতুন সৃষ্টির বিকাশ, বংশ অর্থাৎ দেবতা ও ঋষিগণের বংশ বর্ণনা, মন্বন্তর অর্থাৎ মনুগণের শাসনকাল বর্ণনা, বংশানুচরিত অর্থাৎ নৃপতিগণের বংশের ইতিহাস–এই পাঁচটি লক্ষণ থাকলে তবেই বলা হয় পুরাণ। তাই একথা বলা যেতে পারে যে, দেবতার মহিমা কীর্তনই পুরাণের মূল কথা।

ঊনবিংশ শতকে বাংলা নাটক রচনার গোড়ার যুগ থেকে পুরাণ বাংলার নাট্যকারদের কাছে বারবার আকর হিসাবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু পরিবেশ ও প্রবণতা অনুযায়ী নাট্যকাররা নিজেদের মত করে তা ব্যবহার করেছেন। মানসিক সম্পর্ক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রকাশের তাগিদে মধুসূদন দত্ত পুরাণ থেকে উপাদান নিয়েছেন। ফলে তাঁর শর্মিষ্ঠা, দেবযানী, যযাতি পৌরাণিক নরনারী হলেও আসলে হয়েছে হৃদয়াবেগ তাড়িত সাধারণ মানুষ। মানবিক প্রণয়ই 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের মূল উপজীব্য। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের আগে পুরাণকে ভক্তিরসের খাতে মনোমোহন বসু প্রথম প্রবাহিত করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এ পথ ধরেই এলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন "হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।"[২৬] এই আদর্শে প্রাণিত হয়ে তিনি লিখলেন পৌরাণিক

নাটক যার মূল কথা হল ভক্তিরস। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, "গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে বাঙালীর প্রাণরসের সহজ স্পন্দন লাভ করিতে পারা যায়। বাংলার পুরাণ বাঙালীর নিজস্ব সৃষ্টি...বাঙালী তাহার নিজস্ব সুখ দুঃখানুভূতির দ্বারা তাহার পুরাণ চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে, গিরিশচন্দ্রও এই সংস্কৃতির ধারাই তাহার নাটকের মধ্যে অনুসরণ করিয়াছেন।"[২৭] 'গিরিশ যুগ' থেকেই পৌরাণিক নাটকের প্রকৃত সূচনা হল। গিরিশচন্দ্র ও তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারগণ যেমন রাজকৃষ্ণ রায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অপরেশ মুখোপাধ্যায়–এঁদের দ্বারাই পৌরাণিক নাটকের স্বর্ণযুগ স্থাপিত হয়েছিল। নব্য হিন্দু ধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে তখন পৌরাণিক আদর্শের প্রতি যে নবজাগ্রত অনুরাগ দেখা গিয়েছিল তখনকার পৌরাণিক নাটকে তার পরিচয়ই পরিস্ফুট হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের সময় থেকেই সংস্কৃতানুসারী এই পৌরাণিক চিন্তার সঙ্গে শেক্সপীয়রীয় রীতির পঞ্চাঙ্ক নাটকের গঠনশৈলীর মিলন ঘটল। ফলে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ এই পৌরাণিক নাটককে অত্যন্ত প্রিয় করে তুলেছিলেন। তা ছিল আমাদের নিজস্ব সম্পদ। নব্য হিন্দু ধর্মের উত্থান বিকাশ আর সমৃদ্ধির সঙ্গেই পৌরাণিক নাটকের বিপুল চাহিদা বেড়েছিল।

মন্মথ রায় পৌরাণিক নাটক লিখেছিলেন সাধারণ রঙ্গালয়ের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেই, কিন্তু তার মধ্যেই তিনি নিজস্ব স্বতন্ত্র ধারা তৈরি করে নিয়েছিলেন। সাধারণ রঙ্গালয়ের সমান্তরালে এ সময় রবীন্দ্র নাট্যধারা প্রবাহিত ছিল। রবীন্দ্রনাথও পুরাণকে আশ্রয় করে নাটক লিখেছেন, কিন্তু ভক্তিরস তার অন্বিষ্ট ছিল না। তাই তো দেখা যায় মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'চিত্রাঙ্গদা' হয়েছে নব পুরাণ সৃষ্টি। পৌরাণিক নাটকের প্রশ্নহীন ভক্তি বিশ্বাস তাঁর ভাল লাগেনি–যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠার দিকেই

তাঁর বেশি মনোযোগ ছিল। উপেক্ষিত চরিত্রসমূহ অথবা পৌরাণিক কোন ঘাত-প্রতিঘাত মুখর ঘটনাকে পুরাণ থেকে তাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। মানবীয় সুখ-দুঃখ চরিত্রগুলির আত্মায় সিঞ্চিত করলেন। স্থাপন করলেন যুক্তিবাদ। 'চিত্রাঙ্গদা' প্রসঙ্গে সমালোচকের এই মন্তব্যটি উদ্ধৃত করলেই এটি আরো স্পষ্ট হবে। ''দেহী প্রেমের...যন্ত্রণা সম্পর্কে কবি যেমন নিঃসংশয়, তেমনি দেহহীন প্রেমের সম্পূর্ণতায় সুস্থির বিশ্বাসী, সেই অসংশয়িত বিশ্বাস অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার মহাভারতীয় গল্পকে আশ্রয় করে সার্থক রূপ পেয়েছে।"[২৮]

পৌরাণিক নাটক রচনার সুবর্ণ যুগে বসেই রবীন্দ্রনাথ পুরাণ নির্ভর নাটক লিখেছেন এবং বুঝেছেন, সিদ্ধিরসের নিখুঁত অনুসরণে পৌরাণিক নাটক রচনার দিন শেষ হয়ে আসছে। তাঁর চিন্তা ভাবনা যে কত স্বচ্ছ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে শুরু করে মন্মথ রায় পর্যন্ত নাট্যকারদের পৌরাণিক নাটক থেকে। ক্রমশ পুরাণ নির্ভর নাটক এবং পৌরাণিক নাটকে নীতি আদর্শ ও ভক্তির উচ্ছ্বাস কমে নাটকে রোমান্টিকতার সুর লেগেছে। বিশ শতকের গোড়াতেই পুরাণের 'ভক্তিরস'-এর আশ্রয় থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যুক্তি ও ভক্তির সংঘর্ষে নিজস্ব পথ তিনি কতটা খুঁজে পেয়েছিলেন তা নিয়ে সংশয় জাগে। মন্মথ রায়ের আত্মপ্রকাশের ('চাঁদ সদাগর' ১৯২৭) এক বছর আগে ১৯২৬ খিষ্টাব্দে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 'নরনারায়ণ' লিখেছিলেন। তিনি এ নাটকে ভক্তিরসকে নেপথ্যে রেখে আধুনিক দ্বন্দ্বদীর্ণ ব্যক্তিসত্তাকে দেখাতে চেয়েছিলেন। কর্ণ চরিত্রের মধ্যে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাকে শেষ পর্যন্ত ঐতিহ্যবাহিত ভক্তিরসের কাছেই হয়ত সাধারণ রঙ্গালয়ের দায় মেনেই আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল।

কিন্তু মন্মথ রায় প্রায় শুরু থেকেই পৌরাণিক নাটকে আধুনিক মানসিকতাকে প্রস্ফুটিত করতে চেয়েছিলেন। কাজেই প্রচলিত ভক্তিবাদের কাছে কখনই তিনি আত্মসমর্পণ করেননি বরং সমকালকে বিভিন্নভাবে পুরাণ কাহিনী দিয়ে তিনি ছুঁতে চেয়েছেন। পৌরাণিক নাটকের অধ্যাত্মবাদী ধর্মোন্মাদনায় পুরুষকারকে অস্বীকার করে, অলৌকিক দৈবের অমোঘত্ব প্রতিষ্ঠা করে, গিরিশচন্দ্র নাট্যক্ষেত্রে যে অধ্যাত্মবাদী ঐতিহ্যের পত্তন করেছিলেন, মন্মথ রায় তাঁর 'কারাগার' দিয়ে তার গতিপথ বদলে দিলেন। কারাগারের কাহিনী পৌরাণিক সারবস্তু কিন্তু ভক্তিরস নয়, আধুনিক মুক্তি সংগ্রাম। গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকের মাধ্যমে সামন্তবাদী সমাজের সংস্কার ও মূল্যবোধগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। আর মন্মথ রায় পৌরাণিক নাটকের মাধ্যমে আধুনিক জীবনবোধের অভিব্যক্তি ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাই 'কারাগার'-এ দেখি পৌরাণিক মূল্যবোধ ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

মন্মথ রায় তাঁর পৌরাণিক নাটকে ভক্তিরসের সঙ্গে মিশিয়েছেন যুক্তিবাদ এবং শুধু পুরাণ থেকে নয়–যা কিছু প্রাচীন, অনৈতিহাসিক সব জায়গা থেকেই তিনি তাঁর নাটকের কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে বাস্তব রস পরিবেশন করেছেন, মানব ধর্মের জয়গান গেয়েছেন। 'চাঁদ সদাগরে বিদ্রোহী রূপ, 'দেবাসুর'-এ তিনি ঐ কাঠামোর মধ্যেই সমাজবোধের পরিচয় দিয়েছেন। মানবিক সম্মান ও অধিকারের দাবি নিয়ে বৃত্রাসুর দেবতাদের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছে। 'সাবিত্রী' নাটকে নারী চরিত্রের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কথা নাট্যকার সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। অশ্বপতি চরিত্রে বাৎসল্যের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বময় সংঘাত দেখিয়েছেন। এমনকি 'কারাগার'-এ পৌরাণিক

বাতাবরণে তিনি আধুনিক শ্রেণিদ্বন্দ্বমূলক সমাজ সমস্যার কথাও এনেছেন। 'খনা'-র মধ্যে সমকালীন নারীর মর্মবেদনাকে প্রকাশ করেছেন।

'মহুয়া' নাটকের মধ্যে জীবন ও ঐতিহ্যের এক সুনিবিড় সমন্বয় ঘটিয়েছেন। মন্মথ রায়ই প্রথম নাট্যকার যিনি সাধারণ রঙ্গালয়ে আত্মপ্রকাশ করে ঊনিশ শতকের পৌরাণিক নাটক রচনার ঐতিহ্য বাহিত ধারাটি ভাঙতে চেয়েছিলেন। সূচনা থেকেই তাঁর এ শ্রেণির নাটকে মূলরস ভক্তি ছিল না–ছিল মানবিকবোধ। তার ফলে তিনি ঘটনা ও চরিত্রের অলৌকিকতার উপর আস্থা না রেখে এ শ্রেণির নাটকগুলিতে সমকালীন বিবিধ সমস্যার প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ২য় পরিচ্ছেদ

খ.পূর্ণাঙ্গ নাটক

দ্বিতীয় পর্ব : ঐতিহাসিক নাটক

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'ইতিহাস' শব্দটির একটি ব্যাপক অর্থ আছে–অতীতকালের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সামগ্রিক পরিচয়ের নাম ইতিহাস। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ব্যাপক অর্থে ইতিহাস শব্দটিকে প্রয়োগ না করে একটি সংকীর্ণ অর্থে এর ব্যবহার হয়। এই অর্থে ইতিহাস হচ্ছে কোনো একটি বিশেষ যুগের রাজ-রাজড়ার কাহিনী-রাষ্ট্রনৈতিক ইতিবৃত্ত, খ্যাতনামা পুরুষের রাজ্যশাসন, যুদ্ধবিগ্রহাদির কথা। ইতিহাস শব্দের এই অর্থ মনে রেখে আমরা বলতে পারি, যে নাটকের মূল কাহিনী, প্রধান প্রধান ঘটনা ও চরিত্রগুলি ইতিহাস থেকে গৃহীত এবং নাট্যকারের সৃজনশীল পরিকল্পনার সহযোগে যা মানবিক গুণে মণ্ডিত হয়ে শিল্পমূল্যে রসোত্তীর্ণ তাই হল ঐতিহাসিক নাটক।[২৯]

ঐতিহাসিক নাটক নামেই প্রকাশ তা একদিকে ইতিহাস ও অন্যদিকে নাটক। নাটকীয়তার মাধ্যমে রস-সৃষ্টি ঐতিহাসিক নাটকের লক্ষ্য আর তা ইতিহাসের উপাদানকে আশ্রয় করেই হয়ে থাকে। ইতিহাসের তথ্য-ঘটনা বা চরিত্রকে আশ্রয় করতে হবে, কিন্তু তার অতিরিক্ত জীবনের রসরূপকেও কবিকল্পনার সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে। কিন্তু এ কাজ খুব সহজ নয়, কারণ ঐতিহাসিক ও নাট্যকারের ধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক। অতীতে সংঘটিত ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণী সত্যতার সঙ্গে চিত্রণই ঐতিহাসিকের কাজ। এরিস্টটল বলেছেন 'History is based on facts'. ইতিহাসের তথ্যাতিরিক্ত কোনো কিছু বলার অধিকার ঐতিহাসিকের নেই–শুধু সমস্ত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী ইতিহাস কোন রূপ নিতে পারে তার কিছু ইঙ্গিত তিনি দিতে পারেন বা সে সম্পর্কে কিছু অপক্ষপাত মন্তব্য করতে পারেন। কোনো রাজার বিশেষ নীতি বা যুদ্ধবিগ্রহের ফল সমাজের অগ্রগতির পথে সহায়ক

কিনা এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক কিছু সংকেত করতে পারেন। কিন্তু নাট্যকারের ধর্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সৃজনশীল কল্পনাই তাঁর বিশেষ মূলধন। ঐতিহাসিক নাট্যকার সম্পর্কে বলা চলে যে ঐতিহাসিকের যেখানে যাত্রা শেষ সেখানেই তাঁর যাত্রারম্ভ। ইতিহাসের শুষ্ক নীরস কঙ্কালময় কাঠামোতে স্বাধীন কল্পনার রশ্মিপাত ঘটিয়ে তিনি তাকে জীবন্ত ও প্রাণময় করে তোলেন। ইতিহাসের ঘটনা অসংলগ্ন-বিচ্ছিন্ন, একই কালে সংঘটিত ঘটনাবলীর মধ্যে পারম্পর্য থাকে না। কিন্তু ঐতিহাসিক নাট্যকার ইতিহাসের ঘটনাগুলি নির্বাচনের সময় অত্যন্ত সতর্ক হন। একটি বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী, একটি বিশেষ ভাবের অভিমুখীন করে, তিনি প্রয়োজন মতো ঘটনাবলী নির্বাচন করেন এবং তাদের মধ্যে সংযোগ ও ঐক্য রক্ষা করেন। এই ঐক্য জটিল হলেও কোনো ক্ষতি নেই।

মোট কথা, ইতিহাসবৃন্তে মানবজীবনের ফুল ফুটিয়ে তোলাই নাট্যকারের কাজ। ইতিহাসের একটি বিশেষ সীমিত রাজ্যে তাঁর বিচরণ হলেও তিনি নাটকের মূল পরিকল্পনার প্রয়োজনে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী গ্রহণ-বর্জন করেন, প্রয়োজনমতো ছোটখাটো নতুন কল্পিত ঘটনা বা উপাখ্যানও তিনি যুক্ত করতে পারেন। দু'একটি অনৈতিহাসিক চরিত্র আমদানিরও তাঁর অধিকার আছে এবং প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে সম্ভাব্য সত্যের তিনি ইঙ্গিত করতে পারেন।

সমালোচক হাডসন বলেছেন, "ইতিহাসের তথ্যকে পুরোপুরি অন্ধভাবে অনুসরণ করলে তা ইতিহাসই হবে, নাটক হবে না; আবার প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসকে পদে পদে লঙ্ঘন করলে তা নাটকই হবে, ইতিহাসের সঙ্গে কোনও সংস্রব থাকবে না।"[৩০]

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে ঐতিহাসিক নাট্যকারের দায়িত্বের কথায় বলা হয়েছে :

> His task is not to paint a copy of some contemporary or historical personage; but to conceive a particular kind of man, acting under the operation of particular circumstances. This conception growing and modifying itself with the progress of the action also invented by the dramatist will determine the totality of the character which he creates.[৩১]

অর্থাৎ সমসাময়িক অথবা ঐতিহাসিক কোনো পুরুষের অবিকল প্রতিচ্ছবি রচনা করা ঐতিহাসিক নাট্যকারের কাজ নয়। কিন্তু এমন একটি বিশেষ ব্যক্তিকে তাঁকে পরিকল্পনা বা ধারণা করে নিতে হয় যিনি একটি বিশেষ অবস্থায় অনুগত হয়েই সক্রিয় থাকেন। এই ধারণা বা পরিকল্পনাটি নাটকের কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিকশিত ও অভিব্যক্ত হতে থাকে ; পরিকল্পনাটি নাট্যকারের সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব আবিষ্কার এবং তা চরিত্রটির সমগ্রতাকেই প্রকাশ করে।

এই মূল কথাগুলি ছাড়াও ঐতিহাসিক নাট্যকারকে আরও কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। যে কালের বা যে যুগের ইতিহাসকে অবলম্বন করে তিনি নাটক লিখেছেন, সেই যুগের সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, আদর্শ–এক কথায় যুগের সুর ও মেজাজকে (tone and the temper of the age) জীবন্ত করে তুলতে হবে।

আর একটি কথাও মনে রাখতে হবে। ঐতিহাসিক নাটকের পাত্র-পাত্রীরা সাধারণ স্তরের মানুষ নন–বিশেষ করে পাত্র-পাত্রীরা তো অসাধারণ স্তরের (Above the common level)। ঐতিহাসিক প্রধান পুরুষের ভাগ্যের সঙ্গে একটা বিরাট দেশ বা একটা জাতির ভাগ্য নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকে। তাঁর

ভাগ্যের উত্থান-পতন সমগ্র জাতির জীবনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথের কথায়, ঐতিহাসিক পুরুষ 'কালের সারথি'। তাঁর কাহিনী যখন গীত হয়, তখন রুদ্রবীণার একটি তারে মূল রাগিণী বাজে এবং বাদকের অবশিষ্ট চার আঙ্গুল পশ্চাতের সরুমোটা সমস্ত তারগুলিতে অবিশ্রাম একটা বিচিত্র-গম্ভীর, একটা সুদূর-বিস্তৃত ঝংকার জাগ্রত করিয়া রাখে। তাই তাঁর চিন্তা ভাবনা, ক্রিয়াকলাপের মধ্যে একটা সুরের উদাত্ততা থাকে। ঐতিহাসিক পাত্র-পাত্রীদের ভালবাসা, ক্রোধ, প্রতিহিংসা, ঘৃণা সব কিছুই একটা উঁচু সুরে বাঁধা ; তাদের ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং আত্মবিসর্জনও অসাধারণ স্তরের। বহু-জীবনের সংস্রব থাকায় তাদের আচরণে এই অসাধারণত্ব পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহাসিক নাটকে সুরের এই উদাত্ততা ও বিষয়-বস্তুর গাম্ভীর্যের জন্যে পাত্র-পাত্রীদের ভাষায় আভিজাত্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের উচ্চারিত বাক্য অলঙ্কৃত, আবেগ-দীপ্ত, ধ্বনি-গম্ভীর ও কৌলীন্যযুক্ত হয়।

ঐতিহাসিক নাটক রচনায় নাট্যকার ইতিহাসের অন্ধ-অনুকারী নন ঠিক ; কিন্তু তাই বলে তাঁর স্বাধীনতাও সীমাহীন হয়। সর্বজনস্বীকৃত ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত সত্যকে লঙ্ঘন করার তাঁর অধিকার নেই। কল্পনার স্থান নাটকে আছে কিন্তু কল্পনা যেন কাল্পনিকতাকে প্রশ্রয় না দেয়। প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস-সত্যকে অক্ষুণ্ন রেখে সম্ভাব্য জীবন-সত্যের ইঙ্গিত তিনি দিতে পারেন। ইতিহাসে চরিত্রের যে মানবিক পরিচয়টুকু সম্ভাব্য বলে মনে হয়, সেই অংশ নাট্যকার নিজস্ব কল্পনায় সৃষ্টি করবেন। বলা বাহুল্য, ইতিহাস-আশ্রয়ী অনুমাননির্ভর এই মানবিক দিকটি উদ্‌ঘাটিত করে তোলাই নাট্যকারের আসল কৃতিত্ব। আবার এইখানেই নাট্যকারের প্রকৃত বিপদ। মানবিক পরিচয় উদঘাটনে অতিরিক্ত মনোযোগ যদি চরিত্রটির ইতিহাস-পরিচয়কে উপেক্ষা করে, তাহলে কি হয় সে কথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুন্দরভাবে

বলেছেন–"সর্বজনবিদিত সত্যকে একেবারে উল্টা করিয়া দাঁড় করাইলে রসভঙ্গ হয়, হঠাৎ পাঠকদের যেন একেবারে মাথায় বাড়ি পড়ে। সেই একটা দমকাতেই বাক্য একেবারে কাত হইয়া ডুবিয়া যায়।"[৩২]

ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যকে সূত্রাকারে নিম্নে উপস্থাপন করা হল–

ক. মূল কাহিনী, ও প্রধান চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক হবে।

খ. নাট্যকার ইতিহাসের অন্ধ দাসত্ব করবেন না। স্বাধীন সৃজনশীল কল্পনায় ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোকে প্রয়োজনমতো বিশ্বাস্য মানবিক রূপ দেবেন। এর জন্যে অনৈতিহাসিক দু'একটি চরিত্র ও ঘটনা যুক্ত করা চলতে পারে।

গ. বহু ঘটনা ও উপাদান বিচ্ছিন্নভাবে থাকে ইতিহাসে। এগুলি গ্রহণের সময় তিনি সতর্কভাবে নির্বাচন করবেন। নিজ উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আবশ্যিক ঘটনাগুলিকে তিনি সজ্জিত করবেন। ঘটনা-সন্নিবেশ এমন হবে যাতে বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন ঘটনাগুলি একটি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়।

ঘ. নাট্যকারের মূল পরিকল্পনা বা ধারণাটি ইতিহাসের মূল চরিত্রকে অবলম্বন করে রূপায়িত হবে। বাইরের ইতিহাস-পরিচয়ের আধারেই জীবনরসপূর্ণ সেই সমগ্র রূপের চিত্র অঙ্কন করতে হবে। ইতিহাসের বাস্তবতা ও কল্পনার সম্ভাব্যতার মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য চাই। জীবনসম্পর্কিত তাঁর বোধ বা ধারণাটিকে মূলচরিত্রের মধ্যে স্থাপন করে তিনি যখন পরিকল্পনাটি রচনা করবেন, তখন তা যাতে প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস-সত্যের বিরোধী না হয়, সেদিকে বিশেষ সতর্ক হতে হবে।

ঙ. যে যুগ ও কালের পরিচয় নাটকে স্থান পাচ্ছে, সেই যুগের রীতিনীতি, আচার-বিচার, সংস্কার, জীবনাদর্শ প্রভৃতিকে যতদূর সম্ভব বাস্তবতার সঙ্গে তুলে ধরতে হবে।

চ. ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি যে 'কালের সারথি' একথা মনে রেখে তাদের ক্রিয়াকলাপ ও পরিচয়ে অসাধারণত্বের ছাপ ফুটিয়ে তুলতে হবে। তাদের ভাষার আভিজাত্য ও আচরণের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে হবে।

ছ. ইতিহাসের দাবি ও নাট্যকারের দাবি পরস্পর বিপরীত হলেও দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য যত্নবান হতে হবে এবং মূলত নাট্যকারকে জীবনবোধের প্রেরণায় চালিত হতে হবে।

বাঙলা নাট্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদনের সময় থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বহু ঐতিহাসিক নাটক লিখিত হয়েছে। দিল্লী ও রাজপুতানার ইতিহাস বাঙালী নাট্যকারদের ওপর দীর্ঘকাল ধরে আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে। মধুসূদন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে শুরু করে যোগেশ চৌধুরী, শচীন সেনগুপ্ত, মহেন্দ্রগুপ্ত, মন্মথ রায়, নিশিকান্ত প্রমুখ নাট্যকারগণ বহু ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন। জাতীয় ভাবাবেগ, রোমান্সরস, দেশপ্রীতি বাঙলা ঐতিহাসিক নাটকের ওপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে রাজপুতদের সংঘর্ষ ও বিদ্রোহাত্মক মনোভাবকে ঐতিহাসিক নাটকে দেখিয়ে বাঙালী নাট্যকারদের অনেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দেশবাসীর মনোভাবকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। কোথাও বা প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজদের সঙ্গে মুসলমান নবাবদের সংঘর্ষ দেখিয়ে দেশপ্রীতির সুরকে উচ্ছ্বসিত করা হয়েছে। কেউ কেউ রোমান্সের রসে ইতিহাসের সত্যকে বহুলাংশে লঙ্ঘন করেছেন। প্রচারধর্মিতা, কালানৌচিত্য দোষ, চমকপ্রদ

ঘটনা যোজনার প্রতি মোহ ও সামগ্রিকভাবে বৃত্তে ঐক্যরক্ষার ব্যাপারে ঔদাসীন্য ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সার্থকতার পথে বাধা দিয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতীয় উদ্দীপনা স্তিমিত হওয়ায় ঐতিহাসিক নাটক রচনার ধারাও প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। আবার হয়তো কোনো শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের হাতে নতুন প্রেরণায় এ ধারা উজ্জীবিত হতে পারে। সে যাই হোক, যাঁরা এ ধারাকে দীর্ঘকাল পুষ্ট করে এসেছেন তাঁদের কয়েকজনের রচিত নাটকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'ই বাঙলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। তাছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের '*পুরুবিক্রম*, '*সরোজিনী*, '*অশ্রুমতী*; গিরিশচন্দ্রের '*সিরাজদ্দৌল্লা*, '*মীরকাশিম*, '*ছত্রপতি শিবাজী*; দ্বিজেন্দ্রলালের '*চন্দ্রগুপ্ত*, '*রাণাপ্রতাপ*, '*সাজাহান*, '*নূরজাহান*; ক্ষিরোদপ্রসাদের '*আলমগীর*, '*অশোক*, '*বাঙ্গালার মসনদ;* যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর '*দিগ্বিজয়ী*; অপরেশচন্দ্রের '*অযোধ্যার বেগম*; মন্মথ রায়ের '*অশোক*, '*সাঁওতাল বিদ্রোহ*; নিশিকান্ত বসুর '*বঙ্গে বর্গী* প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

'সেমিরেমিস' (১৯২৬) নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'বাসন্তিকা' পত্রিকায়। তিন অঙ্কের দৃশ্যহীন নাটক। এই নাটক রচনার প্রসঙ্গে নাট্যকার মন্মথ রায় জানিয়েছেন, ''সেমিরেমিস' *Historians History of the World*-এর একটি আখ্যায়িকার অতি অস্পষ্ট ছায়াচিত্র। কল্পনাই ইহাকে বর্ধিত ও পুষ্ট করিয়াছে।" নাটকটি পড়ে কাজী নজরুল ইসলাম ৪.৭.২৭ তারিখে নাট্যকারকে একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন, ''সেমিরেমিস পড়ে কী যে আনন্দ পেয়েছি তা বলে উঠতে পারছিনে।

যতবার পড়ি ততবারই নতুন মনে হয়।...দুঃসাহসের দিক থেকে বলছি না––এর সৃষ্টির সার্থকতার পরিপূর্ণ দিক দিয়ে বলছি–– আমায় আর কারুর কোনো লেখা এত বিচলিত করে নি।"[৩৩]

সংক্ষেপে নাটকের কাহিনী হলো এসিরিয়ান সম্রাট নাইনাস ব্যাকট্রিয়া জয় করেছেন। যুদ্ধজয়ে ভারতবর্ষীয় যুবক স্টেব্রবেটস (সত্যব্রত) সেনাপতি ছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধজয়ে প্রধান কৃতিত্ব ছিল সম্রাটের অধীন শাসনকর্তা মেননের এক অজ্ঞাতপরিচয় বন্ধুর। দরবার-কক্ষে মেননের সেই বন্ধু এলেন। ছদ্মবেশ উন্মোচন করবার পর দেখা গেল, তিনি পুরুষ নন, এক অসামান্যা সৌন্দর্যময়ী নারী। নাইনাস স্বল্পক্ষণের মধ্যেই কামাসক্ত হয়ে এই নারীর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। এই ছদ্মবেশী নারীই হলেন সেমিরেমিস। ক্লিওপেট্রা ও নুরজাহানের মতো এই নারী সেমিরেমিসের মধ্যে অতুলনীয় রূপের সঙ্গে অপরিমিত কামলিপ্সা মিশেছিল। এর পরে স্টেব্রবেটসের কাছে নাইনাসের এক স্বীকারোক্তিতে জানা গেল, নাইনাস কন্যা সুসানা ও স্টেব্রবেটস উভয়ে ভাই বোন। চমকপ্রদ নাটকীয় পরিস্থিতিতে জানা যায় ভোগলিপ্সু নাইনাস স্টেব্রবেটসের সৎ পিতা। সুসানা ও স্টেব্রবেটস উভয়েই একই মায়ের গর্ভজাত দুই পিতার ঔরসজাত সন্তান। ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ স্টেব্রবেসের ক্ষোভের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে যখন সেমিরেমিসের আদেশে স্টেব্রবেটস সম্রাট নাইনাসকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। সুসানা এত কিছু জানে না। এদিকে সেমিরেমিস স্টেব্রবেটসকে নিয়ে সসৈন্যে সিন্ধুতীরে উপস্থিত হলেন। সুসানা সেমিরেমিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সেমিরেমিসের সৈন্যদের আক্রমণ করে। স্বয়ং সেমিরেমিস তীরবিদ্ধ হয়। কিন্তু তিনিই শেষকালে ছদ্মবেশে এসে স্টেব্রবেটসের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন। স্টেব্রবেটস সেমিরেমিসের বুক থেকে তীর তুলে নিয়ে তাঁকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। এ নাটকে

সেমিরেমিসের মুখর পদচারণা লক্ষ্য করা যায়। সম্রাট নাইনাস এসিরিয়ান সম্রাট ছিলেন। সুদূর এসিরিয়া থেকে সেমিরেমিস ছুটে এসেছেন এদেশে এবং সেমিরেমিস যুদ্ধে জয় লাভ করলেও নাটকের শেষাংশে দেখা যায় স্টেব্রবেটসকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করাই সেমিরেমিসের উদ্দেশ্য ছিল। নাটকের শেষাংশে সেমিরেমিসের করুণ মৃত্যু ঘটে, আর স্টেব্রবেটস পারস্য ও পাঞ্জাবের অধীশ্বর হিসাবে এদেশে থেকে যান। এই নাটকে সুসানা ও স্টেব্রবেটস ভাই-বোন, তেমনি চমকপ্রদ খবর হল সেমিরেমিস ও স্টেব্রবেটস উভয়েই ভাই-বোন। সুসানা ও স্টেব্রবেটস উভয়ে একই মায়ের গর্ভজাত দুই পিতার সন্তান। সুসানার পিতা সম্রাট নাইনাস আর স্টেব্রবেটসের পিতা ভিনদেশী রাজা যিনি সম্রাট নাইনাসের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তেমনিভাবে সেমিরেমিস ও স্টেব্রবেটস একই পিতার ঔরসজাত দুই মায়ের সন্তান। নাট্যকার মন্মথ রায় মূল কাহিনীর মধ্যে উপকাহিনী যুক্ত করেছেন। কিন্তু নাট্যকার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মূল কাহিনী ও উপকাহিনীকে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেছেন যাতে করে নাটকের শেষ পর্যন্ত দর্শকের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে। মূলত 'সেমিরেমিস' নাটকে বহুজাতিক সংকটকে দেখানো হয়েছে। এ নাটকে মূল প্লটের সাথে অনেকগুলো গৌণ প্লট যুক্ত হয়েছে। আর তাই এ নাটকের কাহিনী জটিল হয়ে উঠেছে।

লেখকের কথা অংশে মন্মথ রায় স্বীকার করেছেন 'রঙমহল'-এর প্রযোজক সতু সেনের আগ্রহে ও উৎসাহে **'অশোক'(১৯৩৩)** নাটকটি লেখা শেষ করেন। ইতিহাস নিয়ে নাটক লেখার এটিই তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা। সর্বদা নতুন পাত্রে রস পরিবেশনের ইচ্ছাই তাঁকে একাজে নিয়োজিত করেছে বলে মনে হয়। ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে তাঁর ইতিহাস চেতনা অধিক কাজ করেছে বলে মনে হয় না।

মূলত রঙ্গমঞ্চের প্রযোজকদের চাহিদাই তাঁকে এই ধরনের নাটক লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। পৌরাণিক নাটকগুলিতে যেমন নাট্যরস সৃষ্টি করে তিনি যথেষ্ট সফল হয়েছিলেন, তেমনই নাটকীয় দ্বন্দ্বমুখর ঐতিহাসিক নাটক সৃজনের ক্ষেত্রেও তিনি সে ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।

চণ্ডাশোকের ধীরে ধীরে ধর্মাশোকে পরিবর্তিত হবার সেই পরিচিত ঐতিহাসিক কাহিনীই এ নাটকের বিষয়বস্তু। সম্রাট অশোকের সমগ্র জীবন দুটো ভাগে বিভক্ত ; প্রথম ভাগে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সম্রাট হিসাবে যিনি সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য নির্বিচারে হত্যা-লুণ্ঠন করেছেন। তাঁর সাম্রাজ্য ছিল বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। পরবর্তীতে একটি বিশেষ ঘটনা তাকে হত্যা-লুণ্ঠন-রাজ্য বিস্তারের প্রতি নিস্পৃহ করে তোলে। প্রথম যৌবনে সবার অজান্তে একটি বিবাহ করেন। সামাজিকভাবে অস্বীকৃত বিবাহ বলে সেই নারীকে অপবাদ, লাঞ্ছনা, নির্যাতন সহ্য করতে হয়। একইসাথে প্রথমা স্ত্রীর প্রতি অবহেলা সম্রাট অশোককে প্রতিনিয়ত মর্মবেদনায় দগ্ধ করত। প্রথমা স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার জন্য অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রথমা স্ত্রী সম্রাট অশোকের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারা যান। এই দুঃসহ যন্ত্রণা, গ্লানিবোধ তাকে কোন প্রাণীকে হত্যা অথবা সামান্যতম কষ্ট দেয়া থেকে নিবৃত রাখে। ক্রূর-অত্যাচারী অশোক শান্তির অন্বেষায় রাজত্ব ত্যাগ করে ক্রমান্বয়ে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হয়ে ওঠেন। এমনকি তার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে দান করেন। উল্লেখ্য যে তাঁর প্রথমা স্ত্রী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ভগবান উপগুপ্তের একনিষ্ঠ সাধক প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি দেহমনে সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হয়ে ওঠেন। প্রচণ্ড প্রতাপশালী সম্রাট অশোক জীবহত্যা করে যে

আনন্দ পেতেন পরবর্তীতে সেই অশোক জীবহত্যার ঘোরতর বিরোধী হয়ে ওঠেন। শান্তি-সাধনা-পরিতৃপ্তি–এই নীতিতে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে এর সার্থকতার কথাও অকুণ্ঠভাবেই উল্লেখ করতে হয়। এ নাটকে বীরত্বব্যঞ্জক পরিবেশ সৃষ্টি, ঘটনার ঘনঘটা, তীব্র ঘাত-প্রতিঘাতে গড়ে ওঠা, চরিত্র ও তাদের শক্তিদীপ্ত রূপ সবই আছে। ধর্মপ্রকৃতি আর চণ্ডপ্রবৃত্তির মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্লান্ত পৃথিবীর অন্যতম প্রতাপশালী সম্রাট অশোকের জীবন এ নাটকে চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে। ইতিপূর্বে গিরিশচন্দ্র ঘোষও অশোকের জীবন বৃত্তান্ত অবলম্বন করে নাটক রচনা করেছিলেন। সে নাটক মঞ্চে অভিনীত হবার গৌরবও লাভ করেছিল। কিন্তু তাতে অলৌকিকতার ভাব ছিল বেশি, তত্ত্বকথাও নাট্য বক্তব্যকে ভারবহ করে তুলেছিল। কিন্তু মন্মথ রায় ঐতিহাসিক তথ্যের সত্যানুসরণের সাথে সাথে অশোকের মানবিক পরিচয় দেবার ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে সার্থক হয়েছিলেন। এইখানেই তিনি বিশিষ্ট। এ নাটকের পরিসমাপ্তি কোনো বিয়োগান্তক দুঃখের অনুভূতি জাগায় না বরং করুণায়, ক্ষমায় মনকে স্নিগ্ধ করে রাখে। বিংশোত্তর কালের আধুনিকতায় মন্মথ রায়ের অশোক কিছুটা জটিল। সে জটিলতা চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের মনস্তাত্ত্বিক আবর্ত ঘিরেই রয়েছে। তাই দেখি, এ নাটকে প্রেম আর প্রতাপের সঙ্গে জীবনের বিরোধ পরিস্ফুট হয়েছে। দেবী চরিত্রটি নাট্যকারের সম্পূর্ণ মনগড়া। দেবীর প্রতি অশোকের প্রেম, তাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা সমস্তই নাট্যকারের কাল্পনিক সৃষ্টি। তিষ্যরক্ষিতার চরিত্রটিও নাট্যকার চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

১৯৩৩ সালের ২রা ডিসেম্বর 'রঙমহলে' 'অশোক' প্রথম মঞ্চস্থ হয়। ৯ই জানুয়ারি ১৯৩৪ সালে গ্রন্থটি পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ নাটকে ১২টি গান রয়েছে। অখিল নিয়োগী 'অশোক'–এর গান রচনা করেছিলেন। নিতাই মতিলাল সুরকার ছিলেন। চারু রায় পরিচ্ছদ-পরিকল্পনায় ছিলেন। সিদ্ধেশ্বর মিত্র কারু-চিত্র পরিকল্পনায় ছিলেন। নৃত্য পরিচালক ব্রজবল্লভ পাল। প্রযোজনায় রবি রায় এবং নরেশ মিত্র পরিচালনায় ছিলেন।[৩৪]

'*আমোদ*'(৩য় বর্ষ ১৬শ সংখ্যা,২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৪০)পত্রিকায় নাটকটি সম্পর্কে যে মন্তব্য করে তা হল: "অশোক নাটকখানি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে বিশেষিত হলেও এতে Mythology-র যথেষ্ট ছোঁয়া আছে। তাহলেও Mythological উপাদান নাট্যকারকে যেরূপ স্বাধীনতা দিয়ে থাকে সে স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ না করেও নাট্যকার মন্মথ রায় 'অশোক' নাটকে ইতিহাসের সম্মানই রক্ষা করেছেন সর্বত্র...কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের আমল থেকে ঐতিহাসিক নাটক রচনার যে রীতি চলে আসছে সে গতানুগতিক ইতিহাসবিরোধী পন্থার অনুসরণে তিনি এদিক দিয়ে একটা দুঃসাহস ও গৌরবের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর নাটক হয়ে উঠেছে ঘটনা প্রধান নয়, চরিত্র প্রধান।"[৩৫]

'*দীপালী*' (৫ম বর্ষ ৩৭ সংখ্যা, ২১ অগ্রহায়ণ ১৩৪০) পত্রিকায় লেখে:''নাট্যকারের মুন্সিয়ানা দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। অশোকের জীবনে যে দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ চলেছে এবং পশু শক্তির প্রভাব মুক্ত হয়ে পরিশেষে যেভাবে অশোকের মগ্নচৈতন্যের আত্মবিকাশ ঘটেছে তা সম্পূর্ণভাবে উচ্চাঙ্গ ড্রামার বিষয়বস্তু। নাটকে ব্যবহৃত দেবী চরিত্রটিও সম্পূর্ণ নাট্যকারের মনগড়া।"[৩৬]

দেবী চরিত্রটি কেমন হয়েছিল তা জানা যায় '*Amrita Bazar Patrika*'-র (১৪.১২.১৯৩৩) মন্তব্য পড়লেই: "... The development of the third act, second scene and the climax reached at Devi's death at the unconscious hands of Ashoke do credit to the dramatists conception and excecution.[৩৭]

'*Advance*' (২৮.১.৩৪)-পত্রিকায় লেখা হয়েছিল : "*In his recent drama 'Asoke' he has a maturity of style...There is nofaulty lines.*"[৩৮]

সম্রাট অশোক শুধু ভারতেরই নয়, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট–একথা ঐতিহাসিকরাই বলে থাকেন। সেই মহান ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিগত জীবনের এমন আশ্চর্য উত্থান পতনের ছবিকে নাটকের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করার সাহস অভিনন্দন পাবার যোগ্য। মন্মথ রায় সেই কাজটি খুব অনায়াসে করেছিলেন। ঘটনার সমাবেশে, বিভিন্ন চরিত্রের সংযোজনায় সর্বোপরি মগধ তথা ভারতের পটভূমি সৃজনে মন্মথ রায় প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আর অশোক চরিত্রটি যাকে ঘিরে নাটকীয় ইতিবৃত্তের আবর্তন তাঁর সম্পর্কে মনে হয় যেন অকস্মাৎ জানালা খুলে এক মহান ব্যক্তিত্বকে চকিতে দেখা–পুরোপুরি বোঝার আগেই যেন সে চরিত্রের মিলিয়ে যাওয়া।

পঞ্চাঙ্কে রচিত **'মীরকাশিম'(১৯৩৮)** ঐতিহাসিক নাটকটি নাট্যকার মন্মথ রায় প্রবোধচন্দ্র গুহকে উৎসর্গ করেছিলেন। 'মীরকাশিম' লিখতে গিয়ে 'লেখকের কথা' অংশে তিনি বলেছেন, "এ নাটকে ইতিহাস বিকৃত হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস।" এ নাটক রচনার সময় তিনি বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে মীরকাশিম-এর ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করেছেন। যেমন:

Long's Selections from unpublished records of British India, History of Bengal Army, Torren's *Empire in Asia*, Wheeler's *Early Records of British India, Rise of the Christian power in British India* (Major B.D Bose), Akshoy Kumar Maitra *Mirkashim,* Seir-ul-Mutakher in *Duttas Economic History of British India,* Brojendra Bandopadhyay's *paper on Mirkashim*.[৩৯]

দেশাত্মবোধ জাগ্রত করবার লক্ষ্য নিয়ে নাট্যকার মন্মথ রায় মীরকাশিম রচনা করেন। মীরকাশিম -এ তাঁর গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বিশ্বাসঘাতকের দুরভিসন্ধি ও চতুরতায় ভারতবর্ষের যে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছিল, শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাশিমের হৃদয়ে তা কতটা দ্বন্দ্বে ও বিক্ষোভে আলোড়িত হয়েছিল এই নাটকে সেই আলোড়নের রক্তরাঙা অধ্যায় করুণ অথচ বীর্যদীপ্ত ভঙ্গিতে বিবৃত হয়েছে। পরাধীন ভারতবাসীর মনে এ নাটক দেশাত্মবোধের চেতনা জাগ্রত করেছিল।

এই নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্র ও ঘটনা ইতিহাসানুগ হলেও অনেক সময় নাট্যকারের অতিমাত্রায় ইতিহাস-প্রবণতার কারণে বহির্জগতের ঘটনার প্রাচুর্য ও বিচিত্র চরিত্র সমাবেশের মধ্যে অন্তর্জগতের মানবিক আবেগ অনুভূতির প্রকাশ যেন অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই এ নাটকের পরিণতি-দৃশ্য আকস্মিক ও অতিনাটকীয় হয়ে উঠেছে। রণকোলাহল মুখর ইতিহাসের বাস্তব ছবি থাকলেও শাশ্বত হৃদয়ের আনন্দ-বেদনা-মিশ্রিত মানুষগুলির পরিচয় মেলে না। *অবশ্য মন্মথ* রায় ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রকে অনুসরণ করেছেন এবং দেশপ্রেমের যুগোচিত সুরটিকে তিনি

স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনাময় পরিবেশে তাঁর নাটকে সংবেদনশীল করে তুলতেও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এ নাটক হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মীরকাশিমের উৎকণ্ঠা এই ঐতিহাসিক সত্যকেই প্রকাশ করেছে। মন্মথ রায় তাঁর বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিনির্ভর মন নিয়ে সমালোচকের দৃষ্টিকোণ থেকে এ নাটকের মধ্যে দিয়ে দেশ ও জাতিকে তাদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছেন। তাই 'মীরকাশিম' নাটকে নবাব মীরকাশিম-এর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়,

"সাহসের অভাব ছিল না, অর্থের অভাব ছিল না, অস্ত্রের অভাব ছিল না, কিছুরই অভাব ছিল না, অভাব ছিল দেশাত্মবোধের–অভাব ছিল মনুষ্যত্বের।" মীরকাশিমের আত্মানুশোচনার মধ্যে দিয়ে সেই উপলব্ধির স্বরূপ ফুটে উঠেছে। যে দেশের মানুষ নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা হলেই সুখী, তারা দেশ বোঝে না–দেশ চায় না। নাট্যকার আত্মবিশ্লেষকের ভূমিকা থেকে বেইমানীর ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করে একজন দেশপ্রেমিক নাট্যকারের সঠিক ভূমিকা পালন করেছেন। দেশবাসীকে সঠিক পথটি নির্দেশ করেছেন।

১৯৩৮ সালে নাট্যনিকেতনে 'মীরকাশিম' মঞ্চস্থ হয়। অমর বসু সুরকার ছিলেন। নীহারবালা নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন। ছবি বিশ্বাস নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এ নাটকও সেন্সারের ছুরিতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। নাট্যকার নিজে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: "দেশাত্মবোধক নাটক মীরকাশিম সেন্সারের ছুরিকাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হলেও, নট সম্রাট ছবি বিশ্বাসের সুঅভিনয়ে জাতীয় উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়নি।"[৪০]

নরেশ মিত্র খোজা পিদ্রুসের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তাঁর অপূর্ব চরিত্রচিত্রণ এ প্রযোজনায় নাটকটি স্মরণীয় হয়ে আছে। যদিও নাট্যনিকেতনে এ নাটকটি খুব বেশি দিন চলেনি, তবুও সামগ্রিক প্রযোজনায় উন্নতমানের গুণে এ নাটক দর্শকদের মনে দাগ ফেলেছিল। এ নাটক দেখে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার আশা পোষণ করেছিলেন, "বর্তমান যুগে এই নাটকখানি বিশেষ আদর পাইবে আশা করি।"[৪১]

'*আনন্দবাজার*' (১৯৩৮) পত্রিকা এ নাটকটি সম্পর্কে লিখেছিল: ''ঐতিহাসিক সত্য অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় অনবদ্য নাটক সৃষ্টি করিয়াছেন।"[৪২]

'*Amrita Bazar*' (১৯৩৮) পত্রিকায় লিখেছিল:

> History tells us that it was Mirkasim who actually captured Siraj at Bhagawangola. Mr. Manmatha Roy has convinced us that inspite of his past misdeeds Mirkasim was the last great Nawab of Bengal who really deserves our sympathy and respect. He was the last independent Nawab of Bengal who made the supreme sacrifice to save Indian marchants from imminent ruin.[৪৩]

১৯০৬ সালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ মীরকাশিম নাটকটি রচনা করেন। ১৯০৬ খ্রী: ১৬ই জুন মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে সন্ধ্যা ছ'টায় এ নাটকটি অভিনীত হয় । মীরকাশিম সে যুগে জনপ্রিয়তা পায় এবং এই জনপ্রিয়তার ফলেই তৎকালীন বৃটিশ সরকার এর অভিনয় বন্ধ করে দেয় ও নাটকটি বাজেয়াপ্ত করে। বঙ্গভঙ্গের প্রশ্নে উদ্বেলিত বাঙালীর জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধ এ নাটকে প্রকাশিত হয়েছিল।

বাজেয়াপ্ত হবার পর মীরকাশিমকে নিয়ে দীর্ঘদিন কোনো নাটক লেখা হয়নি। কিন্তু ১৯৩৮-এ শচীন সেনগুপ্তের সিরাজদ্দৌলা যখন জনপ্রিয়তার শীর্ষদেশে পৌঁছে গেল এবং ইংরেজ সরকার তার ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করল না, তখন নাট্যনিকেতনের স্বত্বাধিকারী প্রবোধচন্দ্র গুহের অনুরোধে মন্মথ রায় 'মীরকাশিম' নাটকটি লিখলেন। বিভিন্ন বই থেকে তিনি এ ব্যাপারে সাহায্য নিয়েছিলেন। যে-সব বই পড়ে মন্মথ রায় মীরকাশিম নাটক রচনায় সাহায্য পেয়েছিলেন তার কোনটিতেই মীরকাশিমকে দেশপ্রেমী বা শহীদ বলে উল্লেখ করা হয়নি। তবুও গিরিশচন্দ্রের মীরকাশিমের তুলনায় মন্মথ রায়ের মীরকাশিমের স্বাতন্ত্র্য উল্লেখযোগ্য।

গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে বহু ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন, কিন্তু মন্মথ রায় মাত্র কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে মীরকাশিমের জীবন দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন। দুটি নাটকের রচনা শৈলীতেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। গিরিশচন্দ্রের নাটকে ছোট ছোট নানা ঘটনায় মীরকাশিমের জীবনের ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। মন্মথ রায়ের এই পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটকে দৃশ্য সংখ্যা মাত্র সাতটি। মূল নাটককে মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে নাট্যকার যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ৩য় পরিচ্ছেদ

গ. পূর্ণাঙ্গ নাটক

তৃতীয় পর্ব : সামাজিক নাটক

ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বা ঘটনা, কিংবা পুরাণ-বর্ণিত ঘটনা বা চরিত্রকে নিয়ে যেমন নাটক লেখা হয়েছে, তেমনি বাস্তব জগতের সামাজিক মানুষের জীবনকে আশ্রয় করে প্রচুর নাটক লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে। নাটকের বিষয় যদি মানব জীবন হয়, তাহলে সে-জীবন সম্পূর্ণরূপে সমাজ নিরপেক্ষ

হতে পারে না। ঐতিহাসিক নাটকের চরিত্র এমনকি ভক্তিরসাত্মক পৌরাণিক নাটকের চরিত্রও একটি বিশেষ সমাজের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত। কিন্তু এই দুই ধরনের নাটকের প্রধান চরিত্রগুলির সঙ্গে সমাজ-সমস্যাকে বড় করে দেখা হয় না। একটিতে ঐতিহাসিক রস ও অন্যটিতে ভক্তিরসকেই মুখ্য করে তোলা হয়। সুতরাং ইতিহাস ও পুরাণরাজ্যের প্রভাবের বাইরে সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবন, তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তির নানা সমস্যা, সমাজের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে তার নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, পরিবারের বহু সমস্যা প্রভৃতিকে নিয়ে যে নাটক কল্পিত হয়, তাকেই আমরা সামাজিক নাটক বলতে পারি।

সামাজিক শব্দটির অর্থ-ব্যাপকতা খুব বেশি। কোনো নাটকে সমাজের রূপটি ব্যক্তিকে আশ্রয় করে ব্যক্তির সঙ্গে বোঝাপড়ায় প্রকাশিত, কোথাও বা একটা গোটা পরিবারকে আশ্রয় করে তার মধ্য দিয়ে বিকশিত, আবার কোথাও তা নানা স্তরের বা কোনো একটি স্তরের মানুষদের জীবনচিত্র উপস্থাপনে সীমাবদ্ধ। এই সকল ক্ষেত্রে সমাজের রূপটি কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনো বা তেমন প্রত্যক্ষ নয়। এই হিসেবে সামাজিক নাটককে কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা চলে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব বলে সমাজের রীতি-নীতি বা আদর্শের সঙ্গে বোঝাপড়া করেই তাকে চলতে হয়। সমাজ মানুষেরই সৃষ্টি–সমাজের বিধি-নিষেধ একটি বিশেষ কালে মানুষের কল্যাণের জন্যে স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু যুগের পরিবর্তনে, ব্যক্তির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য দেখা দেওয়ায় চিরায়ত সমাজ-বিধিকে অনেক সময় সে মেনে নিতে পারে না। এখানেই ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কখনো অতিপ্রবলভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে, তার স্বাধীন কামনা-বাসনাকে সমাজবিধি দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরে, কখনো নিরবে তার অশরীরী প্রভাব

ব্যক্তির জীবনে ঘোরতর আলোড়ন সৃষ্টি করে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে সমাজশক্তির রূপটি ব্যক্তির মনের গভীরে দৃঢ় আসন পেতে বসে ও তার ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে বিরোধ বাধায়। প্রথমটিতে সমাজ শক্তির প্রতিনিধি কিছু সংখ্যক ব্যক্তির সঙ্গে নাটকের নায়কের প্রত্যক্ষ বহির্সংঘাত, শেষেরটিতে মানস সংঘাত। উভয় ক্ষেত্রে সমাজের রূপ বা সমাজশক্তিকে আমরা বিশেষভাবে অনুভব করতে পারি, এগুলি ব্যক্তি সমস্যামূলক সামাজিক নাটক। আবার কখনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা বা তার নিজস্ব সমস্যার চেয়ে একটি পরিবারের সমস্যাই অনেক নাটকে প্রধান হয়ে উঠতে পারে; সমাজশক্তির মৃদু বা প্রবল প্রভাবের ফলে একটা পরিবার কি রূপ নিয়েছে, তার বিভিন্ন পাত্রপাত্রী চিরায়ত সমাজশক্তিকে উপেক্ষা করে মোহময় নতুন সমাজের আদর্শকে অনুকরণের ফলে যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তার সঙ্গে পরিবারের কর্তাকে বোঝাপড়া করতে হয়। এখানে নায়ক-প্রতিনায়ক একই পরিবারের অন্তর্গত এবং নিকটজন, আর তাদের আচরণ সমাজ-প্রভাবের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ফল। একটি শান্তিপূর্ণ পরিবারের শোচনীয় পরিণাম এখানে দেখানো হয়। এই ধরনের সামাজিক নাটককে পারিবারিক নাটক বলা উচিত।

আর এক ধরনের সামাজিক নাটক আছে যেখানে সমাজের নানা স্তরের মানুষের বা কোনো একটি বিশেষ স্তরের মানুষদের আচার-আচরণ, জীবনাদর্শ, রীতিনীতি, সংস্কার-বিশ্বাস, তাদের জীবনের পরিচয় বা নানা সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়। শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, কেরাণি, শিক্ষক, আদিবাসী নানা শ্রেণির মানুষের জীবন এখানে রূপায়িত হয়েছে। এ জীবন কখনো সমাজ-সমস্যা কেন্দ্রিক আবার কখনো ঐ বিশেষ শ্রেণির মানুষদের মানসিকতার জন্যে তা সমস্যাকেন্দ্রিক নয়। কিন্তু তাই

বলে সমাজ এখানে অনুপস্থিতও নয়। প্রথমটিকে সমস্যামূলক নাটক (Problem Drama) ও দ্বিতীয়টিকে সাধারণভাবে সামাজিক নাটক বলা যেতে পারে।

আধুনিক কালে মানুষের মধ্যে সমাজসচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের জীবন ছিল সহজ ও সরল। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে নানা চিন্তায়, নানা সমস্যায় ও মতবাদে জীবন জর্জরিত ও জটিল। সমাজ রচিত নীতি-আদর্শের সঙ্গে অনেকদিন থেকে মানুষের মোকাবিলা শুরু হলেও এখন তা অত্যন্ত বেশি। সেজন্যে সামাজিক নাটকের চাহিদা এখন বেশি। নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বা সুখ এখন জীবনে সহজলভ্য নয়। জিজ্ঞাসা, তর্ক, সংশয় বিদ্রোহাত্মক মনোভাবই চিন্তাশীল মানুষের জীবনে প্রধান হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক সমস্যা, জাতিভেদ সমস্যা, বিবাহ-সমস্যা, বাসস্থান-সমস্যা, নানা রাজনৈতিক সমস্যা প্রভৃতি বহু কিছুর ভাবনায় নাট্যকারগণ বিব্রত। পাশ্চাত্যের ইবসেন, বার্নার্ড শ', গলসওয়ার্দি প্রমুখ নাট্যকার এ সম্পর্কে বহু মূল্যবান নাটক লিখেছেন এবং এখন আরও অনেকে এই ধরনের নাটক লিখে চলেছেন। যে সমস্যাটিকে নাট্যকার রূপ দিতে চান, বা যার প্রভাবটিকে তুলে ধরতে চান, তার প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ রূপটিকে স্পষ্ট করার দক্ষতায় এবং বস্তুতান্ত্রিক পথে সমস্ত কিছুর উপস্থাপন-নৈপুণ্যে এ নাটকের সাফল্য নির্ভর করে। অধ্যাপক নিকল-মিনান্ডারের 'Arbitration' নামক প্রেম-মুখ্য কমেডিকে Problem Drama বলেছেন। স্পেনের লোপ. ডি ভেগার '*Marriages of Conveniences*'-এ (1621) প্রেম ও অর্থের দ্বন্দ্বঘটিত কাহিনীতে অষ্টাদশ শতকের প্রেম বা সমস্যামূলক নাটকের আভাস লক্ষ্য করেছেন। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকেও এ জাতের নাটক অনেক লেখা হয়েছে। বাস্তব ধর্মী বা অতিবাস্তব ধর্মী নাটকগুলি (ফ্রান্সের Dumas Fils, Augier) উনিশ

শতকের ফ্রান্সে বারবনিতা সমস্যা, জারজ সন্তান সমস্যা, লোভের ভয়াবহতার সমস্যা নিয়ে সামাজিক নাটক লেখেন। ইংল্যান্ডে এ ধারাকে বার্নার্ড শ', গলস্ওয়ার্দি, জন হ্যানকিন, গ্র্যানভিল বার্কার প্রমুখ নাট্যকার বহন করেছিলেন।[৪৪]

বাঙলা সামাজিক সমস্যা-মূলক নাটক হল রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব (কৌলীন্যপ্রথা জনিত সমস্যা), *নবনাটক*, (বহুবিবাহ জনিত সমস্যা), *চক্ষুদান*, (লাম্পট্য বিষয়ক সমস্যা), *উভয়সঙ্কট* (সপত্নী জনিত সমস্যা), মধুসূদনের '*একেই কি বলে সভ্যতা* (লাম্পট্য ও মদ্যপান জনিত সমস্যা), উমেশচন্দ্র মিত্রের '*বিধবাবিবাহ* (বিধবাবিবাহ জনিত সমস্যা) প্রভৃতি। অনাদৃত মধ্যবিত্ত জীবনের নানা সমস্যা বিধায়ক ভট্টাচার্যের '*ক্ষুধা*, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের '*মোকাবিলা*, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের '*কেরানীর জীবন*, সুনীল দত্তের '*হরিপদ মাষ্টার* ইত্যাদি নাটকে ফুটে উঠেছে। মন্মথ রায়ের '*জীবনটাই নাটক*', বীরু মুখোপাধ্যায়ের '*সাহিত্যিক*' প্রভৃতি নাটকে শিল্পীর দুঃখময় জীবনের চিত্র আছে। দলিল সেনের '*মৌচোর*', মালিক-শ্রমিকের বিরোধ নিয়ে উৎপল দত্তের '*অঙ্গার*, *ঘুম নেই*, মন্মথ রায়ের '*ধর্মঘট*' প্রভৃতি আঞ্চলিক জীবনের পীড়িত রূপ ফুটে উঠেছে। পারিবারিক সামাজিক নাটকের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের '*প্রফুল্ল*, *বলিদান*, বিধায়ক ভট্টাচার্যের '*মাটির ঘর*, *বিশ বছর আগে* ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। সাধারণ সামাজিক নাটক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গোড়ায় গলদ*, অয়স্কান্ত বক্সীর *ভোলা মাষ্টার*, যোগেশ চৌধুরীর *পরিণীতা* ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

ত্রিশ-এর দশক থেকে বাঙালীর জীবনে সংকটের সূচনা হয়েছিল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতিতে অস্থিরতা দেখা গিয়েছিল। স্বাধীনতাহীন মানুষের জন্য কোন পথটি সঠিক এটি

স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছিল না। এই পরিস্থিতিতেই নাট্যকার মন্মথ রায় দায়িত্বশীল সমাজ সচেতন একজন নাট্যকারের সঠিক ভূমিকাই পালন করেছিলেন। এমন দুটি ঐতিহাসিক চরিত্রকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন যারা নিজের তাগিদে মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। প্রথম জন অশোক, দ্বিতীয়জন মীরকাশিম-একজন হিন্দু (পরে বৌদ্ধ),অন্যজন মুসলমান। ত্রিশ-এর দশকের টালমাটাল পরিস্থিতির নিরিখেই নাট্যকাররা সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাই মন্মথ রায় এমন দুটি চরিত্রকে বেছে নিয়েছিলেন যাঁরা মানবতাকে স্বাধীনতার চেয়ে বড় মনে করেছেন যা অসাম্প্রদায়িক মনোভাবেরই পরিচায়ক।

১৯৮৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'যোগাযোগ' চিত্রের কাহিনী অবলম্বনে ভারতবর্ষ পত্রিকায় **'মমতাময়ী হাসপাতাল' (১৯৫২)** নাটকটি প্রকাশিত হয়। ডাক্তার দীনদয়াল চৌধুরী মৃতা স্ত্রীর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে মদনপুর গ্রামে 'মমতাময়ী হাসপাতাল' নামে একটি হাসপাতাল তৈরি করেন। দীনদয়ালের একমাত্র পুত্র জয়ন্ত কলকাতায় ডাক্তারী পড়ে। হঠাৎ পিতাকে জানায় যে সে বিবাহ করেছে, তার কিছু অর্থের প্রয়োজন, পিতা পুত্রবধূ দেখতে আসতে পারেন ভেবে সে অর্থের বিনিময়ে একজন সম্ভাবনাময় চিত্রাভিনেত্রীকে একরাত্রির জন্য তার স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ করেন। দীনদয়াল কলকাতায় এলেন। বধূরূপী জয়া মিত্রকে তার যেমন ভালো লাগল তেমনি জয়া মিত্রেরও এই আত্মভোলা বৃদ্ধটিকে ভালো লেগে গেল। সে বৃদ্ধ শ্বশুরের অনুরোধে তার সঙ্গে মদনপুর গ্রামে চলে গেল। মদনপুর গ্রামের মমতাময়ী হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তার ভূজঙ্গের দুর্নিবার ক্ষমতা

ও অর্থের লোভে দীনদয়ালকে উন্মাদে পরিণত করা থেকে নাটকে জটিল পরিস্থিতি শুরু হয়। কিন্তু নাটকের শেষে জটিল পরিস্থিতি মিলনান্তকভাবে পরিসমাপ্তি ঘটে।

করুণ রসঘন অথচ মিলন মধুর কাহিনী বিন্যাসে, স্বচ্ছন্দ সংলাপে নাটকটির প্রথম অঙ্কের কৌতুককর ঘটনা দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে আর দেখা যায় না। আত্মভোলা বৃদ্ধ দীনদয়ালের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল সৃষ্টি ও তাকে হেনস্থা করার দুঃখজনক নাটকীয় ঘটনা, ভূজঙ্গের হীনচক্রান্ত ও দীনদয়ালের অসহায়ত্ব বাস্তব বলে মনে হয় না। কিন্তু নাটকে অতি নাটকীয় প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও একথা মনে হয় যে নাট্যকার মানব জীবনের নষ্ট হয়ে যাওয়া মূল্যবোধগুলিকে ফিরিয়ে আনতে চান। সে কারণেই দেখি সামাজিক জীবনে মানুষের উপেক্ষা, বঞ্চনা, দুঃখ অভাবই যে মানুষকে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত করে এটি তিনি উপলব্ধি করেছেন ডাক্তার দীনদয়ালের মধ্যে দিয়ে। দীনদয়াল বলেন :

> যখনই খারাপ হয় তখন বুঝতে হবে লোকটির কোন ব্যাধি হয়েছে। ব্যাধিগ্রস্ত হলেই লোকে পাপকার্য করে, অসৎ হয়, হিংসুক হয়, কারো প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে, খারাপ কাজ করে। ব্যাধিটি সমূলে বিদূরিত হলেই লোকে তার স্বাভাবিক সুন্দর মনোবৃত্তি ফিরে পায়। চোর অথবা খুনী কোন ব্যাধির প্রকোপেই চোর বা খুনী হয়েছে নতুবা হতো না।[৪৫]

‘মমতাময়ী হাসপাতাল’ নাট্যকারের মৌলিক সৃষ্টি। প্রেম ও রোমান্সে গঠিত এক অপরূপ গল্পের নাট্যায়ন বলা যায়। মোট ১১টি চরিত্রের মধ্যে ১০টি পুরুষ, ১টি নারী চরিত্র। চার অঙ্কের এ নাটকের প্রথম অঙ্কে তিনটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে চারটি দৃশ্য রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

‘জীবনটাই নাটক’(১৯৫২)–এ অভিনেতা অভিনেত্রীর জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাতপূর্ণ জীবন সমস্যার তীব্র সংকটময় চিত্র ফুটে উঠেছে। এ নাটকে অভিনব এক আঙ্গিকের মাধ্যমে নাট্যকার মঞ্চশিল্পীদের জীবনের আনন্দ ও বেদনার ছবি এঁকেছেন। শেক্সপীয়ারের সেই বিখ্যাত উক্তি–‘জীবনটাই নাটক’–এই উক্তি মনে রেখে মঞ্চ ও বাস্তব জীবনের মধ্যে নাট্যকার আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়েছেন। অভিনয় শিল্পীরা জীবনের আনন্দ বেদনাকে অনবদ্যভাবে দর্শকের সামনে তুলে ধরেন। দর্শকের ঘনঘন মুগ্ধ করতালির নেপথ্যে তাদের বাস্তব জীবনের দুঃসহ বেদনা ঢাকা পড়ে যায়। শিল্পীদের কষ্টসাধ্য প্রাণান্তকর সাধনার খবর মানুষ রাখে না। রঙ্গমঞ্চের বাইরে যে তাদের একটা জীবন আছে, তারাও যে রক্তমাংসের মানুষ, তাদেরও যে হাসিকান্নায় মেশানো একটি জীবন আছে–নাট্যকার এ নাটকে সে জীবনের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করতে চেয়েছেন।

এ নাটকে শিল্পীদের বাস্তব জীবনের বিপর্যয় আর তাদের অভিনয় জীবনের কারণে ব্যক্তিগত জীবনে ক্ষয়ক্ষতির বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে। কৃষ্ণা এ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার সমস্যাই এ নাটকের কেন্দ্রীয় সমস্যা। মঞ্চে শিল্পীদের চরম আর্থিক দুর্গতির দিনে কৃষ্ণা নৈরাশ্যে ভেঙে পড়েনি। সে এসেছে কলাবতী থিয়েটারে অভিনয় করার জন্য, যদিও তার স্বামী মণিমোহন কৃষ্ণার থিয়েটারে যোগদান করাটা পছন্দ করে না । অথচ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল কৃষ্ণা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, নারীত্বের সম্মান ও মর্যাদা চায়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্রাচীন সংস্কার ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটেছে বলেই কৃষ্ণাকে বলতে শোনা যায় :

বিনে মাইনেতে বাড়ীর দাসী করে রেখেছিলে আমাকে। সুখ-দুঃখের ভাগ দাওনি কোনদিন...আমার মন কি চায়, জিজ্ঞাসা করনি কোনদিন। ঘরের বাইরে বড় যে জগৎ, সে ছিল একা তোমার, আমার তাতে কোন ভাগ ছিল না।...ঘর যাকে বলে তা তুমি কোনদিন করনি আমার সঙ্গে।[৪৬]

আত্মসম্মান নিয়ে, স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক যৌথ সহযোগিতার বিনিময়ে সে সুন্দর সুখী জীবন চায়–এই সুগভীর প্রত্যয় নাটকে উচ্চারিত হয়েছে। মূলত একদিকে স্বামীর অবহেলা, দায়িত্বহীনতা, কৃষ্ণাকে (প্রতিমা) প্রতিবাদী করে তোলে। অন্যদিকে স্বামী মণিমোহন তিন মাস ধরে বেতন না পাওয়ার অসহায়ত্ব সবকিছু মিলিয়ে নাটকের দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছায়। নাটকের শেষে মণিমোহন ও কৃষ্ণার (প্রতিমা) ভুল বোঝাবুঝির অবসানের পর মিলনের মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি ঘটে। এ নাটকে কৃষ্ণার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পূর্ণ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। অষ্টম দৃশ্যে স্বামী মণিমোহন স্ত্রী প্রতিমাকে থিয়েটার ছেড়ে দিতে বললে প্রতিমা জোর প্রতিবাদ জানায়,

এখন মেয়েদের ঘুম ভাঙছে। এ যুগের ক্ষতবিক্ষত জীবনযুদ্ধে স্বামীদের পাশেই দাঁড়াতে চাইছে তারা। পদতলে রাখতে চাও,তা থাকব না, মাথায় করে রাখ-তাও চাই না হাত ধরতে দাও তোমাদের সহধর্মিনী সহকর্মিনী কর আমাদের–এই দাবি।...আর এইই আমি চেয়েছিলাম এই জন্যেই আমি এসেছি। তুমি আমি একসঙ্গে বাঁচব, একসঙ্গে মরব, একসঙ্গে বড় হব, একসঙ্গে গড়ে তুলব আমাদের নতুন জীবনের স্বপ্ন– স্বপ্নের জীবন।[৪৭]

নাটকের স্থান মফস্বলের একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম, নাম চণ্ডীপুর। নাটকে উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হল, ম্যানেজার কৃতান্ত বাবু (আয়ান ঘোষ), মনিমোহন, কৃষ্ণা (প্রতিমা), শ্রীমতী কাবেরী (কুটিলাবেশী) শ্রীমতী মনোরমা (জটিলাবেশী) ড্রেসার রূপলাল, চাকর ভোলা, আনন্দ ঘোষাল (নন্দবেশী)। এ নাটকটি নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে উৎসর্গ করা হয়েছে। এটি দশ দৃশ্যের নাটক। নাটকটিতে ৫টি গানের ব্যবহার হয়েছে। নাটকের সংলাপ ব্যবহারে চরিত্রগুলো বাস্তব সম্মত হয়ে উঠেছে।

'জীবনটাই নাটক' ২৯শে জানুয়ারি ১৯৫৩-তে ছবি বিশ্বাসের পরিচালনায় মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল। প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক দেবকী বসু বলেছিলেন, "নাটকটি রচনায় মন্মথবাবু যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন তা সম্পূর্ণ সার্থক।"[৪৮]

ঔপন্যাসিক মনোজ বসু বলেছেন, "বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রায় শতাব্দীব্যাপী অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে–এটা হল নবীনতম। আমার তো মনে হয়, এই নাটক থেকে মঞ্চের নতুন চেহারা ফুটবার সম্ভাবনা হল।"[৪৯]

লেখক প্রবোধ কুমার সান্যাল বলেছেন, "আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি আধুনিক কালে এ নাটকের তুলনা নেই।"[৫০]

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসামঞ্জস্যের বিরুদ্ধে যে তীব্র ক্ষোভ নাট্যকারের মনে দানা বেঁধেছিল-তারই ফলে **'আজব দেশ'(১৯৫৩)**-নাটকটি রচিত হয়েছে। 'দীপায়ন' পত্রিকায় নাটকটি প্রথম মুদ্রিত হয় পরে 'স্বদেশ' পত্রিকার 'শারদীয়া' সংখ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৩-তে পুনর্মুদ্রিত হয়। ১৯৮৫ সালের ১৮ই অক্টোবর আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে নাটকটির বেতার রূপও প্রচারিত হয়। ১৯৮৫ সালে এ নাটকের সংক্ষিপ্ত রূপ 'আলো চাই আরো আলো' নাম দিয়ে প্রকাশিত হয় । এ নাটকের কাহিনী এক আজব দেশের ঘটনা। সে দেশের রাজা হবুচন্দ্র, মন্ত্রী গবুচন্দ্র। দেশবাসী পরমানন্দে দিন কাটায়। কিন্তু হঠাৎ এক ব্যক্তিকে নিয়ে বাঁধলো গণ্ডগোল–সে বাড়ি বাড়ি ঘুরে শুধু বলে 'আলো চাই'। নির্বোধ রাজার বুদ্ধিমান মন্ত্রীও বিপদে পড়েন। মন্ত্রীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হল, কিন্তু সে কই ? তাকে খুঁজতে গিয়ে মন্ত্রীর নিপুণ হাতে সাজানো রাজ্যের দুর্নীতির ব্যাপারগুলো ধরা পড়ল। আলো এসে অন্ধকার অপসৃত করল।

গণতন্ত্রের মুখোশ পরা ছদ্মবেশী ধনতন্ত্রের চেহারা, অযোগ্য নেতৃত্বে অপদার্থ শাসন ব্যবস্থা অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক বৈষম্যের বাস্তব ছবি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ আর শাণিত শ্লেষের সাহায্যে নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন। এ নাটকের কিষাণচাঁদ শোষিত মানব সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে বললেন:

> যারা সবার পিছনে থেকে, সবার নীচে দাঁড়িয়ে কুশিক্ষা, দারিদ্র্য আর অর্ধাশনে তিল তিল করে মরণের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের শোষণ করে রাজ্যের মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষীরা ক্রমশ ফেঁপে উঠছে...চাটুকার আর চক্রান্তবাজদের বেড়াজাল ডিঙিয়ে যাদের অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনী মহারাজের কাছে পৌঁছতে পারে না আমি সেই শোষিত প্রজাকুলেরই একজন মহারাজ।[৫১]

নাটকের পরিসমাপ্তিতে দেখা যায় নাট্যকার মহান সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে যথার্থ গণতন্ত্র ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কামনায় হবুরাজার রাজ্য ও সিংহাসন একজন সৎ দেশকর্মীর হাতে তুলে দিয়েছেন। নাটকের স্থান–আজব দেশ, চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উৎসব,

Dhaka University Institutional Repository

সময়–অপরাহ্ণ, চার অঙ্কের দৃশ্যহীন নাটক। নাটকে ২টি গানের ব্যবহার হয়েছে। এ নাটকটি রাজশেখর বসুকে উৎসর্গ করা হয়েছে। এ নাটকটি সম্পর্কে উৎপল দত্ত মন্তব্য করেছেন : "আজব দেশ তথাকথিত নব্য লেখকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় প্রগতিশীল নাটক কাকে বলে।"[৫২] নাটকটির শ্লেষ, অন্তর্নিহিত বেদনা, সংলাপ, নাটকের সাবলীল গতি, বলিষ্ঠ ইঙ্গিত–সব মিলিয়ে বাংলা নাট্য সাহিত্যের এ এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এ নাটকটি ক্যাসুয়াল আর্টিস্ট ক্যালকাটা কর্তৃক অভিনীত হয়।

দরিদ্র চাষি অর্জুনের জীবনের করুণ কাহিনী নিয়ে **'চাষীর প্রেম'(১৯৫৩)**–নাটকের আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে। অর্থের প্রয়োজন অর্জুনকে এক বাঈজীর বাজনাদারে পরিণত হতে বাধ্য করে। ক্রমে সে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং নিজেই স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে ত্যাগ করে কলকাতায় চলে যায়। অর্জুনের পরিত্যক্তা স্ত্রী দুর্গা শিশুপুত্র লক্ষ্মণকে নিয়ে অত্যন্ত কষ্টে জীবন যাপন করতে থাকে। পরে অর্জুন বুঝতে পারে যে সে ভুল করেছে–প্রবঞ্চিত হয়েছে, তার আর ফেরবার পথ নেই। তাই সে প্রতিহিংসায় বাঈজীকে হত্যা করে।

পল্লীবাংলার সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, অভাব অভিযোগে ভরা কৃষক জীবনের ছবি নিপুণ বাস্তব তায় নাট্যকার এ নাটকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৃষক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, জমিদারের অত্যাচার, মহাজনের শোষণের ছবিও এঁকেছেন। নাট্যকারের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রামের কৃষকদের সম্পর্কে কিন্তু নতুন কৌতূহল সঞ্চার করতে পারেনি। নাটকে অর্জুন ও

Dhaka University Institutional Repository

রতনবাঈ (বাঈজী)––উভয়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব দেখা যায়। কারণ মান-অভিমান, প্রণয়-ঈর্ষার যে জটিল সম্পর্ক তা দুটি চরিত্রকে ঘিরে যথার্থ শৈল্পিকরূপ পায়নি। ফলে রতনবাঈ-এর সামান্য অপমানসূচক কথাতেই অর্জুন তাকে গলা টিপে মেরে ফেলে–ঘটনাটি অতিনাটকীয় মনে হয়। তবে সমাজ ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন আসছে, সমাজের কাঠামো যে বদলাতে চলেছে এ নাটকে নাট্যকার তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার ফলে যে গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, চাষিকে বিকল্প কর্মসংস্থানের কথা ভাবতে হচ্ছে, চাষির ছেলে চাষ না করে লেখাপড়া শিখছে, কৃষকের ভাঙা অন্ধকার ঘরে ঢুকছে শিক্ষার আলো–শিক্ষা চাষিকে নতুন মর্যাদাবোধ এনে দিচ্ছে–এসব কথা এ নাটকে বলা হলেও তা নাট্যকাহিনীর সঙ্গে সমন্বিত হতে পারেনি। শুধু কথার কথা হয়েই থেকে গেছে। এর অতিরিক্ত কোন আধুনিক জীবনবোধ এ নাটকে প্রকাশ পায়নি।

শ্রমিক জীবনের পটভূমিতে **‘ধর্মঘট’(১৯৫৩)**–নাটকটি লেখা হয়েছে। শ্রমিক মালিকের সংঘাত এই নাটকের বিষয়। শ্রমিকদের শ্রমে দীনবন্ধু চৌধুরীর ছাতার কারখানা লাভের অঙ্কে ফুলে ফেঁপে বিরাট হয়েছে। কিন্তু দীনবন্ধু চৌধুরী হীন ষড়যন্ত্র করে, ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির সংঘবদ্ধ আন্দোলন (ধর্মঘট) বানচাল করার জন্য সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে শ্রমিকদের মধ্যে বিবাদ-কলহ বাঁধিয়ে দেয়। শ্রমিক নেতা ইব্রাহিমের পুত্র লালমিঞাকে আরেক শ্রমিক নেতা জনার্দনের কন্যা মায়াকে অপহরণের মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়। যদিও পরবর্তীতে এ হীন ষড়যন্ত্র ফলপ্রসূ হয়নি। মূলত বেপরোয়া শ্রমিকরা কিভাবে সেই হীন ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল সেই কাহিনীই এই

নাটকের উপজীব্য। কিন্তু শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার জন্য শোষিত নিপীড়িত মানুষ যে কিভাবে মোকাবিলা করে এ সম্বন্ধে নাট্যকার সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেন নি। শ্রমিক নেতা ইব্রাহিম ও জনার্দনের চরিত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার মত ধৈর্য, সংযম, বুদ্ধি, কর্তব্যবোধ, দাঙ্গার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বলিষ্ঠ মানসিকতা নাট্যকার সফলভাবে চিত্রিত করতে পারেননি। কিন্তু একটি অতি আধুনিক সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাতের জন্য অবশ্য নাট্যকারের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

মালিক দীনবন্ধু, দালাল হারাণ তাদের শ্রেণি-বৈশিষ্ট্য নিয়ে এ নাটকে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। জনার্দন যখন বলে তার কন্যা মায়া তার আবাল্য সঙ্গী লালমিঞাকে বিয়ে করতে পারে কারণ সে এখন সাবালিকা–এই উদার ঘোষণা বাংলা নাটকে নতুন দিক উন্মোচন করে। জনার্দন বিশ্বাস করে শ্রমিকের কোন জাত নেই। মন্মথ রায় নাট্যকার হিসাবে সবসময়ই সমকালীন থাকার চেষ্টা করেছেন। মন্মথ রায় গভীরভাবে বিচিত্র কর্মসূত্রে জীবনকে দেখেছেন; দেখেছেন বিচিত্র মানুষ–একক ও দলবদ্ধ। সেই মানুষগুলি তাঁকে আকৃষ্ট করেছে, মুগ্ধ করেছে এবং ক্ষুব্ধও করেছে। তাঁর বিশ্বাসকে, উপলব্ধিকে তিনি নাটকে প্রতিফলিত করেছেন। ঐক্যবদ্ধ না হলে জোরদার প্রতিরোধ গড়ে ওঠে না, এটা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। এ নাটকে তিনি সে প্রমাণও রেখেছেন। নাটকের শেষাংশে কুচক্রী হারাণ স্বীকার করে দীনবন্ধু চৌধুরীর প্ররোচনায় মায়াকে সে অপহরণ করে। নাটকের শেষাংশে তার সংলাপ থেকে তাই জানা যায়। শ্রমিক নেতা ইব্রাহিমকে উদ্দেশ্য করে সে বলে,

একগোছা কঞ্চি-অতো বড়ো জোয়ান তুমি–একসঙ্গে ভাঙতে পারো? পারো না, গোছাটা দুভাগ করে ফ্যালো। আমার মতো কমজোরী মানুষ ও তা টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

ওঁরা বুঝেছিলেন তোমাদের স্ট্রাইক বন্ধ করতে আর কোন পথ ছিল না। ছিল এই একটি মাত্র পথ। মায়াকে সরিয়ে ফেলে দুই দলে একটা দাঙ্গা বাঁধানো। তাই আমাদের কয়েকজনকে টাকা খাইয়ে হাত করে–মায়ের কলিক হয়েছে বলে মায়াকে থিয়েটার থেকে বাড়ী পাঠিয়ে দেয় দীনবন্ধু চৌধুরী নিজের মোটরে, যে মোটরে রুমালে ক্লোরোফর্ম মাখিয়ে লুকিয়ে বসেছিলাম আমি।[৫৩]

জনার্দন নিজের ভুল বুঝতে পেরে ইব্রাহিমের কাছে পূর্বের দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে বললেন,

ইব্রাহিম! ভাই আমার! আমাকে ক্ষমা কর। চল–আমরা গিয়ে বলি দুনিয়ায় শুধু দুটো জাত–হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খৃষ্টান নয়, বৌদ্ধ নয়–দুনিয়ায় শুধু দুটো জাত–ধনিক অপর শ্রমিক। আমরা সেই শ্রমিক। এ দুই জাতই পাশাপাশি সুখে শান্তিতে বেশ বেঁচে থাকতে পারে, যদি অন্যায় না হয়,–যদি জুলুম না হয়। বাড়তি কাজের জন্যে মজুরী চাই। না পেলে কাজে আমরা যাবো না।[৫৪]

নাটকের প্রধান চরিত্রগুলো হলো দীনবন্ধু চৌধুরী, ইব্রাহিম, জনার্দন, লোহারাম বাস, লালমিঞা, মায়া, পার্বতী, হারাণ, ইন্সপেক্টর, আকবর, নটবর, সুমঙ্গল অন্যতম। চার দৃশ্যে সমাপ্ত নাটক। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে নাটকটি উৎসর্গ করা হয় ।

৯.১২.৫৩ সালে 'বহুরূপী' নাট্য সম্প্রদায় 'রঙমহলে' 'ধর্মঘট' নাটকটি অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু তার আগে কলকাতা ট্রাম শ্রমিক প্রগতি সংঘের প্রযোজনায় অমর গঙ্গোপাধ্যায়-এর নির্দেশনায় এ নাটকটি অভিনীত হয়েছিল।[৫৫]

Dhaka University Institutional Repository

'*আনন্দবাজার*' পত্রিকা এই নাটকটি সম্পর্কে লিখেছিল : "ধর্মঘট শ্রমিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বিধায়ক একটি অপূর্ব নাট্য সৃষ্টি। চরিত্র, ঘটনা স্থাপন এবং সংলাপই শুধু নয়- 'Mob Play' বলতে যা আমরা বুঝি এ নাটক তারই এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।"[৫৬]

'শ্রীশ্রীমা'(১৯৫৫) নাটকে শ্রীশ্রীমা সারদামণি (২২.১২.১৮৫৩-২১.৭.১৯২০) শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পত্নী ছিলেন। তার বাড়ি জয়রামবাটি–বাঁকুড়া। পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বাল্যকাল থেকেই ধর্মভাবাপন্না ছিলেন। বৈশাখ ১২৬৬-ব.তাঁর বিবাহ হয়।[৫৭] শ্রীরামকৃ''দেবের দেহত্যাগের পর গভীর সাধনায় মনোনিবেশ করেন। সবাইকেই তিনি পুত্র কন্যাদের মতো দেখতেন। তাঁর কিছু মন্ত্রশিষ্য ছিল।

এ নাটকটি শ্রীশ্রী সারদা রামকৃষ্ণ লীলা নাটক। 'লীলা' নাটক কথাটির মধ্যেই এ নাটকের ভক্তিরসাত্মক পরিপ্রেক্ষিতটি অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে। সাতটি দৃশ্য সমন্বিত নাটক। এ নাটকে সারদামণির জীবনকথা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বিশটি চরিত্র কাহিনীকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। প্রথম দৃশ্য জয়রামবাটি, কাল ১২৭৮ চৈত্র। দ্বিতীয় দৃশ্য দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গারতীরে রামকৃষ্ণের কক্ষ, তৃতীয় দৃশ্য দক্ষিণেশ্বরের নহবতখানা, চতুর্থ দৃশ্য রামকৃষ্ণের কক্ষ, পঞ্চম দৃশ্য শ্যামপুকুরের বাড়ি, ষষ্ঠ দৃশ্য কাশীপুর উদ্যান বাটিকা এবং সপ্তম দৃশ্যে কাশীপুরে রামকৃষ্ণের কক্ষে অসুস্থ রামকৃষ্ণের-দেহান্তর। 'শুধু এ ঘর থেকে ও ঘর'-সারদামণির এই উপলব্ধিতে নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে। নাটকে প্রতিটি চরিত্র যথাযথভাবে চিত্রিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কোম্পানী শাসন-শোষণের অনুষঙ্গী হিসেবে যখন এদেশে দেখা দিল একজন রক্তচোষা জমিদার, নীলকুঠির সাহেব, দালাল, মহাজন, সরকারি আমলা, দারোগা এবং এদের সকলকে নিয়ে কোম্পানী-আমলে যে অভিনব নির্যাতন ব্যবস্থা সৃষ্টি হল তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসেবেই সাঁওতাল বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক সত্যই **'সাঁওতাল বিদ্রোহ' (১৯৫৮)** নাটক রচনার অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে।

নাট্যকার সাঁওতাল বিদ্রোহের পেছনে যে রাজনৈতিক কারণ তাকে এড়িয়ে গিয়ে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাটিকে বিচার করেছেন। যুগযুগান্ত ধরে ধনিক, বণিক, মালিক, মহাজনশ্রেণি সাঁওতাল শ্রমিক, মজুরদের শোষণ করে, ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে। ক্ষুধা, অভাব, নৈরাশ্য নিপীড়নের অন্ধকারে তাদের জীবন ছিল ঢাকা। পাঁচটি দৃশ্যের এই নাটকে নাট্যকার অনুসন্ধানী মন নিয়ে সেই শোষিত শ্রেণির ঘর্মাক্ত জীবনের ছবি এঁকেছেন। এ নাটকে সাঁওতালদের বিদ্রোহ দেখানোর পাশাপাশি মহাজন নিমাই চৌধুরীর ছেলে মানিক ঠিকাদারের সাঁওতালদের প্রতি মমত্ববোধ ও আকর্ষণ, মূলত নিমাই চৌধুরী মৃত্যুর সময় আসল সত্যটা প্রকাশ করেন ; মানিক সাঁওতাল মায়ের গর্ভজাত সন্তান। তাই সমগোত্রীয়দের প্রতি তার সহানুভূতি ও আকর্ষণ সহজাত। মানিক অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে সোচ্চার আন্দোলন গড়ে তোলে।

নাট্যকার মন্মথ রায় সাঁওতালদের বঞ্চনার ইতিহাসকে, তাদের ওপর অত্যাচারের স্বরূপকে ক্ষোভের আগুনে তাতিয়ে নিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে মহাবিপ্লবের ডাক দিয়েছেন। কিন্তু গান্ধীবাদ

বনাম মার্কসবাদের দ্বন্দ্বে নাট্যকার তখনও নিশ্চিত কোন চরম পথের সন্ধান পাননি। অথচ নাটকের প্রতিটি ঘটনা, বিদ্রোহের সংগ্রামপূর্ণ ছবি, মুক্তিলাভের জন্য সাহসী সাঁওতালদের উদ্ভূত আত্মত্যাগ সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। শোষিত সর্বহারা শ্রেণির প্রতি তাঁর একান্ত সহানুভূতি না থাকলে, 'জন্মে নয়-কর্মেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের বিচার'–এ বোধ তাঁকে নাড়া না দিলে তিনি এ নাটক লিখতে পারতেন না। কোনও মানুষই হীন নয়, অবহেলিত সাঁওতালদেরও রয়েছে মনুষ্যত্বের উপলব্ধি আর এই উপলব্ধিই এই নাটকে এক নতুন শক্তি সঞ্চার করেছে।

চরিত্র চিত্রণও সবক্ষেত্রে স্পষ্ট নয়। ভৈরব সম্পর্কে মানিকের বউ রাধার মনোভাবও স্পষ্ট নয়। মানিকের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবার জন্য ভৈরবের প্রতি তার সত্যিকারের ভালবাসা না ভালবাসার অভিনয় তা ঠিক বোঝা যায় না। নাট্যকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারেননি। ইতিহাসের সিধো কান্হ সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে এক জ্বলন্ত বিদ্রোহস্বরূপ। মানিক অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। নাটকে সিধু, কানু ভৈরব সাঁওতালদের পক্ষে লড়াই করতে গিয়ে ইংরেজদের গুলিতে আত্মাহুতি দেয়। কিন্তু বিপ্লব ও সংগঠনের কোন ধারণাই তাদের চরিত্রে নাট্যকার ফুটিয়ে তোলেননি। অথচ তাদেরই হাতে একটি গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব তুলে দিয়েছেন। বাস্তব তাবর্জিত এই পরিকল্পনা আবেগমিশ্রিত দেশপ্রেমের ফল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে গণ-অভ্যুত্থানের ব্যাপারটি নাটকে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে।

নাটকে প্রধান চরিত্রগুলো হল নিমাই চৌধুরী, তার ছেলে মানিক ঠিকাদার, মানিকের বউ রাধা, সাঁওতালের মেয়ে টিয়া, ভৈরব, সিধু, কানু চরিত্রগুলো অন্যতম। অঙ্কহীন পাঁচ দৃশ্যের নাটক। নট

সম্রাট ছবি বিশ্বাসকে সাঁওতাল বিদ্রোহ নাটকটি উৎসর্গ করা হয়েছে। বঙ্কিম ঘোষের পরিচালনায় রঙমহলে 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' নাটকটি অভিনীত হয়।

অষ্টম শতাব্দীতে গৌড়বঙ্গের পটভূমিতে **'অমৃত অতীত' (১৯৬০)** নাট্যকাহিনীর বিস্তার।

১৯৫৯-এ গন্ধর্ব নাট্যগোষ্ঠীর অনুরোধে মন্মথ রায় নাটকটি রচনা করেন। এটি ১৯৫৯ সালে 'বহুরূপী' পত্রিকার নবম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। নাটকটি অতিরিক্ত দৃশ্য সমন্বিত হয়ে ১৯৬৪ সালে আবার প্রকাশিত হয়। নাটকের ভূমিকা অংশে নাট্যকার বলেছেন,

> শতবর্ষব্যাপী অরাজকতায় অতিষ্ঠ হইয়া গৌড়বঙ্গের প্রজাপুঞ্জ অষ্টম শতাব্দীতে গোপালদেবকে পরিত্রাতা মনে করিয়া তাঁহাকে গৌড়বঙ্গের রাজা নির্বাচন করে–এই ঐতিহাসিক ভিত্তিতে নাটকটি পরিকল্পিত হইয়াছে। অবশ্য একমাত্র গোপালদেব ভিন্ন অন্য চরিত্রগুলি আমার কল্পনা প্রসূত।[৫৮]

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎবঙ্গ', রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাংলার ইতিহাস' এবং নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর গৌড়বঙ্গের সামাজিক ও রাজনৈতিক বহু তথ্য নিয়েছেন। নাটকটির নামকরণের ব্যাপারে তিনি তরুণ নাট্যকার গিরিশঙ্করের ঋণও স্বীকার করেছেন।

নাটকের পটভূমি গৌড় নগরী, কাল-৭৪০ খ্রী., স্থান-একটি জীর্ণ অট্টালিকার মধ্যে একটি গুপ্ত প্রকোষ্ঠ। রাজ্যে মাৎস্যন্যায়ে ক্লিষ্ট অরাজক দুর্নীতিগ্রস্ত রাজা গোপালদেব জনগণের সাহায্যে কিভাবে

প্রজা শোষণের সমাপ্তি ঘটিয়ে একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রের সূচনা করলেন–সেই কাহিনী নিয়েই 'অমৃত অতীত' নাটকটি গড়ে উঠেছে। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এ নাটকটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "যে উপন্যাস বা নাটক কোন সুপরিচিত ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে রচিত এবং যার মধ্যে এমন কোন কাল্পনিক দৃশ্য নেই যা ঐতিহাসিক সত্যের বিরোধী, সেটিই ঐতিহাসিক নাটক বা উপন্যাস বলে গৃহীত হবার যোগ্য।" অথচ এ নাটকে অষ্টম শতাব্দীর ঐতিহাসিক পটভূমির মধ্যেই এসেছে ধর্মঘট, সহ-অবস্থান নীতি, খাদ্য ও ঔষধে ভেজাল প্রভৃতি আধুনিক প্রসঙ্গ যা নাটকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি। তাছাড়া এ নাটকে ব্যবহৃত বিদ্রূপাত্মক লঘু সংলাপ নাটকের ঐতিহাসিক আবহ সৃষ্টিতেও ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। অজিতকুমার ঘোষ তাই এ নাটকে 'কালানৌচিত্যদোষ' ঘটতে দেখেছেন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এ নাটকে রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটকের আঙ্গিকের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু এ নাটক ঐতিহাসিক ও রূপক নাটকের সীমারেখা ঘুচিয়ে কোন বৃহত্তর রূপ পরিগ্রহ করেনি। নাটকের নামকরণ প্রসঙ্গে ড. অজিতকুমার ঘোষ বলেন, "নাটকের প্রকৃত নাম বোধহয় 'অ-মৃত অতীত'–যে অতীত মরে নাই, যাহার মাৎস্যন্যায় বর্তমান সমাজের মধ্যেও সর্বব্যাপী আকারে দেখা দিয়াছে।"[৫৯] মধ্যযুগে প্রথম গণ-বিদ্রোহের নেতা গোপালদেবের উত্থান কাহিনী ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তার উদ্যোগের কাহিনীই 'অমৃত অতীত'।

বর্তমান সমাজের পটভূমিতে ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতকে নাট্যকার যদি রূপকের আঙ্গিকে দেখেন, তাতে নাট্যকারের পরীক্ষা প্রবণতাই ফুটে ওঠে। এ নাটকে ইতিহাসের উপাদান সামান্য। প্লটের বাঁধুনি দৃঢ়। রাণীকে কেন্দ্র করে কৃতান্তক ও গোপালদেবের মধ্যে দ্বন্দ্ব অত্যন্ত বাস্তব । তা

ঐতিহাসিক পরিণামকে সঠিক অবস্থানে পৌঁছে দেয়। এ নাটকে একমাত্র গোপালদেব ভিন্ন অন্য চরিত্রগুলো নাট্যকারের কল্পনাপ্রসূত। নাটকের প্রধান চরিত্র রাণী। তিনি গোপালদেবের কাছে ইন্দিরা আর কৃতান্তকের কাছে মক্ষিরাণী। এ চরিত্র নাট্যকারের কল্পনা প্রসূত। রাণী চরিত্রটির জটিল আচরণ শেষ পর্যন্ত নাটকের ঔৎসুক্য রক্ষা করেছে। নাটকের প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম সর্গের স্থান জীর্ণ অট্টালিকার গুপ্ত গুহা প্রকোষ্ঠে। দ্বিতীয় সর্গ ভাস্কর শ্রীমানের শিল্পকক্ষে। চতুর্থ সর্গ জীর্ণ পরিত্যক্ত অট্টালিকার সভাকক্ষে। মানুষের ইতিহাস বোধজনিত চিরন্তন যে কৌতূহল, তথ্যজ্ঞানের সঙ্গে উচ্চকল্পনা শক্তির সংমিশ্রণ, কাহিনীর দৃঢ় সংঘবদ্ধতায় এবং শক্তিশালী সংলাপের সাহায্যে নাট্যকার 'অমৃত অতীতে'র কাহিনীকে সুবিন্যস্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। নাটকের শেষাংশে কৃতান্তক নবনির্বাচিত রাজা গোপালদেবকে আহবান জানায়,

> ভুলো না ভুলো না, আমাদের কথাও ভুলোনা রাজা। সাধারণ মানুষের দুঃখ দৈন্য নিয়ে রাষ্ট্র এতটুকু মাথা ঘামায়নি এতদিন, জনসাধারণকে শোষণ আর শাসন করে চলেছে এতকাল রাজ্যশক্তির বিপুল বিলাসরথ চক্র। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সৎ জীবন যাপন করলে অন্নবস্ত্র জোটে না দেখেই আমরা হয়েছি অসৎ আমরা হয়েছি তস্কর, আমরা হয়েছি দস্যু। অন্নবস্ত্রের দুঃখ ঘুচিয়ে দাও দেখবে দস্যুর হয়েছে ধ্বংস, তস্করের হয়েছে মৃত্যু। কিন্তু তা যদি না পার, জানবে আমাদের মৃত্যু নেই–রাজা, আমাদের মৃত্যু নেই।[৬০]

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর পরাধীন দেশে সংকটাপন্ন অবস্থায় ভঙ্গুর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে সুদৃঢ় করার জন্য এরকম একজন গোপালদেব দরকার ছিল। 'অমৃত অতীত' নাটকটি

১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। নাট্যকার দেশ পুনর্গঠনে এরকম একজন গোপালদেবকে প্রত্যাশা করেছেন। নাট্যকার আশাবাদী ছিলেন সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে এরকম একজন গোপালদেব উঠে আসবে। মূলত দেশের জটিল পরিস্থিতির মধ্যে সাধারণের মধ্য থেকে এরকম একজন গোপালদেব উঠে আসে। মাৎস্যন্যায়ের যুগে অরাজকতার মধ্যে জনগণ গোপালদেবের মত একজনকে বাছাই করে নেয়।

নাটকে সর্বমোট ২১টি চরিত্র, পুরুষ-১৯টি, নারী চরিত্র-২টি। এই নাটকটি ৫টি সর্গে সমাপ্ত।

এ নাটকটি কথাসাহিত্যিক শ্রী শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা হয়েছে। ১৯৬০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি 'রঙমহল' গন্ধর্ব' নাট্যসংস্থা এ নাটকের অভিনয় করে। পরবর্তী কালে নাটকটির সংক্ষিপ্ত রূপের পরিবর্তন ঘটিয়ে নাট্যকার যখন এ নাটকের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সর্গে অতিরিক্ত দুটি দৃশ্য সংযোজন করেন তখন সেটি ১৯৬৪ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি ক্রান্তি শিল্পীসংঘের শিল্পীদের দ্বারা 'মিনার্ভা'য় অভিনীত হয়।

১৯৫৯ সালে মন্মথ রায় **'বন্দিতা'(১৯৫৯)** নাটকটি লেখেন এবং বিশ্বরূপা নাট্যপরিকল্পনা মুখপত্র মার্কারিতে ৫.৫.৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। কুমারী মাতৃত্বের চিরন্তন সমস্যাকে নাট্যকার 'বন্দিতা'য় তুলে ধরেছেন। নাটকের ঘটনাকাল ১৯৪১ সাল। কাশীধামের বাঙালীটোলায় গান্ধীপন্থী মধ্যবয়সী এক অধ্যাপক থাকেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্দেশিত সমবায় আন্দোলনের প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেছেন। অধ্যাপকের নাম সত্যশরণ রায়। লোকশিক্ষা দানে তাঁর আগ্রহ প্রবল। তাঁর স্ত্রী

কৃপাময়ী কলহপরায়ণ। 'বন্দিতা' তাঁদের একমাত্র কন্যা–অষ্টাদশী, সুন্দরী। বাবার কলেজেরই ছাত্রী। সেই কলেজেরই কোন এক ছাত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে বন্দিতা কুমারী অবস্থাতেই সন্তানসম্ভবা হয়। কিন্তু বেকারত্বের জন্য সেই ছেলেটি অর্থাৎ রমেশ এই দায়িত্ব স্বীকারে অপারগ হয়ে দূরে চলে যায়। 'বন্দিতা' নারীত্ব ও মাতৃত্বের দ্বন্দ্বে যখন সমস্যার অথৈ সাগরে তখন সুরেশ তার পাশে একরাশ ভালবাসা নিয়ে এসে দাঁড়ায়। সে সমস্ত জেনেও বন্দিতাকে ভালবাসে। বন্দিতা কুমারী অবস্থাতেই সেই মাতৃত্বকে স্বীকার করে নেবার মত মানসিক দৃঢ়তা লাভ করে। অধ্যাপক পরিবার দার্জিলিং চলে আসার পর 'বন্দিতা'র কন্যা সন্তান জন্মায়। প্রায় আঠারো বছর পর অধ্যাপক, বন্দিতা, বন্দিতার কন্যা নন্দিতাকে নিয়ে বারাসাত চলে এলেন। সেখানে জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে মহাজন কুবের সরকারের ছেলে পার্থর সাথে সতেরো বছরের নন্দিতার বিয়ে হয়। নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে অধ্যাপকের মৃত্যু হয়; হঠাৎই নন্দিতার পিতা রমেশের আবির্ভাব ঘটে। কাহিনী একটা তৈরি করা সমাধানে পৌঁছায়। রবীন্দ্রনাথের সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে মতাদর্শ ও বন্দিতার জীবনের জটিল সমস্যাকে নাট্যকার একসঙ্গে মিলিয়েছেন–যেটা খুব বাস্তব হয়ে ওঠেনি।

পাঁচটি দৃশ্যে নাটকটি বিধৃত। প্রথম দৃশ্য কাশীতে সত্যশরণ রায়ের উপবেশন কক্ষ; দ্বিতীয় দৃশ্য দার্জিলিং; তৃতীয় দৃশ্য বারাসাত; চতুর্থ দৃশ্য কুবের সরকারের বাড়ী; পঞ্চম দৃশ্য বারাসাত। প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যটি প্রথম বছরের ঘটনা এবং অন্য দৃশ্যগুলি সতেরো বছর পরের ঘটনাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। সর্বমোট ১২টি চরিত্র, পুরুষ-৯টি, নারী চরিত্র-৩টি। নাটকের সংলাপ ব্যবহারে পূর্বের মতোই

দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে সত্যশরণের মনোভাব তার উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে,

> স্বরাজ আন্দোলনই আজ সবচেয়ে বড় সমাজসেবা। আর প্রকৃত অর্থে কোন আন্দোলনই সার্থক হবে না, হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা একতাবদ্ধ হচ্ছি, আর সে একতাবদ্ধ হওয়ার একমাত্র উপায় সমাজে সমবায়মূলক জীবনযাত্রা গড়ে তোলা। জীবিকার তাগিদ জীবনে সবচেয়ে বড় তাগিদ। সমবায়ের ভিত্তিতে আমরা যদি জীবিকা নির্বাহের আয়োজন করি, প্রতিটি মুহূর্তে আমরা অনুভব করবো, 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' যে ঐক্য তখন আমাদের আসবে তার শক্তি হবে প্রচণ্ড, সে শক্তি দুর্নিবার গতিতে লড়াই করবে বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে, হ্যাঁ,–বিচ্ছিন্নভাবে নয়, বিভক্ত হয়ে নয়, সুসংহত, ঐক্যবদ্ধ, সামাজিক শক্তিতে।[৬১]

গান্ধী ও রবীন্দ্রপ্রভাবে সৃষ্ট সত্যশরণ চরিত্রটি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। নাটকের পঞ্চম দৃশ্যে বন্দিতার গোটা জীবনের ভুলটাকে সংশোধন করে দেবার জন্য নাট্যকার একটি মিলন দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। অবশ্য নন্দিতা এবং বন্দিতা–উভয়ের জীবনের সংকটকে সামাজিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করার ফলে শেষ পর্যন্ত নাটকীয় ঘটনার ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ হয়েছে।

'বন্যা'(১৯৬৩) নাটকে দেখানো হয়েছে দামোদরের বন্যা এসে যখন গ্রামের ঘরবাড়ি, গবাদিপশু সমস্ত ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল ; তখন দিগন্তবিস্তারী জলের মাঝখানে দ্বীপের মত জেগে

থাকা একটি স্কুল বাড়িতে আশ্রিত বন্যার কবলে পড়া অনেক অসহায় মানুষের বিচিত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে কলহ, স্নেহ-দ্বন্দ্ব-ভালবাসার টুকরো টুকরো ছবি এ নাটকের বিষয় হিসাবে এসেছে। সমাজের নানা অংশ থেকে আসা এই মানুষগুলি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু এই বিপর্যয় তাদের ভেতরকার প্রবৃত্তিগুলিকে পাল্টাতে পারেনি। নাট্যকার নিপুণভাবে সেই গল্প আমাদের বলেছেন এবং নাটকীয়ভাবে বাস্তব তাকে তুলে ধরেছেন। মানুষের জীবনের পাপ, পুণ্য, আলো ও অন্ধকার যে অদ্ভুত সহাবস্থান করে সেই ছবি এঁকেছেন। নাটকের পটভূমিটি চমৎকার। সুন্দর ও অসুন্দরকে পাশাপাশি রেখে সুন্দরতর দিকে যাবার ঝোঁকটি নাট্যকারের রয়েছে। তাই দেখি, এ নাটকে দারোগা ও ডাকাতের মত নীচ ও ভয়ঙ্কর চরিত্র যেমন আছে, তেমনি পরহিতব্রতী হেডমাস্টার মশাই ও করুণাময়ী মা-লক্ষ্মীর মত চরিত্রও আছে। এছাড়া জজ সাহেব, মহাজন, গায়েন বৌ-এর মত জটিল রহস্যাবৃত চরিত্রগুলো কাহিনীর নাটকীয়তা বাড়িয়েছে। ছোট ছোট ঘটনার আবর্তে গাঁথা এ নাটকের মূলধারার অনিবার্য পরিণতি গড়ে ওঠেনি। নাটকের সংলাপের মাধ্যমে প্রকৃতির ভয়াল বিপর্যয়ের ছবিটি সঠিকভাবে প্রতিফলিত হতে না পারলেও নাট্যকারের মানসিকতায় সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে একটা নতুন সমাজ গড়ে তোলার প্রচেষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। নাট্যকারের স্বপ্নের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে স্কুলবাড়ির এই দ্বীপটিকে কেন্দ্র করে।

নাটকের সংলাপের মাধ্যমে প্রকৃতির ভয়াল বিপর্যয়ের ছবিটি সঠিকভাবে প্রতিফলিত না হলেও বন্যার সময়ে দুর্ভিক্ষ মানুষকে কতটা অসহায় ও বুভুক্ষু করে তোলে তা জজসাহেব প্রদত্ত সংলাপ থেকে উপলব্ধি করা যায়,

সারাজীবন বিচার করেছি। লোকে ক্ষুধার জ্বালায় চুরি করেছে। ক্ষুধার জ্বালা যে কি, তা না জেনেও, কত উচ্চ আসনে বসে আমি তার বিচার করেছি। আজও বিচার আমি করব। তুমি যাও দেখি–ঐ গায়েনকে আরও জোরে গানটা গাইতে বল। বড় ভাল লাগছে আমার। যেন আমার মনের কথাগুলো শুনছি। ওর চোখের কপাট খুলে গেছে। আমার খুলে যাচ্ছে মনের কপাট। ঐ আবার ঝড় উঠল। ঝড় না আমার মনের ঝড়। [স্বপ্নে কথোপকথনবৎ] কে তুমি ? হলধর চাকি ? এখানে কেন ? তোমার তো ফাঁসি হয়েছে। হ্যাঁ, হয়েছে। অনাহারে ছিলাম গোটা পরিবার তিন দিন। চুরি করে খাবার এনেছিলাম কিছু। ক্ষুধার জ্বালায় ছোট ছেলেটা সব খাবার চুরি করে একা খেয়ে ফেলেছিল বলে এক চড়ে তাকে মেরে ফেলেছিলাম আমি।[৬২]

ছোট ছোট ঘটনার আবর্তে গাঁথা এ নাটকের মূলধারার অনিবার্য পরিণতি গড়ে ওঠেনি। নাটকের সংলাপের মাধ্যমে প্রকৃতির ভয়াল বিপর্যয়ের ছবিটি সঠিকভাবে প্রতিফলিত হতে না পারলেও নাট্যকারের মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠে যখন দ্বিতীয় যুবক বলে, "মরতে বসে আমরা সবাই সমান" অথবা "আগেকার সমাজ এখানে নেই। আগেকার সমাজ এইখানে এই বানে ডুবে গেছে। সেই প্রলয় থেকে নতুন করে বেঁচে উঠেছি আমরা। গড়ে তুলেছি সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে একটা নতুন সমাজ, স্কুলবাড়ীর এই দ্বীপটিতে।"[৬৩] নাটকে সর্বমোট ১৮টি চরিত্র, পুরুষ-১৫টি, নারী চরিত্র-৩টি। নাটকটি রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হয়। ১৯৬৩ সালে অভিনেতৃ সংঘ রবীন্দ্র সদনে এটি প্রথম অভিনয় করে।

Dhaka University Institutional Repository

ইউক্রেনের বিপ্লবী জনকবি তারাস শেভচেঙ্কোর জীবন কাহিনী **'তারাস শেভচেঙ্কো'(১৯৬৫)** নাটকের মূল বিষয়। এটি জীবনী নাটক। তিনি সামান্য এক ভূমিদাসের ঘরে জন্মগ্রহণ করে নিজের সাধনা এবং প্রতিভায় দেশবরেণ্য চিত্রকর ও কবিরূপে জার আমলে রাশিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। অকথ্য অত্যাচার সাইবেরিয়ায় নির্বাসন কোনও কিছুই তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি। তিনি গোটা রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেন। জার-এর শাসনে নিপীড়িত অত্যাচারিত এই জীবনশিল্পীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬৪ সালে সমগ্র বিশ্বে, বিশেষত সোভিয়েত দেশে তাঁর দেড়শততম জন্মবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। সেখানকার উৎসবে ভাষাচার্য ড.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যোগদান করেন। এরপর কলকাতায় ফিরে ভারত সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির এক সভায় তিনি শেভচেঙ্কোর আশ্চর্য জীবনী বর্ণনা করেন। এই আশ্চর্য জীবনকাহিনী শুনে নাট্যকার মন্মথ রায় তাঁকে নিয়ে এই পূর্ণাঙ্গ নাটকটি লিখবেন ঠিক করেন। এই নাটক রচনা করতে গিয়ে তিনি যে দুটি গ্রন্থ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন সেগুলি হল–Mazim Rylsky ও Alexzander Deutsch প্রণীত *TARAS SHEVCHENKO* এবং *TARAS SHEVCHENKO : Selected works* compiled by the Ukrainian shevchenko Jubilee Committe. (Moscow Progressive Publishers.)[৬৪]

Dhaka University Institutional Repository

'রুশভারতী' পত্রিকার ১ম বর্ষ, ১ম ও ২য় (মে-আগস্ট ১৯৬৫) যুক্ত সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হলো। কলকাতা প্যাভলভ ইনস্টিটিউটে ৬.৭.৬৫-এ ভারত সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির সদস্য বন্ধুদের সামনে এটি প্রথম পাঠাভিনয় হয়।[৬৫]

নাট্যকার নিজে এ নাটকটিকে জীবনী নাটক বলেছেন কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য আলাদা করে 'জীবনী-নাটক'–এই বিভাজন-রীতিটি অনুসরণ না করে এই নাটকটিকে সামাজিক নাটকের শ্রেণিতে রাখা হয়। যদিও এ নাটকে নাট্যকার তারাস শেভচেঙ্কোর সমসাময়িক কালের প্রেক্ষাপটে তাঁর জীবনকেই মুখ্যত বর্ণনা করতে চেয়েছেন নানা চরিত্র ও ঘটনার সমবায়ে এবং তাতে সফলও হয়েছেন। একই সাথে এই নাটকে জারের আমলের রাশিয়ায় বিপ্লব ও সেখানকার মানুষের কথাও চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। এ নাটকটি আটটি পর্বে বিভক্ত। ১৮৮১ সালে কেনেভ শহরের উপকণ্ঠে তারাস শেভচেঙ্কোর সমাধিস্থলে প্রথম পর্বের সূচনা হয়। সেখানে পাহারারত দুই পুলিশের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ১৮৩৮ সালে জারের আমলের রাশিয়ায় শেভচেঙ্কোর জীবদ্দশার সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার দিনগুলোতে নাট্যকার ফিরে গেছেন। 'ফ্ল্যাশব্যাক' পদ্ধতির আশ্রয়ে নাট্যকার বিপ্লবী কবি ও চিত্রকরের জীবনকাহিনীকে মালার মত গেঁথেছেন। ক্রীতদাসের ঘরে জন্ম নিয়ে ক্রীতদাস হিসেবে বেড়ে উঠেছেন। ক্রীতদাসের জীবনের নির্মম অত্যাচার, নৃশংস, নির্দয় মনিবের শোষণের চিত্র নাট্যকার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তারাস শেভচেঙ্কোর মনিবের পুত্র ছোট এঞ্জেলহার্দৎ যখন জানলেন তার ক্রীতদাসী ইয়েরিনা তারাস শেভচেঙ্কোর আপন ছোট বোন, তখন ছোট এঞ্জেলহার্দৎ বলে উঠলেন,

Dhaka University Institutional Repository

তাই নাকি হে ? তবে তো দেখছি ওর দর বেড়ে গেল। তোমার মত লোকের বোন আমার পা টেপে, হ্যাঁ, এটা একটা বলবার মত কথা হলো! ভেবেছিলাম চুলের মুঠি ধরে চাবুক মারতে মারতে খামারে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। তোমার যখন বোন, তা আর দেখছি হলো না। তা না হোক। তোমার সঙ্গে তো দেখা হলো। সেদিন কে বলেছিলো তোমারও ছবি নাকি কোথায় ছাপা হয়েছে। তোমাকে কিন্তু আজ সন্ধ্যায় আসতে হবে। সবাইকে একবার দেখিয়ে বলতে হবে না–আজ তুমি যত বড়ই হও, একদিন শালা তুমি আমাকে কাঁধে নিয়ে হাওয়া খাইয়েছো। আর যাওয়ার সময় এই সব পোশাক নিয়ে যেন যায়। ওসব তো এখন আমার সম্পত্তি কিনা।[৬৬]

ক্রীতদাসদের প্রতি অত্যাচারের তীব্রতা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এই শোষণ, নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য দুর্বার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করা হলো। কিয়েভ প্রদেশের ভিলনো শহরে একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করা হলো। সমিতির নাম 'society of Cyril and methodius' রাখা হলো। এই সমিতির উপস্থিত সদস্যরা নিজেদের দায়িত্ব পালনে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করল। তারা অশিক্ষিত জনসাধারণকে লেখাপড়া শেখানোকে মুখ্য উদ্দেশ্য বলে কাজ চালিয়ে যেতে মনস্থির করল। আর এ কাজে তাদের উদ্দীপনা যোগাবে শেভচেঙ্কোর কবিতা যা গান হিসাবে গাওয়া হয়। শেভচেঙ্কো উপস্থিত সদস্যদের অনুপ্রাণিত করে বললেন,

আমাদের মরণ পণ সংকল্প স্বেচ্ছাচারী স্বৈরতন্ত্রী জার আর তার সামন্তদের নির্যাতন, নিপীড়ন, দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে কৃষক ক্রীতদাসদের। ইউক্রেনের মাটি আমাদের মা। সেই মা কৃষক সন্তানদের সাধনাতেই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা। কিন্তু এই জল, এই ফল, এই শস্য

এতে আজ কৃষকের কোন অধিকার নেই। কৃষক সন্তানদের সাধনার ধন অনন্ত এই সম্পদ লুণ্ঠন করে ভোগ বিলাসে উড়িয়ে দিচ্ছে জার ও তার অনুগ্রহপুষ্ট শয়তান সামন্ত আর জমিদারের দল। যাদের ক্রমাগত শোষণে ধনী হচ্ছে আরো ধনী, গরীব হচ্ছে আরো গরীব।[৬৭]

শেভচেঙ্কো নিসঙ্কোচে জার-এর নির্বুদ্ধিতা, নির্মম অত্যাচার ও চাতুরির প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। প্রজাশক্তির জাগরণে, ভূমিদাসদের সংগঠিত আন্দোলনে স্বয়ং জারও ভীত হয়ে পড়েছেন,

প্রজাশক্তির জাগরণ, প্রজাশক্তির অভ্যুত্থান জার লক্ষ্য করেছেন–শংকিত হয়ে পড়েছেন। আর তাই সসৈন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন যুদ্ধে–তুর্কির সঙ্গে, ইংরেজের সঙ্গে, ফরাসির সঙ্গে। দেশরক্ষার জিগীর তুলে–জাতীয় গৌরবের ধ্বজা তুলে প্রজাশক্তির জাগরণ আন্দোলনকে, ভূমিদাসদের মুক্তির আন্দোলনকে দেশপ্রেমের বন্যায় ডুবিয়ে দেয়াই জার-এর উদ্দেশ্য। দেশের যত অসন্তোষ, যত আন্দোলন–সব উড়িয়ে দিয়েছেন একটি চালে, বিদেশীদের সঙ্গে লড়াই শুরু করে। কিন্তু প্রজাশক্তি যদি নির্বোধ হয় তবেই জার-এর চাতুরির জয় হবে। কিন্তু প্রজাশক্তি যদি বুদ্ধিমান হয় তবেই জার-এর এই চাতুরি সফল হবে না।[৬৮]

আজীবন সংগ্রামী এই মহাপুরুষ স্বজাতির কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। দীর্ঘ দশ বছর নির্বাসনে অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করেছেন। কবিতা লিখে ও ছবি এঁকে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। জঘন্য ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদ করার আন্দোলনে তাঁর কষ্টার্জিত সৃষ্টিকর্ম মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর অশেষ অবদানে অনুপ্রাণিত রাশিয়ার জনগণের মৃত্যুপণ লড়াইয়ের ফলে ১৮৬১ সালে ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদ হয়। সারাবিশ্বের অগণিত পরাধীন, নিপীড়িত জনগণ তারাস শেভচেঙ্কোর আপোসহীন

সংগ্রামী জীবনকাহিনী দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে। মহান তারাস শেভচেঙ্কোর রেখে যাওয়া অগ্নিমন্ত্র স্বরূপ বিভিন্ন বাণী নিপীড়িত জনতাকে দীক্ষা নিতে সাহায্য করেছে। আর সময়ের প্রেক্ষাপটে তাঁর রচিত কবিতা, ও তাঁর আঁকা ছবিগুলো চিরভাস্বর হয়ে আছে। তাঁর রচিত কবিতার পংক্তিতে শোষণের নির্মম রূপ ফুটে উঠেছে। কবিতার চরণে চরণে একজন পরাধীন ভূমিদাসের মানসিক যন্ত্রণার তীব্রতা ব্যক্ত হয়েছে। যা কালের প্রবহমান ধারায় আজও সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।

এ নাটকে ব্যবহৃত শেভচেঙ্কোর কবিতা ও গান ('রুশভারতী' পত্রিকা সংস্করণে ব্যবহৃত) ইংরেজি অনুবাদেই রাখা হয়েছে। নাট্যকাহিনীর শৈল্পিক উৎকর্ষের জন্য নাট্যকার এ নাটকে কয়েকটি কাল্পনিক চরিত্রের আমদানি করেছেন। নাটকে সর্বমোট ২৪টি চরিত্র, পুরুষ চরিত্র ২১টি, নারী চরিত্র ৩টি। এ নাটকে আটটি পর্ব রয়েছে। কথোপকথনের মাধ্যমে নাটকের মূল বক্তব্য উঠে এসেছে। মূলত নাট্যকারের প্লট মেকিংয়ের মুন্সিয়ানায় এরকম একটি সার্থক নাটক দর্শকদের উপহার দেয়া সম্ভব হয়েছে। 'দশরূপক' নাট্য সংস্থা ১৯৬৫ সালে 'মিনার্ভা' থিয়েটারে এ নাটকটি অভিনয় করে। এ নাটকটি সম্পর্কে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'রাশিয়া ভ্রমণ' গ্রন্থে লিখেছেন :

> ইউক্রাইনের বিখ্যাত লেখক শেভচেঙ্কোর জীবন নিয়ে নাট্যকার মন্মথ রায় একটি নাটক বাংলায় রচনা করেছেন। কলকাতায় সেটি অভিনীতও হয়েছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যখন কিয়েভ শহরে সফরে গিয়েছিলেন সেখানে এক জনসভায় দুই দেশের সাংস্কৃতিক বন্ধনের উদাহরণ হিসেবে তিনি মন্মথ রায়ের ঐ নাটকটির কথা উল্লেখ করেছিলেন। নাট্যকার

মন্মথ রায় এবং শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর ঐ সুকীর্তিটির জন্য বাঙালী হিসেবে আমি বেশ খাতির পেতে লাগলুম।[৬৯]

ইউক্রাইন ও বাংলার সেতুবন্ধন হিসেবেও এ নাটকটি ইতিহাস হয়ে রইল। মন্মথ রায় এ নাটকটির জন্য সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করেন।

'লালন ফকির'(১৯৬৯) নাটকের ভূমিকা অংশে নাট্যকার মন্মথ রায় স্বীকার করেছেন যে এ নাটক রচনা করতে গিয়ে তাঁকে লালন ফকির সম্বন্ধীয় অনেক কিংবদন্তির সাহায্য নিতে হয়েছে। কারণ লালনের সঠিক জীবনেতিহাস এখনও অলিখিত। তাই তিনি এ বিষয়ে স্পষ্ট বলেছেন :"আমার এই নাট্যকাহিনী কিছুটা ইতিহাস, কিছুটা কিংবদন্তি। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে নদীতে নিক্ষিপ্ত হবার পর লালনের স্মৃতি লোপের কাহিনীটি আমার কল্পিত।"[৭০] তিনি এও স্বীকার করেছেন যে কোনো কোনো চরিত্রের নামকরণ এবং ঘটনার বিন্যাসে তিনি কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের দুই শ্রেণির মানুষকে কেন্দ্রে রেখে এক অঙ্কে দশটি দৃশ্যে এ নাটক লেখা হয়েছে। আবেগপ্রধান নাটক। জীবনী-নাটকের ছক মেনেই লেখা। জাতপাত ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লালনের মতাদর্শ এ নাটকে পরিস্ফুট হয়েছে।

লালনের জীবন নিয়ে মন্মথ রায় আরো দুটি নাটক লিখেছেন। প্রথমটির নাম 'লালনামৃত', দ্বিতীয়টির নাম 'লালন ফকির'। দুটি নাটকেরই চরিত্র ও ঘটনা প্রায় এক, তবে 'লালন ফকির' নাটকটি খানিকটা সংক্ষিপ্ত ও কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক ভাষায় লেখা। লালনের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে তাঁর

গ্রামবাসী, আত্মীয়-স্বজন ও শিষ্য-ভক্তদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যকেই এ নাটকে উপকরণ হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছে। ১৭৭৪ খ্রী: তৎকালীন নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার ভাঁড়ারা গ্রামে এক হিন্দু কায়স্থ পরিবারে লালনের জন্ম হয়। তিনি ১১৬ বছর বেঁচে ছিলেন। ১৮৯০ খ্রী: তাঁর দেহান্তর ঘটে। তাঁর উপাধি ছিল কর, মতান্তরে দাস।

শৈশবেই তিনি বাবাকে হারান। অতি অল্প বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। অল্প বয়সেই একবার পায়ে হেঁটে তিনি পুরীধামে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন। রাস্তায় তাঁর বসন্ত রোগ হলে দলের লোকেরা তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যায়। নাট্যকার এই অংশে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে কাহিনীটিকে সামান্য বদলেছেন। লালনের বসন্ত হলে আত্মীয়রা তাঁর অজ্ঞান অবস্থাকে 'মৃত' অবস্থা মনে করে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। ভাসতে ভাসতে তিনি একসময় একটি নিঃসন্তান মুসলমান পরিবারে আশ্রয় পান। কিন্তু তখন তাঁর পূর্ব-স্মৃতি ও একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তিনি সেই পরিবারে লালিত হয়ে সিরাজ সাঁই নামে এক মুসলমান ফকিরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অনেকদিন পরে যখন তাঁর পূর্ব-স্মৃতি ফিরে আসে তখন তিনি নিজগৃহে নদীয়ায় ফিরে আসেন। তখন তাঁর মা ও স্ত্রী তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তিনি সংসারের মায়া সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে গুরুর কাছে ফিরে আসেন। গুরু সিরাজ সাঁইয়ের আশ্রমে কুষ্টিয়ার গোরাই নদীর ধারে সেঁউরিয়ায় শেষজীবন পর্যন্ত ছিলেন। নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার ভাঁড়ারা গ্রামে লালন করের গৃহ-প্রাঙ্গণে দশটি দৃশ্য সমন্বিত এই নাটকটির সূচনা হয়েছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে রসুলপুর গ্রামের গঙ্গার তীরবর্তী পথ, তৃতীয় দৃশ্য মুরশিদের গৃহ, ষষ্ঠ দৃশ্যে নবদ্বীপের রাসের মেলা, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম দৃশ্যে সেঁউরিয়ায় গোরাই নদীর তীরে লালনের

আশ্রম প্রাঙ্গণে নাটকের ঘটনাবলীকে নাট্যকার সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন। চরিত্রগুলি যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

তবে এটি কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত হওয়ায় অনেকে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ এনেছেন এবং নাট্যকারও সেই কারণে তা বদলে "বাংলার চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করে নিতে পারেন" এমনও বলেছেন। কিন্তু তাতে কি চরিত্রগুলির স্বাভাবিকতা বজায় থাকবে ? এক্ষেত্রে দর্শককেই সচেতন ও আগ্রহী হতে হবে। প্রয়োজনে তা যশোরের ভাষায় 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' বুঝতে হয়, 'বাহে' ভাষায় বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবীগর্জন' কে উপলব্ধি করতে হয়। অবশ্য ভাষা পরিবর্তনের স্বাধীনতা সত্ত্বেও 'লালন ফকির' কিন্তু বহুবার অভিনীত হয়নি। যাঁরা এর প্রশংসা করেছেন তাঁরা কুষ্টিয়ার ভাষা সমেতই করেছেন। নাটকের চতুর্থ দৃশ্যে লালনের ক্ষোভ মিশ্রিত সংলাপ–সমাজের প্রতি, সমাজের বিবেকহীন মানুষের প্রতি,

> ভাই ভোলাই, ভাই শীতল, চোখের সামনে যদি মরতাম আমাক না পুড়োয়ে তোরা পালাত পারতিস না, তাতে অনেক কিছু আমার অজানা থাকত, আমি মিথ্যা বুলি নাই, চুরি করি নাই, খুন করি নাই, তবু আমি অপরাধী। সমাজের বিচারে আমি জাতিচ্যুত, আমি আমার মার পা ছুঁতি পারব না নে, আমি আমার বোর সাথি ঘর করতি পারবোনা নে। আমি তো আমার ধম্ম ছাড়ি নাই, অন্য ধম্ম গ্রহণও করি নাই–তা হলি আমাকই বা কি অপরাধ ? আমাক মা বৌ এরই বা কি অপরাধ ? আর কেনই বা আমি পেরাশ্চিত্তির করপো? আমি কোন অন্যায় করি নাই। ওপরে যিনি আছেন তিনিই জানেন কি অবস্থায় তোরা আমাক ফেলি আসছিলি, তাত তোমাক

Dhaka University Institutional Repository

অজানা নয়, সেই অবস্থায় আমাক যদি মোছলমান মৃত্যুর মুখ থেকি ফেরৎ আইনে–তা হলি সেডা তাদের অন্যায় হয়লো না। বাঁচাডাই আমাক অন্যায় হয়ল, তার জন্যি ঘর-বাড়ি বেচে সর্বসান্ত হ্যয়ে মা বউক পথের ভিকিরী করি দিতি হপি ? এই বিধান ? বা বারে চমৎকার ![৭১]

সমাজে প্রচলিত ধর্ম এ ধরনের সমাজ বহির্ভূত মানুষগুলোকে ঠাঁই দেয় না। অবশেষে তারা এই গৌণ ধর্ম অবলম্বন করে টিকে থাকে। এই ধর্ম তুলনামূলক উদার ও প্রথাবিরোধী। আশৈশব সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্ত লালন ফকির গানের মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত বিধি-নিষেধের প্রতি প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করেছেন। যে বিধি-নিষেধ নিয়মের ধারাবাহিকতায় চলে না, চলে সমাজপতিদের ইচ্ছায়, সেই নিয়মের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। দেহাত্মবাদ, পরকালের প্রতি জিজ্ঞাসা, লোভ-লালসায় পূর্ণ মানুষের মন প্রতিনিয়ত পাপ-পুণ্যের দোলাচালে ক্ষত-বিক্ষত হয় তাই লালন সঙ্গীতের বহুবিধ ধারায় ব্যক্ত হয়েছে। বর্তমানে দেশি-বিদেশি অসংখ্য মানুষ লালন সঙ্গীত, লালনের জীবনাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। লালন সঙ্গীত বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করেছে।

নাটকে ষোলটি গানের ব্যবহার হয়েছে। ভাষা ও সাহিত্যাচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে নাটকটি উৎসর্গ করা হয়। ১৯৭০ সালে ৩রা জুন সন্ধ্যা ৭টায় এই নাটক কলামন্দিরের রূপকার গোষ্ঠী প্রথম অভিনয় করে। 'সংহতি' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় ১৯৭১-এ নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

"মহাউদ্বোধন"(১৯৬৩) নাটকটি বিবেকানন্দের আদ্যলীলা নাটক। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের প্রথম দিককার ঘটনা এখানে নাট্য কাহিনী সূত্রে বিবৃত হয়েছে। স্বামী

বিবেকানন্দ(১২.১.১৮৬৩ - ৪.৭.১৯০২), জন্মস্থান–সিমুলিয়া, কোলকাতা। পিতা-বিশ্বনাথদত্ত; মাতা-ভুবনেশ্বরী। শৈশবের নাম বীরেশ্বর বা বিলে। অ্যাটর্নি পিতার মেধাবী সন্তান। মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশন ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৮৪ খ্রি. জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনিস্টিটিউশন থেকে বি.এ. পাশ করেন। আইন পড়বার সময় পিতার মৃত্যুতে সাংসারিক অনটন দেখা দিলে পড়া বন্ধ করতে বাধ্য হন। ইতোমধ্যেই দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বিবিধ গ্রন্থের মাধ্যমে সত্যানুন্ধান চলছিল।

সাংসারিক প্রয়োজনে মেট্রোপলিটান স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কলেজে পড়ার সময় রাজা রামমোহন রায়ের বেদান্তদর্শন বিষয়ে গ্রন্থ পড়ে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন। এফ.এ. পড়ার সময় রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ পেয়ে গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। ক্রমে রামকৃষ্ণের কাছ থেকে মানবসেবার দীক্ষা নেন। ১৬ আগস্ট ১৮৮৬ খ্রি. রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর গুরুভ্রাতাদের নিয়ে বরাহনগরে মঠ স্থাপন করে সন্ন্যাস-নাম 'বিবেকানন্দ' গ্রহণ করেন। পরের তিন বছর পরিব্রাজকরূপে সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। এই সময় জয়পুরের সভাপণ্ডিতদের কাছ থেকে অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি, ক্ষেত্রীর সভাপণ্ডিত নারায়ণদাসের কাছে পতঞ্জলির মহাভাষ্য এবং পোরবন্দরের পাণ্ডুরংয়ের কাছে বেদান্ত শেখেন। মাদ্রাজে থাকা কালে শিষ্যদের অনুরোধে এবং সারদা দেবীর অনুমতি নিয়ে তিনি শিকাগো ধর্ম মহাসভায় যোগদানের জন্য ৩১ মে ১৮৯৩ খ্রি.আমেরিকা যাত্রা করেন। ১১ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত ওই মহাসভায় হিন্দু ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে অসামান্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেন এবং ধর্ম প্রচারক মহলে

আলোড়ন তোলেন। তাঁর বেদান্ত সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বহু নর-নারী তাঁর বক্তব্যে ও ধর্মমতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

'১ মে ১৮৯৭ খ্রি. রামকৃষ্ণ মিশন' এবং ১৮৯৯ খ্রি. রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র হিসাবে 'বেলুড় মঠ' প্রতিষ্ঠা করেন। এই মিশনের মূল আদর্শ ছিল-মানবসেবা। বেদান্ত ও রামকৃষ্ণের শিক্ষা প্রচারের জন্য বাংলায় 'উদ্বোধন' ও ইংরেজিতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে দুটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ভারতে ফিরে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বেনারসে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও রামকৃষ্ণ হোম, রামকৃষ্ণ পাঠশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে অবতীর্ণ না হলেও তাঁর বক্তৃতা ও রচনা দেশের যুবকদের প্রাণে অভূতপূর্ব প্রেরণা জুগিয়েছিল। তিনি আধুনিক ভারতের অন্যতম স্রষ্টা বলে পূজিত হন। তিনি সংস্কার ও আচারের বহিরাবরণ সরিয়ে ভারতাত্মাকে জাগ্রত করেছেন, দেশকে নতুন জাতীয়তা ও মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং বিশ্বের কাছে ভারতের ভাবমূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[৭২]

আলোচ্য 'মহাউদ্বোধন' নাটকে যুবক নরেন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবন, রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যলাভ এবং তারপরে সমস্ত সংশয় দ্বিধার অমানিশা দূর হয়ে তাঁর শরণাগত হওয়াতেই নাটকের সমাপ্তি। নাটকে দ্বিতীয় দৃশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের একেশ্বরবাদে বিশ্বাস তাঁর সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশ পায়,

> তা যদি বল বাপু, "ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মানলে আর একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি ;–অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না ; আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না ; সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না ; সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না। যেমন জল, 'water'

'পানি'। এক পুকুরে তিন-চার ঘাট ; এক ঘাটে মুসলমানেরা 'জল খায়, তারা বলে 'পানি'। আর এক ঘাটে ইংরাজেরা জল খায়, তারা বলে 'water'। তিনিই এক ; কেবল নামে তফাৎ। তাঁকে কেউ বলছে 'আল্লা'; 'God' কেউ বলছে 'ব্রহ্ম' কেউ 'কালী'; কেউ বলছে 'রাম'; হরি, যীশু, দুর্গা। ঈশ্বর এক। একমেবাদ্বিতীয়ম। তাঁর কাছে যেতে 'যত মত,তত পথ'।[৭৩]

দ্বিতীয়বার নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ)-কে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ভক্তি বিগলিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, "আমি জানি তুমি কে ? তুমি সপ্তর্ষির এক ঋষি, নররূপী নারায়ণ। জীবের দুর্গতি দূর করতে আবার শরীর ধরেছ।"[৭৪]

আবার কখনও অন্য কোনো ভক্তের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং নরেন (স্বামী বিবেকানন্দ) সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এভাবেই,

''যেন খাপ খোলা তলোয়ার নিয়ে বেড়াচ্ছে। জন্ম থেকেই ব্রহ্ম-জ্ঞানী। নিত্যসিদ্ধের থাক। মাকে তো বলি, 'মা, নরেনের অদ্বৈত অনুভূতি তোর মায়াশক্তি দিয়ে আবরণ করে রাখ মা–আমার ওকে দিয়ে যে অনেক কাজ করিয়ে নিতে হবে।"[৭৫]

'মহাউদ্বোধন' নাটকে চরিত্র সংখ্যা ১৮টি। ৬টি দৃশ্যে সমাপ্ত। ৪টি গানের ব্যবহার হয়েছে।

"শরৎ বিপ্লব"(১৯৭৫) শরৎচন্দ্রের জীবনী অবলম্বনে রচিত নাটক বিশেষ। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৫.৯.১৮৭৬-১৬.১.১৯৩৮),জন্মস্থান–দেবানন্দপুর–হুগলি। পিতা–মতিলাল, মাতা–ভুবনমোহিনী। প্রখ্যাত কথাশিল্পী। শরৎচন্দ্র ১৭ বছর বয়সে গল্প লিখতে শুরু করেন। পিতার মৃত্যুর

পর ভাগ্যান্বেষণে ১৯০৩ খ্রি. ব্রহ্মদেশে যাত্রা করার আগে অর্থোপার্জনের জন্য কিছুদিন চাকরি করলেও বেশিরভাগ সময়ই বেকার থাকেন। সাংসারিক ব্যাপারে নির্লিপ্ত ছিলেন।

১৩১৯-২০ ব. ফণী পালের 'যমুনা' পত্রিকায় নতুন রচনা 'রামের সুমতি', 'পথ-নির্দেশ' ও বিন্দুর ছেলে প্রকাশিত হলে চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। এরপর ১৩০২-২২ ব. ভারতবর্ষ পত্রিকায় বিরাজ বৌ, পণ্ডিতমশাই, পল্লীসমাজ প্রভৃতি প্রকাশিত হলে বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। রেঙ্গুনে স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় ১৯১৪ খ্রী: কলকাতায় আসেন। প্রথম বাজে-শিবপুর অঞ্চলে থাকতেন। পরে ১৯১৯ খ্রী: হাওড়া জেলার পানিত্রাস গ্রামে বাড়ি করে বহুদিন কাটান। শেষজীবনে কলকাতায় অশ্বিনী দত্ত রোডে বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলে স্বীকার করতেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা 'মন্দির' নামে গল্পটি ১৩০৯ ব. কুন্তলীন পুরস্কার লাভ করে। তিনি বড়দিদি অনিলা দেবীর ছদ্মনামে কয়েকটি প্রবন্ধ 'নারীর লেখা, 'নারীর মূল্য, 'কানকাটা, ও 'গুরু শিষ্য সংবাদ' প্রভৃতি প্রকাশ করেন। ১৪১৯-২০ ব. যমুনা পত্রিকায় 'বড়দিদি'-ই (১৯১৩) সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।[৭৬]

রাজনীতি বিষয়ে তাঁর বহু প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে। তিনি বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসাবে কিছুদিন কাজ করার পর তথাকথিত রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর বিরূপ হয়ে পদত্যাগ করেন। ' স্বদেশ ও সাহিত্যে'র স্বদেশ বিভাগে তাঁর মাত্র কয়েকটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'তরুণের বিদ্রোহ' উল্লেখযোগ্য। ১৯২৩ খ্রী: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী সুবর্ণপদক' এবং

১৯৩৬ খ্রী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট. বা সাহিত্যাচার্য উপাধি পান। ১৯৩৪ খ্রি. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য হন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জয়মালা দিয়েছিলেন। রেঙ্গুনে বাসকালে চিত্রাঙ্কন করতেন। তাঁর অঙ্কিত মহাশ্বেতা অয়েল পেন্টিং বিখ্যাত। তাঁর রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: শ্রীকান্ত (৪ খণ্ড), চরিত্রহীন, গৃহদাহ, দত্তা, দেবদাস, শেষ প্রশ্ন, নববিধান, পথের দাবী প্রভৃতি। বাংলার বিপ্লববাদীদের সমর্থক বলে তাঁর 'পথের দাবী, গ্রন্থটি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।

আলোচ্য **'শরৎ বিপ্লব'** নাটকে নাট্যকার শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন, সাহিত্যজীবন এবং রাজনৈতিক জীবনের প্রধান ঘটনাগুলিকে সমন্বিত করে এ নাটক লিখেছেন। নাট্যকার মন্মথ রায় নিজেই বলেছেন এ নাটক লেখার সময় তিনি ড. অজিতকুমার ঘোষের 'শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার', ড. শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শরৎ চেতনা' এবং শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের 'শরৎচন্দ্র' ১ম খণ্ডের সাহায্য নিয়েছেন। নাটকটিতে ২৮টি চরিত্র আছে। ৭টি দৃশ্য। চতুর্থ দৃশ্যের অন্তর্গত তিনটি কাণ্ড ,পঞ্চম দৃশ্যের অন্তর্গত তিনটি কাণ্ড, অতিরিক্ত 'ক' ও 'খ' চিহ্নিত দুটি দৃশ্য। নাটকটির আরম্ভ ১৯০৭ সালে থেকে। ঘটনাস্থল শরৎচন্দ্রের কর্মভূমি রেঙ্গুনে। পঞ্চম দৃশ্য থেকে ঘটনাস্থল ভারতবর্ষে (১৯১৬)–বাংলাদেশে-শিবুপুরে সামতাবেড়ের বাড়িতে। শরৎচন্দ্রের অন্তিম পরিণতিতে নাটকের সমাপ্তি ঘটে। শরৎচন্দ্র আজীবন সমাজের নিগৃহীত, অবহেলিত, বঞ্চিত নারীদের বেদনার কথা সাহিত্যকর্মে ফুটিয়ে তুলেছেন। সমাজের বাল্যবিধবা নামক কুপ্রথার কারণে ব্যক্তিজীবনে তার ভালবাসা পরিণতি লাভ করেনি। শরৎচন্দ্রের পরিণত জীবনে গায়ত্রী, শান্তি, মোক্ষদা (হিরন্ময়ী) প্রভৃতি

নারী চরিত্র যারা ব্যক্তিগতভাবে শরৎচন্দ্রের জীবনের সাথে জড়িত ছিলেন। এ সকল নারীরা সমাজে নানারকম নির্মম নিষ্পেষণের শিকার হতে দেখা যায়। শরৎচন্দ্র তাই আক্ষেপ করে বলেছিলেন:

আমি লিখব–প্রাণ ভরে লিখব, সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই–যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত–মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনো হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের–এদের কাছেও কি আমার ঋণ কম ? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে–এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি দেখেছি কত অবিচার,কত কুবিচার, কত দেখেছি নির্বিচারে দুঃসহ অবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদের নিয়ে। এই যুগ যন্ত্রণার কতটুকু আমি লিখতে পেরেছি ! আমি লিখতে চাই। আমি বাঁচতে চাই। আমি লিখব। লিখতে লিখতে মরতে চাই।[৭৭]

কিন্তু যুগ যুগ ধরে যে অন্যায়, অবিচার সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে তা এত সহজে নির্মূল হবার নয়। তাইতো সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের আর্ত হৃদয় হাহাকার করে ওঠে,

কি হল ঐ বই-টই লিখে! কারো কি মন ভিজলো ! কারো কি মন গললো ! যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত সংস্কার–আমি এক জন্মে দূর করতে পারি ? না-না, আমি ব্যর্থ ! বিধাতা ! বিধাতা ! তুমি এত বিরাট, কিন্তু মানুষের জীবনটা এতটুকু করেছ কেন ? এ যে–এক জন্মে কিছুই হবার নয় ! সাধনার ধন কিছুই পাওয়ার নয় ![৭৮]

'শরৎ বিপ্লব' নাটকটি ড. অজিতকুমার ঘোষকে উৎসর্গ করা হয়।

"অমরপ্রেম"(১৯৭৬)-নাটকটি নাট্য দিক্‌পাল অমরেন্দ্রনাথ দত্তের জীবনীভিত্তিক নাটক। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১.৪.১৮৭৬–৬.১.১৯১৬), জন্মস্থান হাটখোলা–কোলকাতা। বাড়িতে শখের যাত্রা দেখে বাল্যকাল থেকেই অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ জন্মে। স্টারের খ্যাতনামা অভিনেত্রী তারাসুন্দরীর সঙ্গে নাট্যানুশীলন শুরু করেন এবং 'ইন্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাব' গঠন করেন। ১৬.৪.১৮৯৭ খ্রি. ক্ল্যাসিক থিয়েটারে তার প্রথম অভিনয়। পরে স্টার, মিনার্ভা প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চেও অভিনয় করেন। নাট্যশালার দৃশ্যপট সাজসজ্জায়ও নতুনত্ব এনেছিলেন। ১২.১২.১৯১২ খ্রি. স্টার থিয়েটারে 'সাজাহান' নাটকে ঔরঙ্গজীবের ভূমিকায় শেষ অভিনয় করেন। বিভিন্ন সময়ে 'সৌরভ, 'রঙ্গালয়, ও 'নাট্যমন্দির, পত্রিকাসমূহ প্রকাশ করেন এবং শেষোক্ত পত্রিকাটির সম্পাদক হন। তাঁর রচিত নাটক ও প্রহসন–'ঊষা, 'শ্রীকৃষ্ণ, 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ, 'কেয়া মজেদার, 'প্রেমের জেপলিন, প্রভৃতি অন্যতম।[৭৯]

আলোচ্য 'অমরপ্রেম' নাটকটি পঞ্চদশ দৃশ্য সমন্বিত নাটক। চরিত্র সংখ্যা স্ত্রী পুরুষ মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ। স্টার থিয়েটারে চন্দ্রশেখর নাটকের অভিনয় দেখে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত অভিনেতার জীবনে যোগ দিতে চাইলেন। সূচনা হল তাঁর অভিনয় জীবনের। তাঁর বিস্তৃত ব্যক্তিজীবন ও নাট্যজীবন পরিক্রমার ইতিহাস এখানে মন্মথ রায় অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের স্ত্রী হেমনলিনী দেবী স্বামীর থিয়েটার প্রীতি দেখে স্বামীকে মায়ার বাঁধনে আটকে রাখলেন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণের চিত্রপটের সামনে গিয়ে করজোড়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন,

Dhaka University Institutional Repository

ঠাকুর ! আমি কিছু বুঝি না, আমি বোকা–আমি মুখ্যু। কিন্তু ঠাকুর, এটুকু আমি বুঝেছি, আমার চেয়ে বড় কিছু পেয়েছেন বলেই, আমাকে ছেড়ে আজ এমন করে চলে যাচ্ছেন। জান তো, ওঁকে বাধা দেবার শক্তি আমার নেই, কারোরই নেই। তুমি এটুকু শুধু দেখ ওঁর যেন মঙ্গল হয়।[৮০]

আর তাই অমরেন্দ্রনাথ দত্ত স্ত্রীর এই সর্বংসহা নির্বাক হয়ে থাকাতেই সবচেয়ে বেশি বিব্রতবোধ করতেন। তৃতীয় দৃশ্যে অভিনেত্রী তারাসুন্দরীকে উদ্দেশ্য করে বলতে শোনা যায়,

তুমি জান না–তুমি জান না তারা, আমার মা আর আমার স্ত্রী–এঁরা দুজনেই কি ভয়ঙ্কর জিনিস ! না–না তারা, এরা দুজনেই কখনো কোন অভিযোগ করেন না–কান্নাকাটি করেন না। মা হয়তো মাঝে মাঝে বড় জোর কিছু উপদেশ দেন, কিন্তু আমার স্ত্রী–মানে হেমনলিনী, সে আরো সাংঘাতিক। সে শুধু হাসে আর বলে–তোমার সুখেই আমার সুখ। আমি থিয়েটার ভালবাসি দেখে, সে থিয়েটার না দেখেই থিয়েটার ভালবাসে। তারা–তারা, থিয়েটারের জন্য যদি আমি সর্বস্ব ত্যাগ করে থাকি, জানবে–এই হেমনলিনীও এই থিয়েটারের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছে। আর তা করেছে–হাসিমুখে। জান, আমার হেমনলিনী–আমার এই তারাসুন্দরীকেও ভালবাসে। সত্যই আশ্চর্য ! ওকে আমি তাই এত ভয় পাই–আর বাড়িও যাই না তাই।[৮১]

নাটকের শেষাংশে হেমনলিনীর মৃত্যুর সময় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত উপস্থিত ছিলেন। স্ত্রীর অসাধারণ আত্মত্যাগ অমরেন্দ্রনাথ দত্তের উক্তিতে প্রকাশ পায়, "তুমিই যে আমার প্রথম প্রেম। তোমার দেয়া অর্থেই শুরু আমার থিয়েটার। আমার সাধনার ধন, থিয়েটারের প্রাণটিই যে তুমি।"[৮২]

নানারকম প্রতিকূলতার পরেও অমরেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে থিয়েটার অনেক বড় কিছু। তারাসুন্দরীকে উদ্দেশ্য করে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত যখন বললেন, "তারা ! থিয়েটার হচ্ছে একটা সাধনা। এজন্য পাঁচ ফুলের একটা সাজি চাই। সেখানে যত ভাল ফুল আছে, সব জোগাড় করে তবেই না নাট্য-লক্ষ্মীর সত্যিকার পূজা!"[৮৩]

এ নাটকের যেটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য তা হল নাট্যকার মন্মথ রায় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত অভিনীত বহু নাটকের অংশ এখানে সংযোজিত করেছেন। 'সাজাহান' নাটকে ঔরঙ্গজীবের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত অভিনয় করতে গিয়ে হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়ার ঘটনার মধ্যে দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

"ডাঃ সরকার"(১৯৮৬)–নাটকটি প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক (পরে এ্যালোপ্যাথিক) মহেন্দ্রলাল সরকারের জীবন অবলম্বনে লেখা। মহেন্দ্রলাল সরকারের (২.১১.১৮৩৩–২৩.২.১৯০৪) জন্মস্থান–পাইকপাড়া (মুন্সিরহাট)–হাওড়া, তারকনাথ। প্রথমে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল ও পরে হিন্দু কলেজে পড়া শেষ করে ১৮৬১ খ্রী: কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে আই.এম.এস এবং ১৮৬৩ খ্রী: এম. ডি উপাধি পান। প্রথম এম.ডি.চন্দ্রকুমার দে (১৮৬২) উপাধি লাভের পর চিকিৎসা পেশা শুরু করে খ্যাতি লাভ করেন। 'Bengal Branch of the British Medical Association–এর সেক্রেটারি ও সহ-সভাপতি থাকার সময়ে তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির বিরুদ্ধে মত দেন। পরে হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাসী হয়ে ১৬.২.১৮৬৭ খ্রী: অ্যাসোসিয়েশনের চতুর্থ বার্ষিক সভায় এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর সর্বজননিন্দিত কতকগুলি দোষ কীর্তন করে হ্যানিম্যানের আবিষ্কৃত

প্রণালীর যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করেন। ফলে উপস্থিত বহু সাহেব ও ভারতীয় ডাক্তারের বিরাগভাজন হন। অ্যাসোসিয়েশন থেকে তাকে বহিষ্কৃত করা হয় এবং সেই সঙ্গে তাঁর উপর একঘরে করার মতো অত্যাচার চলে। নিজ মত প্রকাশের জন্য তিনি ১৮৬৭ খ্রী:'Culcutta Journal of Medicine' পত্রিকা প্রকাশ করেন।[৮৪] তাঁর জীবিতকালে তিনিই ছিলেন সর্বপ্রধান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। অক্রুর দত্ত পরিবারের রাজেন্দ্র দত্ত হোমিওপ্যাথি প্রচারে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। তাকে আর্থিক সাহায্য দিতে চাইলে তিনি বিনয় ভরে তা অস্বীকার করেন। তিনি বললেন,

"আপনার পায়ে পড়ছি আপনি আমার এ সর্বনাশ করবেন না। প্রতিভার উন্মেষ হয় দারিদ্র্যে। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে যাতে আমি বড় হতে পারি–আবার যাতে আমার লুপ্ত গৌরব ফিরে পেতে পারি–আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আমাকে এই আশীর্বাদ করুন।"[৮৫]

দেশবাসীকে বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ দানের জন্য ২৯.৭.১৮৭৬ খ্রি.'Indian Association for the Cultivation of Science'–সংস্থার প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই সংস্থা সম্পর্কে ডাঃ সরকার তাঁর পুত্র অমৃতলালকে বললেন,

> আমাদের দেশে বিজ্ঞানচর্চা নেই বললেই হয়। আমাদের বিদেশী শাসকরাও চান না যে আমরা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে বড়ো হই। কিন্তু আমি মনে প্রাণে চাইছি দুটি জিনিস বেড়ে উঠুক–বড়ো হোক। একটি তুমি আর একটি আমার ওই Association। আর এই দুটি কাজের জন্যে যাতে টাকার অভাব না হয় সে ব্যবস্থা আমি করেছি। এখন থেকে ওই প্রতিষ্ঠানটি দেখা তোমার একটা বড় দায়িত্ব হোয়ে রইলো কিন্তু।[৮৬]

তাঁর পরামর্শে সরকারি বিবাহবিধি প্রণয়নে (Marriage Act III of−1872) মেয়েদের বিবাহের বয়স ন্যূনপক্ষে ১৬ বছর নির্ধারণ করেছিলেন। ১৮৮৮ খ্রি. বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতার শেরিফ (১৮৮৭) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রি. সি.আই.ই. এবং ১৮৯৮ খ্রি. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর অব ল' উপাধি পান। বৈদ্যনাথ রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞান ছাড়াও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।[৮৭]

আলোচ্য 'ডাঃ সরকার' নাটকটি ৪ অঙ্কের নাটক। সূচনাতে একটি 'প্রস্তাবনা' অংশ রয়েছে। তিনি রামকৃ''দেবের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। এ নাটকে মন্মথ রায় মহেন্দ্রলাল সরকারকে শুধু একজন বিখ্যাত চিকিৎসক রূপেই নয়. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বহুগুণের আধার হিসেবেই তুলে ধরেছেন। পুত্র ডাঃ অমৃতলাল সরকারকে একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক, একজন আদর্শ পিতার মতই উপদেশ দেন,

> আমি যেন দীনদুঃখীর সেবা করে যেতে পারি চিরকাল আর তুমি আমার চেয়েও বড় হয়ে ওই দীনদুঃখীর সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করতে পারো। দেশটা বড়ই গরীব বাবা, বড়ই গরীব। বিদেশী শাসন তো। এদেশ থেকে সব লুটেপুটে নিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার জন্য তেমন একটা লড়াই এখনও জমে উঠল না।[৮৮]

নাটকের সমাপ্তি ঘটছে ডাঃ সরকারের মহাপ্রয়াণে। নাটকে স্ত্রী পুরুষ মিলিয়ে মোট ১৮টি চরিত্র রয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দশকেই বাংলা সামাজিক নাটকের একটি রূপ চোখে পড়ে। সামাজিক নাট্যচিত্র, সামাজিক নকশা নাটক, সমাজ সংস্কারমূলক বিদ্রূপাত্মক প্রহসন থেকেই এ যুগের নাট্যকারদের বিশেষ ধরনের মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। রামনারায়ণ তর্করত্নের সামাজিক নাট্যচিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহের সামাজিক নকশা নাটক, মধুসূদনের প্রহসন দুটি, দীনবন্ধুর প্রহসন ও নাটক এই সামাজিক নাটকের গতিপথ নির্দেশ করেছে। সমসাময়িক দেশকালের পটভূমিকায় রচিত এই যুগের নাট্য প্রচেষ্টাগুলি থেকে সে যুগের সমাজ জীবনের একটি নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়। দীনবন্ধু মিত্রের পর গিরিশচন্দ্র ঘোষই মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘরের কথাকে অনেক বেশি বাস্তব সম্মতভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু সে জীবন এত একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন যে তাতে নাটকীয় বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য গিরিশচন্দ্রকে জাল জোচ্চুরি, মারামারি, বীভৎস হত্যা, মদ্যপ চরিত্র এবং প্রতারণা, সম্পত্তি হরণ ইত্যাদি অতি নাটকীয় বিষয়কে নাটকে আমদানি করতে হয়েছিল। ফলে তাঁর অধিকাংশ সামাজিক নাটকের সূক্ষ্মরস নষ্ট হয়ে গেছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সামাজিক নাটক লিখেছিলেন কিন্তু তাতে তিনি রোমান্টিক নাটকের কলাকৌশলই অবলম্বন করেছিলেন। ফলে সামাজিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে কোনো নতুন দিক নির্দেশ করতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সামাজিক নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র নির্দেশিত পথই পরবর্তীকালের নাট্যকারগণ অনুসরণ করেছিলেন। এরপর বিধায়ক ভট্টাচার্য তাঁর সামাজিক নাটকে সমাজ সমস্যাকে শুধু স্পর্শই করেননি, সমস্যার গভীরেও প্রবেশ করেছেন। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অয়স্কান্ত বক্সী,

প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু, যোগেশ চৌধুরী, জলধর চট্টোপাধ্যায়, বনফুল সামাজিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

যুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশ বিভাগের ফলে বাঙালীর সামাজিক জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। পূর্ববঙ্গের অসহায় মানুষদের বাস্তুত্যাগ, খোলা রাস্তায়, স্টেশনে, তাঁবুতে অভাবনীয় জীবনযাপন ভয়ঙ্কর দুর্যোগের সূচনা করল। পারিবারিক আদর্শের পরিবর্তন ঘটল। সমাজে নারী জীবন সম্পর্কে ধ্যান ধারণারও পরিবর্তন ঘটল এবং নাটকের বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, চরিত্রগুলিরও বদল হল। নাটকে নতুন চিন্তাধারা, নতুন কথা বলতে এলেন বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্মথ রায় এঁদের অনেক আগে নাট্যরচনা শুরু করলেও সামাজিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে এঁদের বেশ কিছুটা পরবর্তীকালের বলা যায়। নাটকে তিনি সব সময় সমকালীন থাকবার চেষ্টা করেছেন। তাই আধুনিক নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে পরিপূর্ণ আত্মিক যোগ রেখে তিনি তাঁর নাটকে প্রগতিশীল চিন্তা ও আদর্শের ছাপ রাখতে চেয়েছেন। প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ কেমন করে পরিবর্তিত হয়ে এক একটি নতুন সামাজিক বিপর্যয় ঘটিয়ে তুলছে, তাই-ই তাঁর নাটকে তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। সামাজিক দুর্নীতি ও গ্লানিকে তিনি বিশ্লেষণাত্মক বুদ্ধি ও মননশীলতার সঙ্গে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। আধুনিক ক্ষয়িষ্ণু সমাজের নানা বৈষম্য, রূঢ় অসঙ্গতি ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিপর্যয় ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনকে কতখানি বিপর্যস্ত করে–সে চিত্রই মন্মথ রায় তাঁর সামাজিক নাটকে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। যদিও সামাজিক একাঙ্কগুলিতে তাঁর মননসমৃদ্ধ দৃষ্টি ও মর্মভেদী ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সাহায্যে প্রচলিত সামাজিক ধারণা ও মূল্যবোধকে তীব্রভাবে আক্রমণ করার প্রচেষ্টা অনেক বেশি সার্থক

হয়েছে–তবু একথা স্বীকার করতে কষ্ট হয় না যে সে তুলনায় সামাজিক নাটকগুলি দুর্বল হলেও তাঁর প্রয়াস একেবারে অসফল হয়নি।

নাট্যকার মন্মথ রায় শিল্পী ও স্রষ্টার সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতায় আজীবন বিশ্বাসী থেকেছেন। দুই-এর দশক থেকে আট-এর দশক এই দীর্ঘ সময় ধরে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন দেশের অসংখ্য পরিবর্তন-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বলয়ে বিচিত্র টানাপোড়েন–পট পরিবর্তন। সময়ের সঙ্গে সব সময় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। ফলে তাঁর সমাজচিন্তা, রাজনৈতিক দর্শন বিবর্তিত হয়েছে–দেশাত্মবোধক জাতীয়তাবাদী গান্ধীনীতি সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসে পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের সূত্ররেখাটি ধরে তাঁর নাটক রচনার সময়কালের মধ্যে স্পষ্ট দুটি পর্যায় বিভাজন করা যায়। প্রথম পর্যায়ের নাটক নির্মাণের (১৯২৭-১৯৩৮) মধ্যে দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবাদী ভাবনা,স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত হয়েছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে এই পর্বের রচনাগুলির সব কটিই সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রয়োজনের তাগিদে লেখা, যে কারণে মন্মথ রায়কে 'দর্জি নাট্যকার' অভিধাও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না জাতীয় সংকট মোকাবিলার জন্য, জাতির দেশাত্মবোধের উন্মাদনাকে নাটক ও নাট্যশালায় প্রতিফলিত করার লক্ষ্যে কালের দাবি মেনে দেশের ব্যাপকতম অংশের মানুষের চাহিদাকে মন্মথ রায় তাঁর নাটকে মর্যাদা দিয়েছেন। কাজেই প্রথম পর্যায়ের রচনা প্রয়োজনের তাগিদে হলেও নাট্যকার 'কাপড় অনুযায়ীই পোশাকটি তৈরি করেছেন'–ইংরেজি প্রবাদের বাংলা করে এমনটিই বলতে হচ্ছে। কারণ নাটকগুলোর মঞ্চ সাফল্য একইসঙ্গে জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব উন্মাদনা সঞ্চারের পাশাপাশি দেশের তৎকালীন

শাসকশ্রেণিকেও যথেষ্ট বিচলিত করে তুলেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের (১৯৪৮-১৯৭২) নাটকগুলোতে মন্মথ রায় অনেক বেশি জীবন ঘনিষ্ঠ ছিলেন ।

এ পর্বে নাট্যকারের সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি খানিকটা প্রতিবাদী ভূমিকায় নাটকগুলিতে অভিব্যক্ত হয়েছে। কারণ, ইতোমধ্যে ঘটে যাওয়া যুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশবিভাগজনিত অসহনীয় বিপর্যয়, উদ্বাস্তু সমস্যা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, জমিদারি ব্যবস্থার বিলুপ্তি ও মধ্যস্বত্বভোগী মানুষদের অন্য বৃত্তি অবলম্বন করে বাঁচতে চাওয়া,স্বাধীন দেশে দ্রুত শিল্প সম্প্রসারণ, শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার, সাম্যবাদী নীতির প্রভাব বৃদ্ধি–সমস্যা হিসেবে গোটা দেশের সৃজনশীল লেখক গোষ্ঠীর সামনে যখন এল তখন দায়বদ্ধ স্রষ্টারা যথাযথ ভূমিকা পালন করলেন। নাট্যকার মন্মথ রায়ও এই পর্যায়ের সৃষ্টি সম্ভারের মাধ্যমে সে অঙ্গীকার পালন করলেন। তিনি তাঁর সব রচনাতেই মানুষের সংগ্রামী জীবন ও জীবনযাত্রা এবং মানুষের আত্মিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থিত থেকেছেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করেছেন সেই যুগসন্ধিক্ষণের মূল জাতীয় লক্ষ্য যেহেতু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা, সেই লক্ষ্য সামনে রেখে নাটক রচনা হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। সে কাজটিও তিনি আজীবন করেছেন। ১৯২৭-১৯৩৮ পর্যন্ত সাধারণ রঙ্গালয়গুলিতে অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে তাঁর রচিত পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক বাতাবরণে লেখা আধুনিক মননের নাটকগুলো অভিনীত হয়েছে। সে যুগের বিখ্যাত নট এবং নাট্য নির্দেশকের সমৃদ্ধ অভিনয়ে এবং নির্দেশনায় সেগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ১৯৫২-১৯৭২–এর সময়সীমায় বিভিন্ন নাট্যদল তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের নাটকগুলোতে অভিনয় করেছে ।

নাট্যকার মন্মথ রায় নাটক সৃজনের মাধ্যমে আজীবন লালিত বিশ্বাসকে প্রোথিত করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেছেন আমাদের নাটক ও নাট্যশালা এই সমাজ জীবনকে কখনই অবহেলা করতে পারে না। তাই তাঁর কাছে নাটক আর বিলাস নয়, আত্মরক্ষার, মর্যাদা রক্ষার হাতিয়ারস্বরূপ। এই হাতিয়ারটিকে তিনি সর্বদা শাণিত রেখেছেন–যে কোনও কালে, যে কোনও পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার জন্য এবং তিনি যথাযথ সময়োচিত ব্যবহারেই তার স্বাক্ষর রেখেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, "নাট্যতত্ত্ব বিচার", কলকাতা-১৩৯১,পৃ.২৩৮

২. প্রাগুক্ত,পৃ.২৪২

৩. জয়তী ঘোষ, "মন্মথ রায়: জীবন ও সৃজন" কলকাতা-২০০০,পৃ.৪১

৪. প্রাগুক্ত ,পৃ.৪৪

৫. প্রাগুক্ত,পৃ.৪৫-৪৬

৬. প্রাগুক্ত,পৃ.৪৮-৪৯

৭. প্রাগুক্ত,পৃ.৪৯

৮. মন্মথ রায়ের গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, কারাগার নাটকের 'লেখকের কথা' অংশ থেকে নেয়া। এরপর থেকে 'নাট্য গ্রন্থাবলী' নামে উল্লিখিত হবে।

৯. জয়তী ঘোষ, পূর্বোক্ত,পৃ.৫০-৫১

১০. সনাতন গোস্বামী (সম্পা:) "নাট্যকার মন্মথ রায় স্মরণ ও মনন" গ্রন্থের অন্তর্গত "বাঙলার সাধারণ মঞ্চ ও আমি" প্রবন্ধ,পৃ. ১৩১

১১. শশীভূষণ দাশগুপ্ত, "টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ", জয়তী ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২ থেকে উদ্ধৃত

১২. প্রাগুক্ত,পৃ.৫২

১৩. প্রাগুক্ত,পৃ.৫২-৫৩

১৪. প্রাগুক্ত,পৃ.৫৩

১৫. প্রাগুক্ত,পৃ.৫৯

১৬. প্রাগুক্ত,পৃ.৬০

১৭. প্রাগুক্ত,পৃ.৬১

১৮. প্রাগুক্ত,পৃ.৬১

১৯. প্রাগুক্ত,পৃ.৬২

২০. প্রাগুক্ত,পৃ.৬৪

২১. প্রাগুক্ত,পৃ.৬৪-৬৫

২২. প্রাগুক্ত,পৃ.৬৫

২৩. প্রাগুক্ত,পৃ.৬৭

২৪. প্রাগুক্ত,পৃ.৬৭

২৫. সাধন কুমার ভট্টাচার্য,"নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা", জয়তী ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭ থেকে উদ্ধৃত

২৬. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, পৌরাণিক নাটক/রঙ্গালয় ৩০ চৈত্র ১৩৭০, জয়তী ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮ থেকে উদ্ধৃত

২৭. প্রাগুক্ত ,পৃ.৬৮

২৮. ভূদেব চৌধুরী, "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস", জয়তী ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮ থেকে উদ্ধৃত

২৯. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়,পূর্বোক্ত ,পৃ.২৪৫

৩০. প্রাগুক্ত,পৃ.২৪৬

৩১. প্রাগুক্ত,পৃ.২৪৭

৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,"ঐতিহাসিক উপন্যাস"–'সাহিত্য' গ্রন্থ, দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮ থেকে উদ্ধৃত

৩৩. অজিতকুমার ঘোষ, "মন্মথ রায়" পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি- কলকাতা-২০০১,পৃ.৩৯

৩৪. জয়তী ঘোষ, পূর্বোক্ত ,পৃ.৭৪

৩৫. প্রাগুক্ত,পৃ.৭৫

৩৬. প্রাগুক্ত,পৃ.৭৫

৩৭. প্রাগুক্ত,পৃ.৭৬

৩৮. প্রাগুক্ত,পৃ.৭৬

৩৯. প্রাগুক্ত,পৃ.৭৬

৪০. প্রাগুক্ত,পৃ. ৭৬-৭৭

৪১. প্রাগুক্ত,পৃ.৭৭

৪২. প্রাগুক্ত,পৃ.৭৮

৪৩. প্রাগুক্ত,পৃ.৭৮

৪৪. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত,পৃ.২৪৪-২৪৫

৪৫. মন্মথ রায় নাট্য গ্রন্থাবলী, পূর্ণাঙ্গ (দ্বিতীয় পর্ব) পৃ.১২৮, এরপর নাট্য গ্রন্থাবলী

নামে উল্লিখিত হবে।

৪৬. নাট্য গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৪০

৪৭. প্রাগুক্ত,পৃ.২৪০

৪৮. জয়তী ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৫-৮৬

৪৯. প্রাগুক্ত,পৃ.৮৬

৫০. প্রাগুক্ত,পৃ.৮৬

৫১. প্রাগুক্ত,পৃ.৮৬

৫২. প্রাগুক্ত,পৃ.৮৬

৫৩. নাট্য গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৪২

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ.১৪২-১৪৩

৫৫. জয়তী ঘোষ, পূর্বোক্ত ,পৃ. ৮৮

৫৬. প্রাগুক্ত,পৃ.৮৮

৫৭. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান প্রথম খণ্ড, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পা. সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-১৯৭৬,পৃ.৭৭৮

৫৮. জয়তী ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৯-৯০

৫৯. অজিতকুমার ঘোষ, "বাংলা নাটকের ইতিহাস", জয়তী ঘোষ, পূর্বোক্ত,পৃ. ৯০

৬০. নাট্য গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড,পূর্ণাঙ্গ (প্রথম পর্ব), পৃ.৪০৩

৬১. প্রাগুক্ত,পৃ.৩০০

৬২. নাট্য গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ.৩১৩

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৯

৬৪. জয়তী ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩

৬৫. প্রাগুক্ত,পৃ.৯৩

৬৬. নাট্য গ্রন্থাবলী, পূর্ণাঙ্গ (দ্বিতীয় পর্ব),পৃ.৩৭১

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৯

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৭-৩৯৮

৬৯. জয়তী ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ.৯৪

৭০. প্রাগুক্ত,পৃ.৯৪

৭১. নাট্য গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড,পূর্ণাঙ্গ (প্রথম পর্ব), পৃ.৪২৯

৭২. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত,পৃ.৪৮০

৭৩. নাট্য গ্রন্থাবলী, পূর্ণাঙ্গ (চতুর্থ পর্ব) পৃ.১১-১২

৭৪. প্রাগুক্ত,পৃ.১০

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫

৭৬. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, পূর্বোক্ত,পৃ.৭০০

৭৭. নাট্য গ্রন্থাবলী, পূর্ণাঙ্গ (দ্বিতীয় পর্ব), পৃ.১০৭-১০৮

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ.১১৩

৭৯. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫-৩৬

৮০. নাট্য গ্রন্থাবলী, পূর্ণাঙ্গ (চতুর্থ পর্ব), পৃ.৫৫

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ.৬১

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ.১৪০

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ.১১৯

৮৪. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৬০

৮৫. নাট্য গ্রন্থাবলী, পূর্ণাঙ্গ (চতুর্থ পর্ব) পৃ.৩৫৬

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৭

৮৭. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৬০

৮৮. নাট্য গ্রন্থাবলী, পূর্ণাঙ্গ (চতুর্থ পর্ব), পৃ.৩৬১

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ॥ নাটকের গঠন শৈলী

নাটকের শিল্পমূল্য বিচার করতে কাহিনী বা প্লট, চরিত্র, ঘটনা-সমাবেশ এবং সংলাপকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করা হয়। যেহেতু এগুলোই নাটকের গঠনের প্রধান উপাদান। এই স্বতন্ত্র অংশগুলো একত্র গ্রথিত হয়ে নাট্যাভিনয়কালে দর্শকদের মনে যদি অখণ্ড ভাবরসের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়,তবেই তাকে নাটক বলা যেতে পারে। এই অংশগুলোকে সমষ্টিগতভাবে রসস্থকরে তোলার জন্য নাট্যশাস্ত্রসম্মত কয়েকটি বিধি রয়েছে। তাকেই নাটকের গঠনশৈলী বলা হয়।

নাটক উপভোগ করার ক্ষেত্রে নাটকের গঠন শৈলীর একটা বিশেষ মূল্য রয়েছে। এই শিল্পরীতি শিথিল হলে কোন নাটককেই শিল্পোত্তীর্ণ বলে গণ্য করা হয় না। সাহিত্য রচনা করার পক্ষে যেমন একটা নিয়ম বা ব্যাকরণ আছে, নাটকের বেলায় এই শিল্পরীতিই (Technique) হলো এর ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণ অধিগত হলে তবেই যে কোন নাট্যকার নাটক রচনায় সিদ্ধিলাভ করেন। এখানে এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে, সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে তার ব্যাকরণই যেমন সর্বস্ব নয়, নাটক-সৃষ্টির বেলায়ও ঠিক তাই। সাহিত্য ও ব্যাকরণ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। নাটক ও তার আঙ্গিক তেমনই পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। একের সাহায্য ছাড়া আর একটি পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।[১]

নাটকের চার অঙ্গ

নাটকের প্রধান অঙ্গ হলো চারটি–কাহিনী/প্লট, চরিত্র, ঘটনা-সমাবেশ ও সংলাপ। নাট্যকার অভিনেতার জন্য এমন কতকগুলি নাট্যমুহূর্ত ও সংলাপের সৃষ্টি করেন, যার সাহায্যে অভিনেতারা

তাদের চরিত্রকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন। যখন সেই কথাগুলোকে একত্র করে একটি কাহিনীর ভিতর দিয়ে দেখা হয়, তখন তার মধ্যে একটা সার্বিক সামঞ্জস্য ফুটে ওঠে। এই ঐক্যবদ্ধ সামঞ্জস্যই নাটকের পক্ষে একটি আবশ্যকীয় বিষয়। প্লট চরিত্রগুলোর অপরিহার্যতাকে তুলে ধরে, তার সূত্রে চরিত্রগুলি কাহিনীতে প্রবেশ করে, উপযুক্ত ঘটনা-সমাবেশে চরিত্র ও প্লট মূর্ত হয়ে ওঠে। আবার সংলাপ চরিত্রকে বাঙ্ময় করে তোলে। কখনো চরিত্রের নৈঃশব্দও সংলাপের ভূমিকা পালন করতে পারে। চরিত্রের উচ্চারিত সংলাপ, অঙ্গভঙ্গিমা, সংলাপহীনতা মিলে নাট্যসৃষ্টির মাঝে চরিত্রসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করে।

১.কাহিনী/ প্লট

প্লট হচ্ছে নাটকের মূল ভিত্তি যার উপরে অন্যান্য উপাদান প্রতিষ্ঠিত থাকে। নাটকের পরিকল্পনায় প্লটের গুরুত্ব অনেকখানি। এরিস্টটল এর কথায়, "একখানি ভাল নাটকের পক্ষে একটি সুবিন্যস্ত কাহিনীর বিশেষ প্রয়োজন।" নাটকের ঘটনা এমন করে সাজানো উচিত, যাতে নাটকের ভিন্ন ভিন্ন উপাদানগুলি এক হয়ে মিলে যায়। ভাল নাটক-মাত্রেই এইরকম একটি সুসঙ্গতি দেখতে পাওয়া যায়। এই সুসঙ্গতি লাভ করেই শ্রেষ্ঠ নাটকগুলো নতুন শক্তি লাভ করে। এই নতুন শক্তি বা গতি নানা টুকরো অভিব্যক্তির ভিতর দিয়ে এক অখণ্ড পরিণতিতে পৌঁছায়। এই ঐক্যবদ্ধ পরিণতিতেই নাটকের সার্থকতা। ভাল নাট্যকারেরা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়ে ভাবী পরিণতির বীজটিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর করে দেন। একটি বিস্তৃত কাহিনীর অনাবশ্যক ঘটনা ও চরিত্রগুলি বাদ দিয়ে কেবলমাত্র অত্যাবশ্যক ঘটনা ও চরিত্রগুলি নিয়ে নাট্যকারকে কাহিনী সাজাতে হয়। কাহিনী সাজাবার

সময় নাট্যকারকে রঙ্গমঞ্চের দিকেও সবিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয়। একটি কাহিনীর সকল অবান্তর অংশ বাদ দিয়ে সেই কাহিনীকে নানা ক্রিয়া ও দ্বন্দ্বে গতিশীল করে তোলা নাট্যকারের কাজ। নাট্য সমালোচক বিভাস রায় চৌধুরী এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

> "শেকস্‌পীয়রের সময়ের যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, যে উদ্দাম প্রবৃত্তির প্রবলতা, যে উচ্চ সুরে বাঁধা হৃদয়তন্ত্রী ছিল, আধুনিককালে তার তীব্রতা অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। আজকাল জীবনের দুঃখজ্বালা, জীবনসমস্যার সংঘাত অপেক্ষাকৃত মৃদু সুরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। পুরাতন ট্র্যাজেডির বীরত্বপূর্ণ, অলঙ্কারবহুল ভাষা আমাদের কাছে যেন অনেকটা অর্থহীন কোলাহলের মতই ধ্বনিত হয়–'With little meaning, though the words are strong.' বর্তমান জীবনের চরম মুহূর্তগুলি (crisis) শেকস্‌পীয়রের যুগের সাথে এক নয়। সুতরাং এই অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সমতা রাখিয়া নাটকেরও প্রকৃতি ও আদর্শ রূপান্তরিত হইতেছে।"[২]

২. চরিত্র

অনেক আলোচক নাটকের প্লট অপেক্ষা নাটকীয় চরিত্রকে অধিক মূল্যবান বলে মনে করেন। বিভিন্ন চরিত্রই নাটকীয় কাহিনীকে গতিশীল করে থাকে। সেজন্য নাটকে চরিত্রের একটি বিশেষ মূল্য আছে। নাটকের কাহিনী নাট্যকারেরা নাটকীয় চরিত্রের কথোপকথন এবং তাদের কাজ দিয়েই বিবৃত করে থাকেন। নাট্যকার ঔপন্যাসিকের মত স্বাধীনভাবে কোন কথাই বলতে পারেন না। নাটকীয় ক্রিয়া ও দ্বন্দ্বের অধীনে চরিত্রগুলি পরিচালিত হয়। Galsworthy এ প্রসঙ্গে যেমন বলেছেন:"A dramatist who hangs his plot on characters instead of hanging characters on plot commits a

cardinal mistake."[৩] শেক্সপীয়রের রচিত একাধিক ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইতিহাস হতে কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে; যদিও তার রচিত নাটকগুলি কেবল ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নয়। মানব-বিশ্বের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে তিনি আপনার আন্তররসে পরিপুষ্ট ও বিস্তারিত করেছেন। তাদের মুখে যে সংলাপ দিয়েছেন, তাদেরকে ঘটনাপুঞ্জের যে আবর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন, তাতেই তাদের স্বকীয়তা পরিস্ফুট হয়েছে। নাটকের চরিত্রে অবশ্যই দ্বন্দ্ব থাকবে। বহির্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্ব যুক্ত চরিত্রই নাটকের চরিত্র। সাধনকুমার ভট্টাচার্য তাঁর রচিত 'নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা' গ্রন্থে চরিত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এরিস্টটলের উক্তি উল্লেখ করেছেন: "By character, I mean that in virtue of which we ascribe certain qualities to the agents."[৪]–যে যে ধর্ম থাকায় ব্যক্তিতে দোষগুণ আরোপিত হয় চরিত্র বলতে সেই ধর্মকেই বোঝায়। এই ধর্মই এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র করে রাখে এবং এই ধর্ম থেকে সমস্ত আচরণ বা কর্ম জন্মায় ও তার দ্বারাই কর্ম বিশিষ্টতা পায়। এরিস্টটলের মতে ভালো চরিত্রের ভালোত্ব নিহিত থাকে যথাক্রমে ক. নৈতিক আদর্শ (it must be good), খ.ঔচিত্য (propriety), গ. বাস্তবতা(true to life),এবং ঘ. সঙ্গতির (consistency) মধ্যে। সাহিত্যে চরিত্রের দুরকম রূপ সম্ভব। প্রকাশধর্মী ও বিকাশধর্মী। প্রকাশধর্মী রূপটি সেখানেই যেখানে চরিত্রে ধরাবাঁধা প্রবণতাই অপরিবর্তিত রূপে বারবার আবৃত্ত হয়, যেখানে চরিত্রে রূপ থাকে, কিন্তু রূপান্তর থাকে না। এক কথায় বলা যায় চরিত্র যেখানে একহারা সেখানেই তা প্রকাশধর্মী। আর যেখানে প্রবণতাসম্পন্ন চরিত্র, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নানা ঘাত-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে এগুতে এগুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, চরিত্রের মধ্যে

গুণগত পরিবর্তন ঘটে, সেখানেই চরিত্র বিকাশধর্মী। এর মধ্যে আবার অন্তর্সংঘাতযুক্ত চরিত্রই নাটকের উৎকৃষ্ট নাট্যিক চরিত্র।

৩. ঘটনা-সমাবেশ

নাটকের গঠনে এর ঘটনা-সমাবেশের স্থানগুলি পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হলে চলে না। একটির সঙ্গে আর একটির নিবিড় সম্বন্ধ থাকে। একে বলে নাটকীয় সামঞ্জস্য। কোন নাটকে নাটকীয় সামঞ্জস্য না থাকলে, সে নাটক সার্থক হয়ে ওঠে না। এই সম্বন্ধে এরিস্টটল বলেছেন,"There will be nothing irrational in the whole range of action".[৫] পারম্পর্যহীন কোনো অস্বাভাবিক ঘটনার স্থান নাটকে নেই। নাটকের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির সঙ্গে পরবর্তী ঘটনাগুলির নিবিড় যোগসূত্র থাকবে। নাটকের পরিণতিতে চমকপ্রদ বা অস্বাভাবিক কোনো ঘটনার সমাবেশ থাকবে না।

৪. সংলাপ

পাত্র-পাত্রীদের কথোপকথনের সময় তাদের পরস্পরের মনে যদি বিকার (Intoxication) উৎপন্ন না হয়,তা হলে সে কথাবার্তা নাটকের যোগ্য হয় না। এই বিকারের ঢেউ সংলাপের সাহায্যে দর্শকদের মনে তরঙ্গের সৃষ্টি করে। এইরূপে অভিনেতা ও দর্শকের মনের যোগাযোগে নাটকের জন্ম হয়। নাটকীয় ভাষণের ভাল-মন্দের ওপর চরিত্রগুলির শক্তি নির্ভর করে। যে চরিত্র সমাজের যে স্তরের লোক, তার মুখে ঠিক সেরূপ কথাবার্তা দিতে হয়। নাট্যকারের নিজ মন্তব্য প্রকাশের বাহনই হচ্ছে নাটকীয় সংলাপ। নাটকে চরিত্রের শ্রবণের অযোগ্যরূপে যে নাটকীয় বাক্য প্রযুক্ত হয়, তাহাকে

'স্বগতোক্তি' (Soliloquy) বলে। উপস্থিত সকল পাত্রের শ্রবণযোগ্য বাক্যের নাম 'প্রকাশ' (Expression)|

বর্তমানে সংক্ষিপ্ত এবং বাস্তব কথাবার্তাকেই নাটকের বিচারকালে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়। কিছুদিন পূর্বে রচিত নাটকে আবেগ উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষা প্রয়োগের রীতি ছিল। স্বামী স্ত্রীর সম্বোধনের মধ্যে-'নাথ' 'প্রভু' 'আর্যপুত্র' 'জীবনস্বামী' প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতের রাজ-পরিবেশ নাটকীয় বিষয়বস্তু ছিল বলে, এরূপ সম্বোধন সম্ভব হত। এখন আর এরূপ সম্বোধন বা ভাষা কোন নাটকেই চলে না। নাটকের ভাষা সুন্দর হলে, নাটকীয় রসবস্তুও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বর্তমানে নাটকে স্বগতোক্তির স্থান নেই। একলা দাঁড়িয়ে দীর্ঘ ভাষণের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করলে চরিত্রের স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হয়। নাটকের কথোপকথনের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ না থাকলে, সেই কথাবার্তা নাটকের যোগ্য হয় না।

নাটকের সুন্দর ভাষা মানুষের হৃদয়ের ব্যথা, মান-অভিমান, আনন্দ প্রভৃতি বিচিত্র সংঘাতের বহির্মুখী প্রকাশ (Expression)। নাট্যকার এই ভাষার সাহায্যেই মানুষের জীবনের একটা বিশেষ মুহূর্তের কাহিনী রচনা করেন। আবার এই নাটকীয় ভাষা সুনিপুণ নাট্যকারের হাতে পড়লে ছন্দে-গানে, চিত্রে-বৈচিত্র্যে অভিনব হয়ে ওঠে। সেজন্য নাটকের হৃদয়-গ্রাহী ভাষাকে সৃষ্টি (Creation) বলা হয়।

৫. সংঘাত, গতি ও চমৎকারিত্ব

নাটকীয় রস-সৃষ্টির প্রধান লক্ষণ তিনটি–সংঘাত,গতি ও চমৎকারিত্ব। নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর মধ্যে যে মানসিক দ্বন্দ্ব থাকে, তাই নাটকে ঘটনার সংঘাতে আত্মপ্রকাশ করে। নাটকীয় ক্রিয়া ও অন্তর্দ্বন্দ্বের

ফলে এই যে সংঘাত (Conflict) সৃষ্টি হয়, এতে ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতের গতিবেগ (Action-এ) নাটকীয় অবশ্যম্ভাবী পরিণামের দিকে অগ্রসর হয়ে দর্শকের মনে এক অভূতপূর্ব চমৎকারিত্ব বা আনন্দ রসের (Dramatic surprise বা Excellence) সৃষ্টি করে থাকে। নাটকে সংঘাত না থাকলে গতি থাকে না, আবার গতি না থাকলে কোন চমৎকারিত্ব থাকে না; সুতরাং এই তিনের সমন্বয়েই নাটকের সার্থকতা।

সংঘাতের প্রকারভেদ দুটি–অন্তর্মুখী (Inner) এবং বহির্মুখী (Outer)। চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের, মনের সঙ্গে মনের এবং ব্যক্তির সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বা কোন অদৃশ্যশক্তির দ্বন্দ্বের যে ফল বাহ্যিক ক্রিয়ার দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাকেই বহির্মুখী সংঘর্ষ বলে। এলিজাবেথীয় যুগ হতে অন্তর্মুখী সংঘর্ষের সূত্রপাত। অন্তর্মুখী সংঘর্ষে অন্তরের আলোড়ন যতখানি থাকে, বাহ্যিক ক্রিয়ার সাহায্যে তার প্রকাশ ততখানি থাকে না।

৬. নাটকের স্তর-বিভাগ

নাটকে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত নাটকীয় কাহিনী-বিন্যাসের বিশিষ্ট পদ্ধতিটি পালন করতে হয়। দুটি বিপরীত শক্তির একটির উত্থান ও অপরটির পতন, নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও বাধার মধ্য দিয়ে সূচিত হয়। শেষে যখন একটি শক্তি প্রবল হয়,তখন নাটকীয় কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। সকল নাটকেরই একটি সংঘর্ষ হতে সূত্রপাত হয়, এবং সেই সংঘর্ষ একটি পরিণতিতে পৌঁছলে নাটকমাত্রেই সম্পূর্ণতা লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি অলঙ্কারশাস্ত্রের মতে এই ক্রম-পরিণতির যে পাঁচটি স্তর আছে তা এরূপ-(১) Introduction, initial incident or incidents–অর্থাৎ সংঘর্ষের সূত্রপাত; (২) Rising action or growth of action or complication–অর্থাৎ সংঘর্ষ তীব্র, ফলাফল অনিশ্চিত; (৩) Climax, crisis or turning point–অর্থাৎ একটি শক্তি প্রবল; (৪)Falling action or resolution or denouement–অর্থাৎ প্রবল শক্তির জয় ঘোষণা; (৫)Catastrophe or conclusion–অর্থাৎ সংঘর্ষের অবসান।

৭. অঙ্ক ও দৃশ্য-বিভাগ

নাটককে নানা অঙ্কে ও দৃশ্যে খণ্ডিত করে সাজানোর নিয়ম আছে। প্রত্যেক অঙ্ক সম্পূর্ণ নাট্যাংশের এক একটি বিচ্ছিন্ন অংশ, কিন্তু প্রত্যেক অঙ্ক স্বাধীন এবং সম্পূর্ণ। যে-বিষয়টি অঙ্কের গোড়াতে উপস্থাপিত হয়, তার সমাপ্তি অঙ্কের শেষে লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি গর্ভাঙ্কে বা দৃশ্যে আবার অঙ্কের এই পরিণতি সম্পূর্ণ হয়। প্রত্যেক অঙ্ক আবার মূল নাটকীয় গতি ও পরিণতি হতে বিচ্ছিন্ন নয়। নাট্যকার এই খণ্ডিত অঙ্কগুলির মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন করে দেন।

৮. গান

সমালোচক মর্গান গাথাগীতকে সাহিত্যের প্রোটোপ্লাজম্ বলেছেন,[৬]–দেখাতে চেয়েছেন–মূল প্রকৃতি ধীরে ধীরে ক্রমপরিণতির ফলে নানা রকম সাহিত্য-প্রজাতিতে বিভক্ত হয়ে গেছে। নাটকের উৎপত্তি বা উৎস সন্ধানে বেরিয়ে এই সত্যকেই সামনে দেখা যায়। সমবেত গীত (Chorus) বিবর্তিত হতে হতে

ক্রমে কথোপকথনের জন্য সংগ্রথিত হয়ে নাট্যরূপ লাভ করছে। এদিক দিয়ে সংগীত নাটকের প্রধান উপাদান–অন্তত প্রাচীন গ্রীক নাটকের রূপ দেখে একথা অবশ্যই বলা যায়। কিন্তু নাটক যত ব্যক্তিরূপ পরিগ্রহ করছে সংগীত ততই গৌণ হয়ে পড়ছে। সংলাপের প্রাধান্য যত বেড়েছে ততই কমেছে সংগীতের উপযোগিতা এবং শেষ পর্যন্ত এই রকম দাঁড়িয়েছে যে খাঁটি নাটকের রস-সৃষ্টিতে সংগীতের স্থান শুধু গৌণই নয়, একেবারে অবাঞ্ছনীয় হয়ে পড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ॥ ১ম পরিচ্ছেদ

পৌরাণিক নাটক

পৌরাণিক শৈলীতে রচিত পাঁচ অঙ্কের পূর্ণাঙ্গ নাটক **'চাঁদ সদাগর' (১৯২৭)**। নাটকের প্লট বা কাহিনী হিসাবে লৌকিক পুরাণ মনসামঙ্গলের পরিচিত কাহিনীকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। নাট্যকার পৌরাণিক কাহিনী কাঠামোর মধ্যে আধুনিক মনন ও সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। চাঁদ সদাগর ও মনসার বিরোধকে বৃহত্তর শক্তির দ্বন্দ্বের প্রতীক হিসাবে দেখানো হয়েছে। মর্ত্যে মনসার পূজা প্রচারকে কেন্দ্র করে চাঁদ সদাগর ও মনসার বিরোধ সংঘটিত হয়। চাঁদ সদাগর শিবের উপাসক। চাঁদ সদাগরের পূজা ছাড়া মর্ত্যে মনসা দেবীর পূজা প্রচার সম্ভব নয়। আর তাই চাঁদ সদাগরের পূজা পাওয়ার জন্য মনসার এতটাই আকুলতা। এর ফলে চাঁদের জীবনে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় নেমে আসে। মনসা দেবী চাঁদ সদাগরের মনোবল ভেঙে দেয়ার জন্য একের পর এক বিপর্যয় ঘটাতে লাগল। বাণিজ্য তরীসহ চাঁদ সদাগরের বহরকে অতল জলে ডুবিয়ে দিল। মনসার উক্তিতে রয়েছে, "চাঁদ যে অতল জলধিতলে ডুবে গেল। জগতে আমার পূজা-প্রচলনের আশাও ওরি সাথে ডুবে গেল। (কপালে করাঘাত) এই চাঁদ সওদাগর স্বহস্তে আমার পূজা না করলে মর্ত্যে আমার পূজা অচল।"[৭]

প্লটের মধ্যে এই সংঘাত ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে লক্ষীন্দরের মৃত্যুতে; চাঁদ সদাগরের শত চেষ্টাতেও অকাল মৃত্যু রোধ করতে পারে না। নদীবহুল দেশে এমন সর্পাঘাতে মৃত্যুর ঘটনা অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু মনসা সর্পকুলের দেবী হওয়াতে এবং পূর্বশত্রুতার জের ধরে এই সংঘাত চলে আসায় এই মৃত্যু হয়ে দাঁড়ার দেবীর ক্ষমতার আস্ফালনস্বরূপ। পার্থিব জীবনে চাঁদ সদাগর কোনো অলৌকিক শক্তির আধিপত্য মানতে নারাজ। তিনি নিজের শ্রমে, যুক্তি, বুদ্ধি ও বলে লড়াই করে বেঁচে থাকতে চান। আর তাই পৌরুষ দীপ্ত চাঁদের নিকট চাঁদের স্ত্রী সনকার আকুতিও ব্যর্থ হয়; কিন্তু দীর্ঘ ত্যাগ-তিতীক্ষার পরে বেহুলার পক্ষ থেকে করা আবেদন চাঁদ প্রত্যাখ্যান না করে বরং মানবিকতাকে স্বীকৃতি দেয়। সে হার মেনে নেয় মর্ত্যের এক মানবীর নিকট। প্রাথমিক ভাবে মনসার বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম পুরুষতান্ত্রিক মনে হলেও বেহুলার দেবলোক জয়ের স্বীকৃতি হিসেবে তার শর্ত মানতে সম্মত হয়। এই ক্ষেত্রে চাঁদের অহং কোনো রকমে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি।

মনসার এই কথা শুনে মনসার ভগিনী নেতা চাঁদকে মায়াবলে বাঁচিয়ে তুলতে পরামর্শ দিল। চাঁদ সদাগর যথারীতি মনসার মায়াবলে বেঁচে উঠল। মনসার কাতর উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে যেমন, "চাঁদ আজো তোমার জয়। আমি তোমার নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়েছি,বিস্মিত হয়েছি। আর তা হয়েছি বলেই তোমার হাতে পূজা পাবার লোভে আমি আজ মাতাল হয়ে চললুম।"[৮]

নাটকের শেষাংশে দেখা যায়, বেহুলা স্বর্গে দেবতাদের তুষ্ট করে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনল। অবশেষে পুত্রবধূর কাতর অনুনয়ে চাঁদ সদাগর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাম হস্তে মনসাকে পূজা দিল। শ্বশুর চাঁদ সদাগরের প্রতি বেহুলার কাতর অনুনয়:

> বাবা। ভালো কি আমাদের এইটুকুও বাসো না ? মা-মনসার বরে বড় আশা করে তোমার দুয়ারে ফিরে এসেছি... শুধু তো আমরাই আসি নি...বরং মাও এসেছেন, সকলে তোমার মুখ

চেয়ে আছি... কারো কথা না রাখো...তোমার ইষ্ট দেবতার আজ্ঞা পালন কর...এই নাও বাবা-মার পূজার ফুল।" (চাঁদের হাতে পদ্মফুল গুজে দেয়)

চাঁদ–"ওগো শিবাত্মজা! বাম হাতের অপরাধ নিয়ো না।[৯]

এভাবেই নাটকের সমাপ্তি ঘটে। চাঁদ সদাগর ও মনসার দ্বন্দ্বমুখর কাহিনী নাটকের প্লট হিসাবে সার্থক। এই নাটকের সংলাপ সাধারণবোধ্য ও তীক্ষ্ণ, নাটকে **১১**টি গানের ব্যবহার হয়েছে। নাটকে মোট ২২টি চরিত্র ; পুরুষ–১৫টি, নারী–৭টি।

বৈদিক কাহিনী থেকে **'দেবাসুর'(১৯২৮)** নাটকের প্লট নির্বাচন করা হয়েছে। রমেশচন্দ্র দত্তের অনূদিত বেদের অনুবাদ অনুসরণেই 'দেবাসুর' নাটকটি রচিত হয়। এই পঞ্চাঙ্ক নাটকটির প্রতিটি অঙ্কে মাত্র একটিই দৃশ্য। মূলত দেবতা ও অসুরের দ্বন্দ্বের একটি দিক এই নাটকে কাহিনী হিসাবে রূপায়িত হয়েছে। নাটকে মহামুনি দধীচি জাতির মুক্তিযজ্ঞে আত্মদানকে কেন্দ্র করে কাহিনী গড়ে উঠেছে। এ নাটকে নাট্যকার বৃত্রাসুরের ক্ষত–বিক্ষত হৃদয়ের দানবিক ও মানবিক শক্তির অসাধারণ সমন্বয় সাধন করেছেন। নাটকে আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্বের চেয়ে ভুবনজয়ী বিশ্বত্রাস দেববিদ্বেষী বৃত্রাসুরের পৌলমীর প্রতি আকর্ষণজনিত কামনা বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। সে যখন উন্মাদের মতো বলে,

"তোমার প্রতি অক্ষয়, অনন্ত প্রেম...আমি তোমায় চেয়েছিলাম...আজো চাই, চিরকাল চাইব...মরণের শেষ মুহূর্তেও চাইব...কেন চাইব না? আমার শৌর্য আছে, শক্তি আছে, প্রতিভা আছে...।[১০] তখন মহাপরাক্রমশালী এক শক্তিধরকে শিশুর মতো অসহায় মনে হয়। নাটকে শচী ও সূর্যা এই দুটি চরিত্র নিয়ে নাট্যকাহিনীর সংকট ঘনীভূত হয়েছে।

এছাড়া বলাসুর, শচী, দধীচি চরিত্রসমূহ দর্শক ও পাঠককে মুগ্ধ করেছে। শচী ও সূর্যা এই দুটি চরিত্র নিয়ে নাট্যকাহিনীর সংকট ঘনীভূত হয়েছে। সূর্যার জন্য বৃত্রাসুরের ভাই বলাসুর আত্মহত্যা করেছে। কালো হয়ে আলোর রাজ্যের মেয়ের জন্য তার আকুল আকুতির মধ্যে একটা করুণ ট্র্যাজেডিও যেন লক্ষ্য করা গেছে।

এক পর্যায়ে দেবতা ও অসুরের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধে দেবতারা ক্রমশ পরাজিত হচ্ছে দেখে ঋষি দধীচি বৃত্রাসুরের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করলেন। বৃত্রাসুর দধীচির প্রস্তাবে সম্মত হয়। বৃত্রাসুরের প্রতিজ্ঞা অনুসারে মুনি দধীচি যতটুকু সময় ডুব দিয়ে থাকবেন, সেই সময়টুকুর মধ্যে যে সকল দেবতা নদীর উপরে অবস্থিত সেতুপথ পার হয়ে যেতে পারবেন তারাই শুধু মুক্তি পাবেন। আর যেসকল দেবতা সেতু পার হতে অসমর্থ হবে বৃত্রাসুর তাদের ধ্বংস করবেন। এরপরে ঋষি দধীচি দেবতাদের কল্যাণে নদীতে আত্মাহুতি দেন। তার আত্মাহুতি দেয়ার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে স্বজাতির প্রতি ভালোবাসা ও প্রগাঢ় দায়িত্ববোধ–

> আমি ডুব দিলাম শচী, তুমি নাম উচ্চারণ কর, যদি পার অন্তত একজন দেবতারও জীবন রক্ষা কর। আজ না হয়, যুগ পরে সেই এক দেবতার ভবিষ্যত বংশধরগণ অসুরের অত্যাচার হতে দেবভূমিকে রক্ষা করে দেবভূমির শৃঙ্খলপাশ ছিন্ন কব্বে...সেই আশাতেই,...সেই আশাতেই আমি ডুব দিলুম!...আমার জাতি অক্ষয় হোক্, আমার জাতি অমর হোক্, আমার জাতি জয়লাভ করুক![১১]

দধীচির এই উক্তির মাধ্যমে প্রকারান্তরে নাট্যকার পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের স্পৃহাকে ব্যক্ত করেছেন। নদীতে আত্মাহুতি দেয়ার আগে দধীচি সকল দেবতা ও সূর্যাকে আশীর্বাদ করে গেলেন,

> জয় চাই-জয় চাই...চাই শুধু জয়...দস্যুর হাত থেকে ঐ সূর্যাকে যেমন করে আজ উদ্ধার করে নিয়ে এলে, জীবন তুচ্ছ করে মৃত্যুপণ রেখে, তেমনি...তেমনি করে উদ্ধার কর দস্যু অধিকৃত তোমার আমার সকল দেবতার এই দেবভূমি!...(সূর্যার প্রতি) আর তুমি মা গৃহে গিয়ে গৃহের কর্ত্রী হও... তোমার গৃহের সকলের উপর প্রভু হয়ে প্রভুত্ব কর আর আমার আশীর্বাদ....বীর প্রসবিনী হও! আজ দেশের এই দুর্দিনে মা চাই–যে মা সন্তানকে শুধু আদর দিয়ে স্নেহ-কাতর করে না...ভালোবেসে শুধু ভালোবাসা শেখায় না, চাই সেই মা...যে মা সন্তানকে বলে 'এই যে দেশ,...এ তোমার মাতারও মাতা.. পিতারও পিতা...দেবতারও দেবতা!...সেই পরম দেবতার পূজো কর...সেই পরম দেবতার জন্য প্রাণ দিতে হয়–প্রাণবলি দাও...বংশের মুখোজ্জ্বল হবে, জীবন সফল হবে...মৃত্যু সার্থক হবে !–এই শিক্ষা...এই শিক্ষা...এই শিক্ষা !...অসুর তোমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বে, কারাবন্ধন খসে যাবে...মুক্ত দেবতার জয়ধ্বনিতে সুরলোক আবার স্বর্গ হবে !...এই আশীর্বাদ ! আমার এই আশীর্বাদ ![১২]

নাটকের কাহিনী/প্লট সংগঠনে নাট্যকার স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ নাটকে মোট ১৩টি চরিত্র; তন্মধ্যে ১০টি পুরুষ, ৩টি নারী চরিত্র রয়েছে। এই নাটকে বলাসুর, শচী, দধীচি চরিত্রসমূহ দর্শক ও পাঠককে মুগ্ধ করেছে। শচী ও সূর্যা এই দুটি চরিত্র নিয়ে নাট্যকাহিনী এগিয়ে গেছে। সূর্যার

জন্য বৃত্রাসুরের ভাই বলাসুর আত্মহত্যা করেছে। কালো হয়ে আলোর রাজ্যের মেয়ের জন্য তার আকুল আকুতির মধ্যে একটা করুণ ট্র্যাজেডিও যেন লক্ষ্য করা গেছে। সংলাপ এ নাটকের প্রাণস্বরূপ। বিখ্যাত অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী নাটকটির মূল চরিত্রে (বৃত্রাসুর) অভিনয় করেন। এই নাটকে ৬টি গান ব্যবহৃত হয়েছে। কবি নরেন্দ্র দেব গানগুলো রচনা করেছেন। মূলত পরাধীন দেশের মানুষ এ নাটকে খুঁজে পায় এক গভীর বিশ্বাসের প্রার্থিত ভূমি–তা হল অত্যাচারের অবসান হবেই; নিশ্চিন্তভাবেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটবে ; যে কোন ত্যাগস্বীকারে দেশবাসীকে প্রস্তুত হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে। ইংরেজরূপী অসুররা পরাজিত হবে। এ নাটকের আসল জোর এখানেই–এই দৃপ্ত রাজনৈতিক বিশ্বাস এ নাটকের ভাববস্তুতে নিহিত আছে।

ময়মনসিংহ গীতিকার কাহিনী অবলম্বনে রচিত রোমান্টিক ধাঁচের নাটক**‘মহুয়া’(১৯২৯)**। পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট প্রতিটি অঙ্কে একটি করে দৃশ্য রয়েছে। নাটকের কাহিনী সরল। ‘মহুয়া’ নাটকে জাতিধর্ম সংস্কারের ঊর্ধ্বে মানুষী প্রেমের জয়গান গাওয়া হয়েছে। নাম গোত্রহীন, অন্ত্যজ অবহেলিত বেদে সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনাকে নাট্যকার দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন। নাটকে মোট ১০টি চরিত্র; পুরুষ চরিত্র ৭টি, নারী চরিত্র ৩টি। নাটকে সংলাপ ব্যবহারে নাট্যকার যথারীতি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নদের চাঁদের প্রেমে মুগ্ধ মহুয়া নদের চাঁদকে ভেবেই ব্যাকুল–দ্বিতীয় অঙ্কে মহুয়ার উক্তিতে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়:

সারাদিন তুমি আমায় ভাবিয়ে মারো। সারাদিন মনে পড়ে তোমার মুখ–তোমার চোখ–তোমার কথা। এই তো গেল সারাদিন। রাতেও কি কিছু কম? সারারাত তুমি আমায় ঘুমুতে দাও না।

গাছের পাতা মর্মর করে, মনে হয় তুমি বুঝি এসেছ, ঝিঁ ঝিঁর রব শুনি–মনে হয় ওরা বুঝি তোমার সাড়া পেল। তোমার কথা ভেবে ভেবে আমি শ্যামসুন্দরের কথাও ভুলে যাই।[১৩]

মহুয়ার ব্যাকুল হৃদয়ের আকুল করা কথা শুনে নদের চাঁদ বলেন:

তোমার হাতে বাঁশী, পায়ে নূপুর, চোখে মায়া, বুকে মধু, মুখে মমতা ? ও তো আমার নয়, ও যে তোমার ! নাচলে, মন নেচে উঠল। ঐ কাজল-কালো আঁখিতে আমার পানে চাইলে, আমার চোখ নেচে উঠল। আর সবার শেষে, যখন পালালে, মনে হল আমার মৃত্যু হল আমার মৃত্যুকাল এল। তখন শুনলাম তোমার বাঁশী। তারপর কি হল জান ? মনে হল, কিসের গয়া, কিসের কাশী, কিসের বৃন্দাবন, মনে হল ত্রিভুবনে খুঁজব সেই বেদের মেয়ে। লোকে বলে তোমার জাত গেল।–যাক জাত। বলে, কুল গেল।–যাক কুল। মান লজ্জা সেও যাক।...সব যাক, আমার সব যাক।[১৪]

হুমড়া বেদে বামনকান্দার রাজা কীর্তিধ্বজ চক্কোর্ত্তিকে হত্যা করে তার কন্যাকে চুরি করে বেদে কন্যা রূপে বড় করে। মহুয়া নদের চাঁদের সাথে পালিয়ে গেলে ক্ষিপ্ত হুমড়া বেদের কথা থেকে প্রকৃত সত্য জানা যায়। নদের চাঁদ ও মহুয়াকে উদ্দেশ্য করে হুমড়া বেদে বললেন:

আমি বুঝছি সে দুর্নিবার। তার বাপের বুকে অকাতরে ছুরি বসিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু, না-না-এ অসি ধরে না, এ শুধু বাঁশী বাজিয়ে এসে তার অপরূপ রূপে আমার রূপালী কন্যাকে আমারি বুক থেকে ভুলিয়ে নিয়ে যায়। যদি সে লড়াই করতো আমিই তার শির নিতুম, কিন্তু সে যে যুদ্ধ করে না–সে শুধু ভালবাসে–সে শুধু কাঁদে! হাঁ তবে শেষ চেষ্টা বেদের প্রতিজ্ঞা।–সেই প্রতিজ্ঞা,

যে প্রতিজ্ঞা সকলের সকল দুর্বলতাকে ভুলিয়ে দেয়। কর প্রতিজ্ঞা, ধর ছুরি (উপস্থিত অন্যান্য বেদেরা এক সঙ্গে ছুরি বাহির করিয়া ঊর্ধ্বে তুলিল) ধরবো–আমরা ওদের দুজনকেই ধরবো, ধরে ওদের দুজনের বুকেই–![১৫]

পঞ্চম অঙ্কে বেদের দল নদের চাঁদ ও মহুয়াকে বন্দী করে। হুমড়া বেদে মহুয়ার হাতে বিষলক্ষের ছুরি দিয়ে বললেন:

এই ধর বিষলক্ষের ছুরি। জাতির পরম শত্রু, জাতির সেরা দুশমন ঐ–(নদের চাঁদকে দেখাইল) ওর বুকে তোকে এই ছুরি, এখনি, আমুল বসিয়ে দিতে হবে। দিবি ? যদি দিস, তবে বুঝব, হ্যাঁ তুই বেদেনী, বেদেনীর মতো বেদেনী–ঐ সুজনও বাঁচবে। আর যদি না দিস তোরই চোখের সম্মুখে শত বেদের শত তীর ঐ ঠাকুরের বক্ষ বিদ্ধ করবে; বেদের প্রতিজ্ঞাই তাই।[১৬]

মহুয়া তার পালিত পিতা হুমড়া বেদের আদেশ পালন করল। তবে বিষলক্ষের ছুরি নদের চাঁদের বুকে নয়, নিজের বুকেই বিদ্ধ করল। আর নদের চাঁদ বেদে বেদেনীর ছুঁড়ে দেয়া অসংখ্য তীর দ্বারা বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করল। করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে 'মহুয়া' নাটকের সমাপ্তি ঘটল। নাটকে ১৬টি গানের ব্যবহার হয়েছে। গানগুলো কাজী নজরুল ইসলাম লিখে দিয়েছেন।

'শ্রীমদ্ভাগবত'[১৭] থেকে **'কারাগার'(১৯৩০)** নাটকের কাহিনী নেয়া হয়েছে। ভোজবংশের রাজা উগ্রসেনের পুত্র কংস রাজা হয়ে নিষ্ঠুর অত্যাচারে যাদবকুলকে অতিষ্ঠ করে তোলে। লাঞ্ছিত যাদবদের আকুল প্রার্থনায় পরিত্রাতা ভগবান দুর্বৃত্তের কারাগারে জন্মগ্রহণ করলেন। অধর্ম প্লাবিত পৃথিবীতে ধর্ম স্থাপনের জন্যে দানব কংসকে ধ্বংস করে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য ভগবানের

আবির্ভাব ঘটে। আখ্যানভাগ এটুকুই। তবে নাট্যকার 'কারাগার' নাটকের পৌরাণিক কাহিনী কাঠামোর মধ্যে সমকালীন সময়ের ছবি তুলে ধরেছেন। 'কারাগার' কাহিনীর যে প্রধান দুই প্রতিপক্ষ অত্যাচারী রাজা কংস ও বসুদেবের নেতৃত্বে পরিচালিত যদুবংশের মানুষগুলোর মধ্যে সমকালীন ভারতবর্ষের অত্যাচারী শাসক ইংরেজ ও ভয়কাতর পরাধীন ভারতের প্রজাদের ছবি ফুটে ওঠে, পুরাণের কংস কারাগার এই নাটকে ব্রিটিশ শাসিত ভারত কারাগারে রূপান্তরিত হয়। 'কারাগার' নাটকটি পৌরাণিক নাটক হলেও বিস্তারিত অর্থে একে রূপক নাটকও বলা চলে। আর তাই রূপকের সেই বাতাবরণ ভেঙে আত্মপ্রকাশ করেছিল কংসের কারাগার নয়–অত্যাচারী, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের কারাগার।

নাটকে পঞ্চাঙ্ক বিভাগ আছে, অঙ্কগত দৃশ্য বিভাগ আছে, আছে সঙ্গীত ও নৃত্যের বহুল প্রয়োগ। এমনকি অলৌকিক দৃশ্যের ব্যবহারও আছে। ধরিত্রীর গানগুলি ঠিক মূল নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নয়, তবুও এ কথা সত্য ঐ গানগুলির মধ্যে কংসপীড়িত ধরিত্রীর কাতর কান্না আর আকুল কামনাই ফুটে উঠেছে। এ নাটকে নিছক প্রমোদ রসের গানও আছে; রসবৈচিত্র্যের জন্য আছে ছড়ার গান, স্বপ্নদৃশ্যের ব্যবহারও আছে। এসব কিছু থাকা সত্ত্বেও 'কারাগার' তীব্র গতিবেগের নাটক। নাট্য সমালোচক ড. অজিতকুমার ঘোষের মতে,"পরস্পর বিরোধী শক্তির প্রবল দ্বন্দ্ব, চরিত্রের অভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব, পরিস্থিতিগত আকস্মিক বৈপরীত্য ঘনীভূত নাট্যোৎকণ্ঠা, সংলাপের আবেগকম্প ধাবমান গতি প্রভৃতির ফলে নাটকের মধ্যে তীব্র নাট্যাবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে।"[১৮]এই নাটকের পৌরাণিক পরিবেশটি আমাদের বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে এত সাদৃশ্যযুক্ত, চরিত্রগুলির আবেগ এত জোরালো ও

জীবন্ত, সংলাপ এত আবেগদীপ্ত এবং জাতীয় ভাবোচ্ছ্বসিত যে সমসাময়িক স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে একে সহজেই সমন্বিত করে নেয়া গেছে।

বাহ্যত পৌরাণিক এই নাটকটির রূপকের মোড়ক খুললে যা পাওয়া যায় সেটিই সে যুগের দর্শকদের ভালোলাগার কারণ হয়েছিল। কংসের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নিরুপায় যাদবরা বসুদেবের কাছে সাহায্যের জন্য আসে। বসুদেব তাদেরকে তিরস্কারের স্বরে বললেন:

> এখন এ ক্রন্দন বৃথা! যেদিন উগ্রসেন পিতার হাত হতে রাজদণ্ড কেড়ে নিতে এসেছিল সেদিন তোমরা কোন প্রতিবাদ করনি, বরং ঘরভেদী বিভীষণের মতো তোমরাই হয়েছিল তার সহায়, তার সৈন্য! ভেবেছিলে প্রতিদানে পাবে প্রচুর পুরস্কার...কিন্তু কি পেয়েছ আজ বুঝছ– ।...নিজ হাতে যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছ, তার ফলভোগ তুমি না কর...তোমার পুত্র, তোমার পৌত্র, প্রপৌত্র...বংশানুক্রমে করবে... । যদি বল উপায় কি? উপায়–প্রায়শ্চিত...এক জীবনেও তা শেষ হবে না...এ প্রায়শ্চিত করতে হবে জন্মে জন্মে।[১৯]

কংস যেন দুর্ধর্ষ অত্যাচারী ইংরেজ শক্তির প্রতিভূ। কিন্তু নাট্যকার কংস চরিত্রটিকে কোথাও সাধারণ 'ভিলেন'–এর শ্রেণিতে ফেলেননি। তার মানবতা ও দানবতার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে তার অপরিসীম শক্তির সত্তাই ফুটে উঠেছে। গ্রামের সরলা বালিকা চন্দনাকে বলপূর্বক হরণ করে নিয়ে আসে। কংস নিজের নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন,

> শুনেছ আমি শয়তান আমি দানব, আমি রাক্ষস...আরো কত কি! এও হয়ত শুনেছ...আমি বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে সিংহাসনে আরোহণ করেছি, আমি মাতার বুক থেকে সন্তান ছিনিয়ে নিয়ে

পাথরের ওপর আছড়ে মেরেছি, আমি মানুষের তাজা রক্ত পান করি, আমি মদ খাই... আমি কী না করতে পারি।[২০]

কংস তার অনুসারী বিদূরথের স্ত্রীর শিশু পুত্রকে পাষাণ ঘরে বন্দী করে রেখে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়,

আমি নির্মম...আমি নিষ্ঠুর...আমি শুধু দুর্দান্ত দানব নই, আমি দুর্নিবার শয়তান...ঐ যে সম্মুখে পাষাণ ঘর–ওরই মধ্যে বন্দী করেছি এক সুকুমার কিশোর এবং সঙ্গে তার অভাগিনী মাতা...ঐ অন্ধকূপের অন্ধকার হতে ঐ পাষাণ বিগলিত করে ভেসে এসেছে তাদের মাতার আর্তনাদ "আলো দাও" "জল দাও" "আহার দাও"–। অট্টহাস্যে সেই আর্তনাদ ডুবিয়ে দিয়েছি শিরার শিরায় দানবের রক্ত নেচে উঠেছে...মনে প্রাণে শয়তান ক্ষেপে উঠেছে।[২১]

দুর্বল মানুষের অক্ষম আকুতির মধ্যে সার্থক হয়েছে কংসের গর্বোক্তি–"নিদ্রিত নারায়ণকে জাগিয়েছে কে? ...অশ্রু সম্বল নিপীড়কের দল? না, না, আমি, বিশ্বত্রাস কংস...আমারই রুদ্র স্পর্শে ভগবান জেগেছেন।"

কিন্তু কংস যখন বসুদেবের কাছে আত্মসমর্পণ করে বলে তার কৃতকর্মের জন্য প্রতিটি মুহূর্ত তার কাছে নরক যন্ত্রণার বলে মনে হয়। তখন দর্শক মনে কংসের প্রতি শুধু ঘৃণাই জমা হয় তা নয় বরং নিয়তি তাড়িত এক অসহায় মানুষের আর্ত হাহাকার বলে মনে হয়:

অভিনয় নয়–অভিনয় নয়। বিশ্বাস কর বসুদেব...আমি ঘুমুতেও পারি না। চোখ বুঁজলেই দেখি তোমার সাত-সাত পুত্রের ছিন্নশিরের উচ্ছ্বসিত রক্তধারা আমার চোখে-মুখে সর্বাঙ্গে ছিটকে এসে

পড়েছে–! তাও যদি সইতে পারি...কিন্তু কিছুতেই সইতে পারি না...যখন চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে–আমার ঐ আদরিণী ভগিনী...শোক কাতরা বিষাদ–বিধুরা প্রতিমূর্তি। তাও যদি বা সইতে পারি, কিছুতেই সইতে পারি না...যখন দেখি ভগিনী আমার শুধু নীরবে চোখের জলই ফেলে...প্রতিশোধ নিতে চায় না, অভিশাপ দেয় না– ।[২২]

চন্দনা চরিত্রটিও অপূর্ব। দেশের ও দশের জন্য সে সম্ভ্রম বিসর্জন দিল। ভগবানে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের কি অসাধারণ ঘাত-প্রতিঘাত মূর্ত হয়ে উঠেছে তার চরিত্র: ''কে ও? কী ও? শুধু মাটি, শুধু পাথর? কিন্তু, কিন্তু তবু কি সুন্দর।"[২৩]

যদুবংশীয় মানুষেরা যেন পরাধীন ভারতেরই প্রজা। কংসের নির্মম অত্যাচারে তারা ভয়কাতর। এই মনুষ্যত্বহীন ভয়কাতরতার প্রতি প্রবল ধিক্কারই এ নাটকের প্রধান বিশেষত্ব। নাট্যকার এই বিদ্রোহ ও বিক্ষোভকে মাথা তুলে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। দেশাত্মবোধের আবেগকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। নাটকে মোট ১৫টি চরিত্র; পুরুষ চরিত্র ৮টি, নারী চরিত্র ৭টি।

বিধিলিপি অগ্রাহ্য করে যমের কাছ থেকে মৃত স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার সেই পরিচিত কাহিনী নিয়ে **'সাবিত্রী'(১৯৩১)** নাটক রচিত হয়েছে। সাবিত্রীর চরিত্রে যমের সঙ্গে সংগ্রামের যে ছবি আমরা পাই তা অতি আধুনিক সমাজের নারী চরিত্রের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধেরই পরিচায়ক। এই সংগ্রামের দুঃসাহসিক ক্ষমতায় দৃপ্ত ব্যক্তিত্বের প্রকাশে সাবিত্রী যেন একালের জীবন সংগ্রামী মানুষের

কাহিনী হয়ে উঠেছে। তাই পৌরাণিক হয়েও এ কাহিনী যুগোপযোগী। সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতির সন্তান বাৎসল্য, পিতৃহৃদয়ের উদ্বেগ, ব্যাকুলতা, পিতা অশ্বপতির উক্তি থেকে জানা যায়,

> ভুল নয়, ভুল নয়। এ যদি আমার ভুল হয়ে থাকে তবে– আমি তার পিতা? তাও ভুল, জান রাণী একটি করে দিন গেছে–একটি করে রেখা কেটে দিয়েছি' আমার বুকের একটি করে শির ছিঁড়ে গিয়েছে। কি করে ভুল হয়, ভুল হতেই পারে না আর ভুল যদি হয়েই থাকে তবে তা হয়েছে কমের দিকে–বেশীর দিকে নয়–বেশীর দিকে নয়–। আর আছে মাত্র পাঁচ দিন,–পাঁচ দিনও নয় রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। এই রাত্রি শেষে আর থাকবে মাত্র চারদিন। আর চারটি দিন মাত্র তার সীমন্তে সিন্দুর রেখা শোভা পাবে–হস্তে স্বর্ণবলয়।[২৪]

পিতা অশ্বপতি সাবিত্রীকে তার সাথে ফিরে যেতে বললে সাবিত্রী প্রতি উত্তরে যা বললেন তাতে স্বামী সত্যবাণের প্রতি সাবিত্রীর একনিষ্ঠ প্রেম প্রকাশ পায়,

> কেন? কেন? তুমি রাজা...এই দারিদ্র্য–এই ভিক্ষা বৃত্তি তুমি ঘৃণা কর। কিন্তু আমি দরিদ্রের গৃহিণী–ভিক্ষুকের পত্নী আমার স্বামীর এই কুটিরই আমার স্বর্গ, তাঁর দারিদ্র্যই আমার শ্রেয়, তার ভিক্ষান্নই আমার প্রিয়। জানি উনি কোন মৃত্যুঞ্জয় দেবতা নন। জানি আমার স্বামী স্বল্পায়ু মরণশীল মানব তথাপি, তিনি আমার স্বামী আমার ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ–ইহকাল পরকাল ভূলোক, দ্যুলোক, মর্ত্যে, স্বর্গে চিরকাল–চিরকাল।[২৫]

পূজার জন্য কাঠের প্রয়োজনে কাষ্ঠাহরণ করতে এসে সত্যবান বিধাতার বিধানে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। যম সত্যবানের আত্মা নিয়ে যাচ্ছেন। সাবিত্রী যমের পিছনে পিছনে চলছেন। যম যতই

তাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করছে সাবিত্রী ততই অপ্রতিরোধ্য হয়ে যমের পিছনে চলতে লাগলেন। সাবিত্রীর প্রদত্ত উক্তিতে সাবিত্রীর একাগ্র মানসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়:

> আমার স্বামী যে স্থানে নীত হয় অথবা স্বয়ং গমন করেন আমারও সেই স্থানে গমন করা কর্তব্য এ নিত্য ধর্ম। হে মহাত্মন ! তপস্যার গুণে, ভক্তিতে, ভর্তৃস্নেহে, ব্রতে ও তোমার প্রসাদে আমার গতি আজ অপ্রতিহত।...আর আমি যখন স্বামীর সমীপে আছি...তখন এতো আমার শ্রান্তি নয়, এ যে আমার পরম শান্তি, স্বামীই আমার একমাত্র গতি। স্বামীকে নিয়ে তুমি যেখানে যাবে...আমিও সেখানে যাব। আমি পদে পদে তোমার অনুগমন করব। আমি জানি সাধুদের সঙ্গে এক পা পথ চললেই মিত্রতা জন্মে।[২৬]

এ নাটকে ব্যবহৃত ভাষারীতি সহজ, সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাবাবেগে ভরপুর, স্নিগ্ধ অথচ স্বচ্ছন্দগতি। দৃশ্যের পর দৃশ্যের আবির্ভাবে দর্শকের মধ্যে উৎকণ্ঠা বজায় রেখে সাবলীলভাবে কাহিনী এগিয়েছে। এমনিতে হাসি-কান্না, প্রতীক্ষা, উৎকণ্ঠা নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। 'সাবিত্রী'-নাটকে নাট্যকার মন্মথ রায় চরিত্রগুলিকে সহজ, স্বাভাবিক, সরল ও দৃঢ় রেখে আধুনিক মননের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজিয়ে ভাববৈচিত্র্যে নাটককে কী করে দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়-কী করে হাসি ও অশ্রু , প্রতীক্ষা ও উৎকণ্ঠাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শক মনকে সঞ্চারিত করে দেওয়া যায়–এ প্রক্রিয়াটি মন্মথ রায়ের সহজাত অধিকারের মধ্যেই ছিল যা এ নাটকে ফুটে উঠতে দেখা যায়। এ নাটকে সর্বমোট চরিত্র ১৪টি; পুরুষ চরিত্র ৯টি, নারী চরিত্র ৫টি। এ নাটকে প্রথম অঙ্কে চারটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে চারটি দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কে তিনটি

দৃশ্য, পঞ্চম অঙ্কে চারটি দৃশ্য রয়েছে। নাটকে ১২টি গানের ব্যবহার হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম গানগুলো রচনা করেছেন।

ঐতিহাসিক কিংবদন্তি জ্যোতিষী 'খনা'কে নিয়ে রচিত **'খনা'(১৯৩৫)** নাটকটির বার আনা কল্পনা এবং চারি আনা কিংবদন্তি। নাটকে সিংহল রাজকন্যা খনা অজ্ঞাত পরিচয় মিহিরকে বিবাহ করেন, স্বামীসহ জন্মস্থান ত্যাগ করে উজ্জয়িনী নগরে গমন করেন। খনার নির্ভুল গণনায় স্বামী মিহির তার পিতৃ পরিচয় লাভ করেন। ভুল গণনায় বরাহ নিজ পুত্রকে স্বল্পায়ু জেনে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। বহু বছর পরে পুত্র ও পুত্রবধূ ফিরে আসে। পুত্রবধূ খনার নির্ভুল গণনার মাধ্যমে শ্বশুরের গণনায় ভুল সংশোধন করে দেন। খনার উক্তি থেকে জানা যায়:

"দেখুন আমি আপনার সেই পুত্রের জন্ম–পত্রিকা রচনা করেছি। এই দেখুন, আয়ু ছিল তার একশত বৎসর অথচ আপনি তার পিতা, গণনায় দুটি শূন্য ভুল করে বাদ দিয়েছেন।"[২৭]

পরবর্তীকালে খনার নির্ভুল গণনার কারণে উজ্জয়িনী নগরে খনার প্রতি সকলের বিশ্বাস ও ভক্তি স্থাপিত হয়। খনা জ্যোতিষীবিদ্যা চর্চার ফলস্বরূপ যত প্রকার গণনা করে সবই বাস্তবে ঘটতে দেখা যায়। এতে করে নগরের সাধারণ জনতা খনার গণনার প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে। আর বিশ্ববিখ্যাত নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন জগদ্বিখ্যাত জ্যোতিষী শ্রেষ্ঠ বরাহের প্রতি ক্রমান্বয়ে মানুষের বিশ্বাস কমে যেতে থাকে। স্বয়ং বরাহ এই অপমান সহ্য করতে পারছেন না। এদিকে খনাদেবীর বচন অনুযায়ী কাজ করে, যাত্রাপথে গমন করে অনেকে সফল হয়েছেন। ফলে খনাদেবী ক্রমাগত মানুষের বিশ্বাসের জায়গায় অধিষ্টিত হলেন। জ্যোতিষার্ণব বরাহ মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকেন। ক্রমান্বয়ে

শ্বশুর বরাহ পুত্রবধূ খনার জ্যোতিষ বিদ্যার পারদর্শিতার কাছে অযোগ্য প্রমাণিত হন। ভাবী জামাতা কামন্দকের কাছে শ্বশুর বরাহকে আক্ষেপ ভরে বলতে শোনা যায়,

> আমি দেখেছি, ওদের গণনা অব্যর্থ, আমি শুনেছি, ওদের বিদ্যা অলৌকিক বিদ্যা, ওদের প্রতিভাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু এ কথাও ঠিক কামন্দক, ওদের বিদ্যা রাক্ষসী বিদ্যা–সনাতন শাস্ত্র সম্মত নয়। কিন্তু কি করব, আজ আমি বৃদ্ধ, আমার সে নব নব উন্মেষসালিনী প্রতিভা নেই–তর্ক–যুদ্ধের শক্তি নেই, সাহসের অভাব হয়েছে, অধ্যবসায় হারিয়েছি। আজ আমি আমার যৌবনের জীর্ণ কঙ্কাল–আজ আমার বুকে শুধু–এক হাহাকার।[২৮]

শ্বশুরকে এতটা অপমানিত ও হেয় হতে হচ্ছে দেখে খনাদেবী বিব্রত ও অসহায়বোধ করতে থাকেন। কিন্তু নগরের মানুষের প্রত্যাশার কাছে তাকে হার মানতে হয়। এই পরিস্থিতে শাশুড়ি, ননদ এমকি স্বামী মিহির পর্যন্ত তাকে ভুল বুঝতে থাকে। এদিকে খবর আসে বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় খনাদেবীর স্বর্ণ মূর্তি শুধু প্রতিষ্ঠা হয়নি বরং শ্বশুরকে পদচ্যুত করে পুত্রবধূ খনাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করা হয়। এই সংবাদ শ্রবণে পরিবারের সবাই খনাদেবীর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। খনাদেবী পরিবারের সবাইকে যতই বোঝাতে চান যে তিনি এসব প্রত্যাশা করেন না। তবুও কেউ তার কথা বিশ্বাস করতে চায় না, অসহায়, নতুন পরিবেশে, পরিবার পরিজনদের অবিশ্বাস সন্দেহ বৃদ্ধি পেতে থাকে।স্বামী মিহির তাকে তিরস্কার করে বললেন:

> তুমি আমাদের কুগ্রহ-তোমারই জন্য...তোমাদেরই জন্য পিতার এই অপমান পুনঃ এই অমর্যাদা অবশেষে এই লাঞ্ছনা। কুক্ষণে ভেলায় ভেসে সিংহলে কুল পেয়েছিলাম, কুক্ষণে তোমার

পিতামাতা আমাকে লালন-পালন করেছিলেন, কুক্ষণে তুমি আমি জ্যোতিষ শিক্ষা গ্রহণ করে ছিলাম, কে জানত তখন, যে তুমিই হবে আমার জীবনের একমাত্র কুগ্রহ! আর শুধু আমার কুগ্রহ নও আমার দুর্গ্রহ পিতার কুগ্রহ আমাদের সংসারের কুগ্রহ কিন্তু কাকে তিরস্কার করব খনা–এ আমার নিয়তি তোমার নিয়তি।[২৯]

বরাহের কন্যা মদনিকার স্বামী জ্যোতিষী বরাহের শিষ্য কামন্দক তীব্র কটুক্তি করে খনাকে বললেন, "কি করে যে ঐ মুখ আপনি এখনও দেখাচ্ছেন, ভেবে পাই না–বাপ্–মুখের কি কাল-বচন–আমি হলে অমন জিভ্ কেটে ফেলতাম।"[৩০]

মরণাহতের মত আঘাত প্রাপ্ত খনাদেবী অন্তঃপুরে ছুটে গেলেন। এদিকে সিংহল রাজ্যের মন্ত্রিদ্বয় রাজার মুকুট নিয়ে তাদের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী খনাদেবীকে বরণ করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। সিংহল থেকে খনার দেহরক্ষী তিলক এসে জানায় খনাকে সংবর্ধনা করে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমগ্র সিংহলবাসী ছুটে আসছে। তখন দেহরক্ষী তিলকের প্রতি খনার কাতর অনুনয় তার সংলাপে প্রকাশ পেয়েছে:

আসছে–সমগ্র সিংহল,..আমার বাবা ? না–না এ সব কি ? এ কি অন্যায় ? আমি বধূ। আমার স্বামী, আমার শ্বশুর একমুষ্টি আতপ তণ্ডুলে ক্ষুণ্নিবৃত্তি করেন। এ কি অত্যাচার ! না তিলক, তুমি-তুমি-তুমি এখান থেকে বরং চলেই যাও–হ্যাঁ তোমাকে ওভাবে আমি সইতে পারছি না। আমার স্বামী, আমার শ্বশুর এখানে এসে তোমাকে এভাবে দেখেন, এ আমি ইচ্ছা করি না–ইচ্ছা

করি না তিলক ! ফিরে যাও তুমি–ফিরে গিয়ে যারা আসছে তাদের বল, তারা ওভাবে আমার এখানে এলে আমি আত্মহত্যা–হ্যাঁ আমি আত্মহত্যা করব।[৩১]

এদিকে খনা দেবীর কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিতে উজ্জয়িনী রাজ্যের রাজা স্বয়ং বিক্রমাদিত্য জয়মুকুট নিয়ে আসছেন। খনা দেবীকে বরণ করার জন্য সবাই যখন খনা দেবীর আগমন অপেক্ষায় অধীর হয়ে উঠেছে। খনাদেবীকে ডেকে আনতে মিহির অন্তঃপুরে ছুটে গেলেন। কিন্তু সমস্ত আনন্দকে কালিমা লেপন করে মিহির মৃত খনাদেবীকে নিয়ে সর্বসমক্ষে এলেন। অভিমানি খনাদেবী এত লাঞ্ছনা, অপমান সইতে না পেরে নিজ জিহ্বা কর্তন করেন। অনবরত রক্তপাতের কারণে খনাদেবীর মৃত্যু ঘটে। সিংহলের রাজমুকুট ও রাজা বিক্রমাদিত্য প্রদত্ত জয় মুকুট খনাদেবীর উদ্দেশে শ্রদ্ধাভরে সোপান প্রান্তে অর্ঘ্য...দেয়া হল।

নাট্যকার তাঁর সহজাত লেখনীর দক্ষতায় বিশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী খনা নাম্নী একটি উজ্জ্বল নারী চরিত্র অঙ্কন করেছেন। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অবদমন, নারীর যোগ্যতার অবমূল্যায়ন সবকিছু মিলিয়ে 'খনা' নাটকটি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদস্বরূপ। নাটকে সংলাপ ব্যবহারে নাট্যকার পূর্বের মতই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনী সাবলীলভাবে এগিয়েছে। প্রতিটি চরিত্র নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিকশিত হয়েছে। নাটকে খনা স্বামী–শ্বশুরের জন্য আত্মত্যাগ, যশ, খ্যাতির ঊর্ধ্বে স্বামী-সংসারকে প্রাধান্য দিতে দেখা যায়, অবশেষে শ্বশুরের সম্মান রক্ষার্থে আত্মহননের পথ বেছে নেন।

এ নাটকে ২০টি চরিত্র রয়েছে; পুরুষ চরিত্র ১৪টি, নারী চরিত্র ৬টি। নাটকে ৬টি গানের ব্যবহার হয়েছে। শ্রী অখিল নিয়োগী গানগুলো রচনা করেছেন, সঙ্গীতাচার্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় গানে সুর সংযোগ করেছেন, শ্রীযুক্তা নীহার বালা নৃত্য পরিচালনা করেছেন, নরেন দত্ত দৃশ্যপটের চারু কল্পনা ও গ্রন্থের প্রচ্ছদপট অঙ্কন করেছেন। নাটকের প্রথম অঙ্কে একটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে একটি দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কে চারটি দৃশ্য, পঞ্চম অঙ্কে একটি দৃশ্য রয়েছে। সমগ্র নাটকটির ঘটনা সিংহল ও উজ্জয়িনী নগরীর কয়েকটি স্থানে সংগঠিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক তথ্য মতে[৩২] জানা যায়, চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত বারাসাত মহকুমার দেউলি গ্রামে খনার নিবাস ছিল বলে জনশ্রুতি আছে। খনা দেবীর পিতার নাম অটনাচার্য বলে একটি ছড়ায় উল্লেখ আছে। "আমি অটনাচার্যের বেটি। / গণতে গাথতে কারে না আটি।।" রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম বরাহের পুত্র মিহির তাঁর স্বামী ছিলেন বলেও কিংবদন্তি আছে। খনার বচনের রচনাকার সম্বন্ধে মতান্তর থাকলেও এগুলো যে দীর্ঘকালের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রত্যক্ষ সত্যের আসন গ্রহণ করেছে তা অনস্বীকার্য। মূলত কৃষিতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশাত্মক ছড়া,আনুমানিক ৮ম-১২শ শতকের মধ্যে রচিত। এ রচনাগুলি চার ভাগে বিভক্ত : কৃষিকার্যের প্রথা ও কুসংস্কার, কৃষিকার্যে ফলিত ও জ্যোতিষ জ্ঞান, আবহাওয়া জ্ঞান ও শস্যাদির যত্ন সম্পর্কিত উপদেশ। কৃষকদের কৃষি সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল ছাপ এই ছড়া-প্রবচনগুলোতে বর্তমান। নিম্নে কতগুলো নমুনাতেই তা স্পষ্ট প্রমাণিত:

ক. ষোল চাষে মুলা।

তার অর্ধেক তুলা।।

তার অর্ধেক ধান।

বিনা চাষে পান।।

খ. আট হাত অন্তর এক হাত বাই,

কলা পোত গো চাষী ভাই।।

পুতে কলা না কাট পাত।

তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।।

এমনি অজস্র খনার বচন যুগ-যুগান্তর ধরে গ্রাম বাংলার জনজীবনের নাড়ীর সাথে অবিচ্ছেদ্য হয়ে মিশে আছে।

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন ডি-লিট প্রণীত 'সতী' নাট্যকার মন্মথ রায়ের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে নির্ধারিত ছিল। আলোচ্য **'সতী'(১৯৩৭)** নাটকটি রচনার জন্য মন্মথ রায় ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের ঐ আখ্যায়িকা হতে অধিকাংশ সাহায্য গ্রহণ করেছেন।[৩৩] সতী নাটকে শিবের পত্নী সতীকে নিয়ে যে প্রাচীন কাহিনী গড়ে উঠেছে তাই এই নাটকের নাট্যরূপ হিসাবে দেখানো হয়েছে। একদিকে পিতা অন্যদিকে স্বামীর আকর্ষণকে কেন্দ্র করে নাট্য-সংঘর্ষ গড়ে উঠেছে।

পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে সতী মাহাত্ম্যের এ কাহিনী তখনকার সময়ে নাটক হিসাবে দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। নাটকে মোট ২৭টি চরিত্র রয়েছে; তন্মধ্যে ১৫টি পুরুষ চরিত্র, ১২টি নারী চরিত্র। নাটকে সংলাপ ব্যবহারে তৎকালীন সময় ও পরিবেশকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। নাটকের শুরুতে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সতীর পিতা দক্ষ ও অন্যান্য দেবতারা সমুদ্র মন্থনের সময় উত্থিত বিষ ও অমৃত বণ্টনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। দেবতারা সবাই অমৃত

নিলেন। একমাত্র শিব বিষ গ্রহণ করলেন। সতীর পিতা দক্ষ ও অন্যান্য দেবতারা তাই নিয়ে তামাশা করছেন। সতী তখন বললেন:

> শিবের ব্যবহারে হাসবার কি আছে দেব? অমৃত যখন বণ্টন হল, শিবের কথা তখন কারো স্মরণ হল না। যখন উঠল বিষ, ত্রাহি ত্রাহি রব উঠল, সৃষ্টি ধ্বংস হয়। দেবতা ও অসুরের মিলিত কণ্ঠে আর্তস্বরে ধ্বণিত হল ''কোথায় শিব! রক্ষা কর! রক্ষা কর।" মহানন্দে ছুটে এলেন মহাদেব...মহানন্দে পান করলেন সেই বিষ!...ভাঙ খান...সিদ্ধি খান, সবই সত্য...কিন্তু সবচেয়ে বড় সত্য এ জগতের সকল বিষ, সকল অমঙ্গল তিনিই করেছেন বরণ– তিনিই করেছেন হরণ,[৩৪]

সতীর বিবাহের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে দেবতা নারদের কথার উত্তরে সতীর পিতা দক্ষ বললেন, "এত শীঘ্র ওর বিবাহ দেওয়া আমার অভিপ্রেত ছিল না নারদ ! কিন্তু ওর গর্ভধারিণীর কাছে শুনলাম, এই বয়সেই ওর মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হচ্ছে তাই আমি ওকে পাত্রস্থ করবার সঙ্কল্প করেছি। এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠছে নারদ !"[৩৫]

পিতা দক্ষের অমতে স্বয়ংম্বর সভায় সতী শিবের কণ্ঠে মালা পরিয়ে দেয়। ক্ষুব্ধ, হতাশ, বেদনার্ত দক্ষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও কন্যা সতীকে বিদায় দেন। কিছুদিন পরে দক্ষের গৃহে যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। পিতা দক্ষ সতীর আগমনের পূর্বে শিবকে অপমান করেন। শিব সতীর পিতা দক্ষের রূঢ় মূর্তি পর্যবেক্ষণ করেন এবং শ্বশুরের নিষ্ঠুর অপমান সহ্য করে কৈলাসধামে ফিরে যান। শিব তার স্ত্রী সতীর কাছে শ্বশুরের খারাপ ব্যবহারের কথা গোপন করেন। সতী পিতৃগৃহে যজ্ঞানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ

করতে চাইলে শিব সতীকে যেতে নিষেধ করেন। সতী শিবের নিষেধ সত্ত্বেও পিতৃগৃহে গমন করেন। সতীর বিশ্বাস ছিল মাতা–পিতা সন্তানের প্রতি বেশিদিন বিমুখ হয়ে নিশ্চয়ই থাকবেন না। সতী পিতৃগৃহে এসে পিতাকে অনুরোধ করে বললেন,

"পিতা– আমি তোমার মুখে শুনতে চাই পিতা, তুমি কি তাঁকে নিমন্ত্রন করবে না। তুমি বল–তুমি বল পিতা এ যজ্ঞে কি দেবাদিদেব মহাদেবের আসন শূন্য থাকবে ? তোমার উত্তর আমি শুনতে চাই– তোমার উত্তর।"[৩৬]

প্রত্যুত্তরে দক্ষ বললেন,

> উত্তর আমি পূর্বেই দিয়েছি–আমি প্রজাপতি শ্রেষ্ঠ দক্ষ–সর্বভূতের ভাগ্যবিধাতা। অথচ আমাকে কিনা ধুতরাসেবী ভাঙড়ে অপমান করেছে। তাকে জামাতা বলে স্বীকার করতে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে–তার নাম আমার পুরীতে যেন আর কখন উচ্চারিত না হয়। এবং তার গৃহিণী বলে যে পরিচয় দেয়–আমার কন্যা পরিচয় বলে তার পরিচয় দেওয়ার কোন অধিকার নেই।[৩৭]

চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে পিতৃগৃহে পিতার মুখে পতি শিবের নিন্দা শুনে উপস্থিত দেতারা উপহাসের হাসি হেসে ওঠেন। সতী তেজদীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন:

> স্তব্ধ হও দেবতামণ্ডল ! তাঁর মাহাত্ম্য তোমরা কি বুঝবে? মনে কর সমুদ্র মন্থন। ধরিত্রী যখন বিষ জর্জরিত...সে বিষপান করে সৃষ্টি রক্ষা কে করেছিল? আমারি নীলকণ্ঠ। ত্রিলোক যা ঘৃণায় করেছে পরিহার, তাকেই গ্রহণ করেছেন আমার মহাদেব ! তোমরা নিয়েছ অগুরু চন্দন, তিনি নিয়েছেন ভস্ম। তোমরা নিয়েছ রত্ন-মানিক্য তিনি নিয়েছেন শ্মশানের পরিত্যক্ত অস্থি-পুঞ্জ।

তোমরা নিয়েছ পারিজাত, তিনি নিয়েছেন বিষাক্ত ধুস্তুর। তোমাদের আনন্দ ভোগে, তাঁর আনন্দ ত্যাগে। তাঁর মহিমা তোমরা কী বুঝবে স্পর্ধিত, দাম্ভিক দেবতামণ্ডল![৩৮]

নাটকের শেষাংশে পিতৃগৃহে পতি শিবের নিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতী আত্মাহুতি দেন। পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে সতী মাহাত্ম্যের এ কাহিনী তখনকার সময়ে নাটক হিসাবে দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। নাটকে মোট ২৭টি চরিত্র রয়েছে। তন্মধ্যে ১৫টি পুরুষ চরিত্র, ১২টি নারী চরিত্র। নাটকে সংলাপ ব্যবহারে তৎকালীন সময় ও পরিবেশকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সতী নাটকে প্রথম অঙ্কে তিনটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কে তিনটি দৃশ্য রয়েছে। নাটকে পাঁচটি গানের ব্যবহার রয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম গানগুলো রচনা ও সুর সংযোজনা করেছেন। সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী চারু রায় দৃশ্য পরিকল্পনা করেছেন। শ্রীযুক্তা নীহার বালা নৃত্য পরিকল্পনা করেছেন।

মেদিনীপুর অঞ্চলের একটি ইতিহাস মিশ্রিত লোকগাথার কাহিনী থেকে **‘রঘু ডাকাত’(১৯৫৫)** নাটকের কাহিনীটি নেয়া হয়েছে। মেদেনীপুর অঞ্চলের চন্দনপুর গ্রামে বৃন্দাবন দাসের গৃহে অর্জুন নামে এক অনাথ বালক রাখালের কাজ করত। অনাথ এবং আশ্রিত বলে গৃহকর্তা বৃন্দাবন দাস প্রতিনিয়ত দুর্ব্যবহার করতেন। অবজ্ঞা, অনাদর, অবহেলা অর্জুনকে প্রতিবাদী করে তোলে। নাটকের একপর্যায়ে বৃন্দাবন দাস অর্জুনকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে অর্জুন মনের দুঃখে শ্মশানঘাটে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে রঘু ডাকাতের অনুগত সঙ্গীরা মৃত রঘু ডাকাতের শবদেহ দাহ করতে এসেছে। এরপর চমকপ্রদ নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে অর্জুন রঘু ডাকাতে পরিণত হয়। মৃত রঘু ডাকাতের

মৃত্যুর ঘটনা কেউ জানল না। সবাই জানে রঘু ডাকাত বেঁচে আছে। রঘু ডাকাত ধনী গৃহে লুট করা অর্থ-সম্পত্তি দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দেয়। এজন্য গ্রামে অর্থ-বিত্তশালীরা সবসময়ে রঘু ডাকাতের ভয়ে থাকে। এই নাটকের মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার থেকে পরিত্রাণের জন্য পরিত্রাতা রূপে যুগে যুগে দুর্ধর্ষ রঘু ডাকাতের জন্ম হয়। আর সেই দুর্ধর্ষ রঘু ডাকাত প্রেমের পরশ পাথর স্পর্শে কৃষ্ণভক্তে রূপান্তরিত হয়ে সন্ন্যাসীর জীবন বরণ করেন। সংলাপের সার্থক ব্যবহারে অর্জুন ও কৃষ্ণা চরিত্র দুটো দর্শকের কাছে আরও বেশি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে নিজের সম্ভ্রম রক্ষায় কৃষ্ণা বিষপানে আত্মহত্যা করে। মৃত্যু পূর্ব মুহূর্তে কৃষ্ণা অর্জুনকে কাতর ভাবে অনুনয় জানায়,

> রঘু ডাকাতের ভয়ে মেয়েদের হাতে থাকে বিষের আংটি। আমি সেই বিষ খেয়েছি। (অর্জুন আর্তনাদ করিয়া উঠিল) ঊষা কীর্তন করেই আমাদের প্রথম মিলন হয়েছিল। আজ মরবার আগে আমার শেষ অনুরোধ ডাকাতি কর–যত পাপই কর–শুধু প্রতিদিন ঊষা কীর্তন করে আমায় মনে রাখবে, ঊষা কীর্তনেই হয়েছিল আমাদের ইহকালের মিলন ঊষা কীর্তনেই হবে আমাদের পরকালের মিলন।[৩৯]

নাটকের শেষাংশে রঘু ডাকাত রাজা নারায়ণ বল্লভকে হত্যা করতে এসে ঊষা কীর্তনের সময় হয়ে যাওয়াতে সমস্ত ভুলে ঊষা কীর্তনে মগ্ন হয়ে গেলেন। রাজা নারায়ণ বল্লভ ঘুম থেকে জেগে রঘু ডাকাতের এই আত্মমগ্ন ধ্যানীস্বরূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে বললেন:

তুমি কেমন ডাকাত যে আমাকে হাতের মুঠোয় পেয়েও হত্যা করলে না? তুমি কেমন ডাকাত দুর্লভ মণি মানিক্য বিসর্জন দিয়ে আত্মরক্ষার একমাত্র অস্ত্র শানিত ছুরিকা ভূতলে নিক্ষেপ করে কৃষ্ণের বন্দনা করছ ? না, না, তুমি ডাকাত নও, তুমি ভক্ত। বহু সাধক দেখেছি কিন্তু কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করতে জীবন যাবে একথা জেনেও নাম কীর্তন করেছে এমন সাধক দেখলাম এই প্রথম। কে বলে তুমি ডাকাত ? তুমি ভক্তোত্তম। এস সকলে নতজানু হয়ে এই মহাসাধকের আশীর্বাদ ভিক্ষা করি।[৪০]

এভাবেই রঘু ডাকাত চরিত্রটি দর্শক-পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হয়। নাটকের সমাপ্তিতে দেখা যায় রঘু ডাকাত অন্তরের অন্তস্তলে ঐশ্বরিক জগতের সন্ধান পান। স্বয়ং রাজা নারায়ণ বল্লভের মতো দর্শকও ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধিতে সক্ষম হন। এখানেই নাটকের সার্থকতা। একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত কিভাবে ঈশ্বরের করুণা ধারায় সিক্ত হন তাই এ নাটকে নাট্যকার দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন। ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ঐকান্তিক ভক্তি একজন ডাকাতকেও অনেক বড় সাধকে পরিণত করে। আলোচ্য 'রঘু ডাকাত' নাটকে এই সত্যটি প্রকাশ পেয়েছে। নাট্যকার তাঁর লেখনী দ্বারা রঘু ডাকাতের অতীত জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করেছেন। তেমনি রঘু ডাকাত থেকে কিভাবে একজন বড় সাধক, সত্যিকার ভক্তে পরিণত হয় এই রঘু ডাকাত নাটকটি তারই আলেখ্য। সংলাপ ব্যবহারে যেমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তেমনি পরিবেশ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় চরিত্রগুলো বাস্তব সম্মত হয়ে উঠেছে। ঘটনার সমাবেশের সুশৃঙ্খল বিন্যাস নাটকটিকে দর্শক প্রিয় হতে সাহায্য করেছে। সর্বোপরি কাহিনীর সুসংহত গাঁথুনি রঘু ডাকাতের ব্যক্তিগত জীবনকে মানবিক করে তুলেছে। রঘু ডাকাত থেকে

প্রকৃত সাধকে রূপান্তরিত হওয়ার পর্যায়ক্রমিক বিবরণ দর্শক ও পাঠককে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে। সর্বোপরি রঘু ডাকাত নাটক হিসাবে সার্থক ও পরিপূর্ণ হয়েছে।

নাটকের কাহিনী বিনির্মাণে, চরিত্র চিত্রনে, সংলাপ ব্যবহারে; সর্বোপরি নাটকের শেষ পর্যন্ত নাটকীয়তা অক্ষুণ্ন ছিল। নাটকে সর্বমোট ১৬টি চরিত্র রয়েছে। তন্মধ্যে ১৪টি পুরুষ চরিত্র, ২টি নারী চরিত্র। প্রতিটি চরিত্র সংলাপ ব্যবহারের মাধ্যমে বিকশিত হয়ে উঠেছে। চতুর্থাঙ্ক এই নাটকটিতে প্রথম অঙ্কে তিনটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য। চতুর্থ অঙ্কে আটটি দৃশ্য রয়েছে।

নাট্যকার মন্মথ রায় আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য আনয়নের চেষ্টা করেছেন। নাট্যকাহিনীকে পঞ্চাঙ্ক বিভাগ এবং অঙ্ক ও দৃশ্যের অনিবার্য পরিণতি থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। তাঁর প্রথম নাটক চাঁদ সদাগর তিন অঙ্ক সমন্বিত নাটক। কখনো বা অঙ্কের মধ্যে, কোন কোন নাটকে দৃশ্যভাগ করেননি। যেমন 'দেবাসুর' ও 'মহুয়া'। এ দুটি পঞ্চাঙ্ক নাটক হলেও প্রত্যেকটি অঙ্কই এক একটি দৃশ্যরূপে পরিকল্পিত হয়েছে। নাটকীয় কাহিনী, কখনো গতিবেগ হারায়নি, নাট্য কৌতূহল শিথিল হয়নি। নাট্যকার অনায়াস দক্ষতায় বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে নানান জটিল ঘটনাকে সহজেই ফুটিয়ে তুলেছেন। এর জন্য আলাদা দৃশ্য বিভাগ দরকার হয়নি। 'মহুয়া'য় নাটকীয় ঘটনা প্রচণ্ড দ্রুত গতিবেগ সম্পন্ন হয়ে নাটকটির মধ্যে অফুরন্ত প্রাণ প্রবাহের সাবলীলতা এনেছে। 'কারাগার'-এ পরাধীন জাতির সামনে নাট্যকার সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামের আলেখ্য তুলে ধরেছেন। পৌরাণিক নাটকের দাবি মেনেও এ নাটক শৃঙ্খলিত ভারতবাসীর উদ্দীপক মুক্তিমন্ত্র হয়ে উঠেছে।

চরিত্র সৃষ্টিতেও মন্মথ রায় তাঁর পৌরাণিক নাটকে প্রথা ভেঙেছেন–দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি বৃত্রাসুর, বরাহ, কংস, অশ্বপতি, খনা, সাবিত্রী প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্রগুলির মধ্যে শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজিক চরিত্রের অন্তর্বেদনা ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব সঞ্চারিত করেছেন। শুধু চরিত্র সৃষ্টিতেই নয়, সংলাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তিনি পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে নতুন ভাবনাচিন্তা করেছেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তাঁর ওপর দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। পদ্য সংলাপ ব্যবহার না করে সংকেত গূঢ় রহস্য ব্যঞ্জনাময় গদ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন–উপমায় অলংকারে সজ্জিত চিত্রধর্মী সে ভাষা সজীব গতিবেগ সম্পন্ন হয়েছে।

মন্মথ রায়ই প্রথম নাট্যকার যিনি সাধারণ রঙ্গালয়ে আত্মপ্রকাশ করে ঊনিশ শতকের পৌরাণিক নাটক রচনার ঐতিহ্য বাহিত ধারাটি ভাঙতে চেয়েছিলেন। সূচনা থেকেই তাঁর এ শ্রেণির নাটকে মূল রস ভক্তি ছিল না-ছিল মানবিক। তার ফলে তিনি ঘটনা ও চরিত্রের অলৌকিকতার উপর আস্থা না রেখে এ শ্রেণির নাটকগুলোতে সমকালীন বিবিধ সমস্যার প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় ॥ ২য় পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক নাটক

এসিরিয়ান সম্রাট নাইনাসের ব্যাকট্রিয়া জয়ের পরবর্তী ঘটনাই হল **‘সেমিরেমিস’(১৯২৬)** নাটকের কাহিনী। আলোচ্য নাটকে সম্রাট নাইনাসের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু অসঙ্গত ও গোপনীয়

ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে। পুরো কাহিনীতে অন্যান্য যারা জড়িত তারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছে। অন্যান্য চরিত্র হল সম্রাট নাইনাসের কন্যা সুসানা, সেনাপতি স্টেব্রবেটস যে কিনা সম্রাট নাইনাসের সৎপুত্র। সুসানা–স্টেব্রবেটস উভয় উভয়কেই ভালবাসে। সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা হল সম্রাট নাইনাসের অধীনস্থ এসিরিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত সিরিয়া দেশের শাসনকর্তা মেনন, যার স্ত্রী এই যুদ্ধ জয়ের অন্যতম কৃতিত্বের অধিকারী । যার নাম সেমিরেমিস। সম্রাট নাইনাস মেননের স্ত্রীর (সেমিরেমিসের) অপরূপ সৌন্দর্য দেখে কামাসক্ত হয়ে পড়েন। নাইনাসের উক্তিতে জানা যায় কামনার তীব্রতা,

> তুমি এসেছ এক রহস্যময় স্বপ্নের মত ! কি অপরূপ মাধুরী তোমার চোখে মুখে ! সর্বাঙ্গে তোমার আনন্দের জোয়ার ! বিশ্বের সৌন্দর্য তিল তিল করে তোমার ওই যৌবনশ্রী উদ্ভাসিত করেছে। হে বিশ্ব বাঞ্ছিতা ! আজ এই বিজয়োৎসবে, তুমি ভুলে যাও...একটি রাত্রির জন্য ভুলে যাও...তুমি এই মেননের স্ত্রী।–মনে কর আজ আমরা নিখিলের বন্ধনহীন চির স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী নরনারী।[৪১]

পরবর্তীতে সেমিরেমিসকে লাভ করার দুর্বার অভিপ্রায়ে সম্রাট নাইনাস মেননকে হত্যা করেন। এরপর সম্রাট নাইনাস সুন্দরী সেমিরেমিসকে লাভ করেন। নাটকের শেষাংশে জানা যায় সেমিরেমিস ও স্টেব্রবেটস উভয়ে ভাই–বোন। নর-নারীর জৈবিক কামনা-বাসনার কাছে হার মেনে সমাজ অস্বীকৃত যে সন্তান পৃথিবীতে আসে, তারা সামাজিকভাবে অস্বীকৃত, অন্যের আশ্রয়ে, দয়ায় বেঁচে থাকে। স্টেব্রবেটস ও সেমিরেমিস উভয়েই আশ্রিত থেকেই বেড়ে উঠেছে। সেমিরেমিস চরিত্রটি শুরু থেকেই

খেয়ালী ও অস্থির প্রকৃতির। রাজা মেননের মৃত্যু, সেমিরেমিসের আদেশে স্টেব্রবেটস কর্তৃক সম্রাট নাইনাসের মৃত্যু, নাইনাস কন্যা সুসানাকে বন্দী করা, পরে মুক্তি দিয়ে সেমিরেমিস বিশাল রাজত্ব সুসানাকে অর্পণ করেন। সেমিরেমিস স্টেব্রবেটসকে ভাই হিসাবে চিনতে পেরেছিলেন। তাই ঘটনার কেন্দ্রে থেকে নাটকের মূল চরিত্র হিসাবে পুরো কাহিনীর নিয়ন্ত্রক হিসাবে সেমিরেমিস ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। আজন্ম বিব্রতকর জন্ম পরিচয় নিয়ে সেমিরেমিস বেড়ে ওঠে। তাইতো সত্য উদ্‌ঘাটন ও সম্রাট নাইনাসের জৈবিক তাড়নাকে উস্‌কে দিয়ে পরবর্তীতে স্টেব্রবেটসকে দিয়ে সম্রাট নাইনাসকে হত্যা করে। আর যে সুসানাকে জীবন সঙ্গী করার জন্য স্টেব্রবেটস উদগ্রীব ছিল। যখন জানল সুসানা তার বোন তখন স্টেব্রবেটসের অন্তর্মুখী যন্ত্রণার স্পর্শ নাট্যকার দর্শকের হৃদয়ে ছোঁয়াতে সক্ষম হয়েছেন। তাইতো নাটকের শেষাংশ স্টেব্রবেটস, সুসানা এবং সেমিরেমিস চরিত্রের প্রতি দর্শকের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করে না। বরং নিয়তির নির্মম পরিণতির স্বীকার প্রতিটি চরিত্র দর্শকের কাছে সমবেদনার পাত্র হয়ে ওঠে। নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি চরিত্র যথাযথভাবে বিকশিত হয়েছে। মূল ঘটনার সাথে কাহিনীর সমাবেশ যথাযথভাবে ঘটেছে বলেই 'সেমিরেমিস' নাটকটি সার্থক। নাটকের সংলাপ ব্যবহারে নাট্যকার পূর্বের মতোই সফল ও সার্থক। নাটকে মূল চরিত্র ছয়টি। সম্রাট নাইনাস, সিরিয়ার শাসনকর্তা মেনন, মেনন পত্নী সেমিরেমিস, নাইনাসের পালিত পুত্র স্টেব্রবেটস, নাইনাস কন্যা সুসানা ও এসিরিয়ান সৈন্যাধ্যক্ষ হাইডেসপাস। সেমিরেমিস নাটকটি "*Historians History of the world*"-এর একটি আখ্যায়িকার অতি অস্পষ্ট ছায়াচিত্র বিশেষ।

নাট্যকারের কল্পনাই একে বর্ধিত ও পুষ্ট করেছে। সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার অধিকারী নাটকটি প্রকাশে উদ্যোগী ছিলেন।

চরিত্রগুলো স্ব স্ব অবস্থান থেকে বিকশিত হয়ে নাটকের এই চমকপ্রদ কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। নাট্যকার সংলাপ ব্যবহারে যে দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন তাতে চরিত্রগুলো আনুপূর্বিক গতিশীল ছিল। নাটকে মোট ৬টি চরিত্র; পুরুষ চরিত্র ৪টি, নারী চরিত্র ২টি। ৩ অঙ্কে সমাপ্ত সেমিরেমিস নাটকে কোন দৃশ্য বিভাজন নেই।

ইতিহাসের বিষয় নিয়ে রচিত নাটক হল **'অশোক'(১৯৩৩)**। এ নাটকে সম্রাট অশোকের বীরত্ব অপেক্ষা ব্যক্তি সম্রাটের মানসিক দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ সত্তাই ফুটে উঠেছে। ইতিহাস চেতনা অপেক্ষা সম্রাট অশোকের ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ প্রাধান্য পেয়েছে। এ নাটকে বীরত্বব্যঞ্জক পরিবেশ সৃষ্টি ঘটনার ঘনঘটা, তীব্র ঘাত-প্রতিঘাতে গড়ে ওঠা চরিত্র ও তাদের শক্তিদীপ্ত রূপ প্রকাশ পেয়েছে। সম্রাট অশোকের মানসিকতায় ভাল মন্দের অন্তর্দ্বন্দ্বে অবশেষে সম্রাট অশোকের চরিত্রে ধর্মপ্রকৃতি প্রাধান্য বিস্তার করেছে। অত্যাচারী প্রতাপশালী সম্রাট অশোক নাটকের শেষাংশে ঈশ্বরভক্ত, মানবিক, ধার্মিক অশোক-এ রূপান্তরিত হতে দেখা যায়।

নাটকে সংলাপ ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যান্য চরিত্র যেমন বাস্তব গ্রাহ্য হয়ে উঠেছে, তেমনি সম্রাট অশোক চরিত্রের দাম্ভিক রূপ যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি সম্রাট অশোকের ব্যক্তি চরিত্রের অস্থিরতা-প্রশান্তি লাভের আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ পেয়েছে। পাটালিপুত্র নগরীর অপরূপ সুন্দরী তিষ্যরক্ষিতাকে লাভ করার জন্য সম্রাট অশোকের উক্তিতে তার দাম্ভিক স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে,

চমৎকার! তোমাকে আমার চাই ! কেন চাই জান! তুমি যেমন দেশ–বিখ্যাত রূপসী–আমিও তেমনি দেশ বিখ্যাত কুৎসিত। রাজশক্তি বলে আমি তোমায় লুণ্ঠন করতে চাই না। দম্ভ ভরে আমি বলতে চাই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে আমি ক্রয় করেছি। আমি তোমাকে তোমার রূপের মূল্য দিয়েই ক্রয় করব। তোমাকে প্রথম দেখি আমি স্বপ্নে! তার জন্যও কি তোমাকে মূল্য দিতে হবে সুন্দরী।[৪২]

একই অঙ্ক ও দৃশ্যে মহামাত্য রাধাগুপ্তের প্রশ্নের উত্তরে সম্রাট অশোক বললেন, "স্বপ্নে সে এসে আমার সম্মুখে দাঁড়ায়! সেই মূর্তি, যে মূর্তি আমি ঘৃণা করি যে মূর্তি দেখতে চাই না, আমি দেখব না, তবু সেই ভিক্ষু মূর্তি!"[৪৩]

রাজাধিরাজের ঐশ্বর্য হেলায় বিসর্জন দিয়ে মুণ্ডিত মস্তকে গৈরিক চীবর পরিধান করে বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষা পাত্র হাতে নিয়ে সম্রাট অশোকের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। স্পর্ধা তার, সেই বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রসন্ন আননে সম্রাট অশোককে সম্বোধন করে বললেন,

ভিক্ষা দাও, আমায় ভিক্ষা দাও। কি ভিক্ষা সে চায় ! কেন সে আসে ! মাহামাত্য আমার সাম্রাজ্য মধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুর ভিক্ষা নিষেধ। মহাসন্ধিবিগ্রাহিক, বৌদ্ধধর্ম আমার সাম্রাজ্য হতে দূর করুণ ! ভিক্ষু মূর্তি আমি দেখতে চাই না, আমি দেখব না। আমি চাই রাজ্য–ঐশ্বর্য–সাম্রাজ্য, আমি চাই সুরা।[৪৪]

নাটকের শেষাংশে ঔদ্ধত্য, দুর্বিনীত, অত্যাচারী সম্রাট অশোক ভিন্ন মানবীয় সত্তায় রূপান্তরিত হন ! পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সম্রাট অশোক সমস্ত কিছু ধর্ম ও মানবের কল্যাণে বিলিয়ে দিয়ে মানসিক শান্তির অন্বেষায় বেড়িয়ে পড়েন। তাঁর উক্তিতে জানা যায় তিনি ভগবান উপগুপ্তকে অনুরোধ করেন,

> আমায় নিয়ে চলুন দেব আমার হাত ধরে–সেই পথে–যে পথে দুঃখ নাই–ব্যথা নাই–অনুতাপ নাই–অনুশোচনা নাই ! আমার শেষ সম্বল এই অর্ধ আমলকি তোমার হাতে দক্ষিণা দিচ্ছি। কোথায় গৌতমের সেই পথ ? কোন পথে তাঁর পদধূলি এখন বর্তমান ? সিদ্ধার্থের সেই মহাতীর্থে আমায় নিয়ে চলুন– নিয়ে চলুন দেব![৪৫]

নাটকে সর্বমোট ১৯টি চরিত্র রয়েছে। তন্মধ্যে পুরুষ চরিত্র ১৪টি, নারী চরিত্র ৫টি। নাটকে মোট ১৫টি গানের ব্যবহার হয়েছে। অখিল নিয়োগী গানগুলো রচনা করেছেন, নিতাই মতিলাল সুর দিয়েছেন। সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী চারু রায়ের পরিচ্ছদ পরিকল্পনায় 'অশোক' নাটকটি অসাধারণ দর্শকপ্রিয়তা লাভ করে।"[৪৬] পঞ্চাঙ্ক এই নাটকের প্রথম অঙ্কে একটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে দুইটি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে দুইটি দৃশ্য, চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে একটি করে দৃশ্য রয়েছে।

ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ী বলা যায়, সম্রাট অশোকের সম্পূর্ণ নাম অশোকবর্ধন।"[৪৭] প্রাচীন ভারতের সম্রাট (আনু:২৬৯–আনু:২৩২খ্রী:পূ:)। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত তার পিতামহ। পিতা বিন্দুসারের জীবদ্দশায় অশোক উজ্জয়িনীর শাসনকর্তা ছিলেন। অশোক প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি। ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম সমগ্র ভারত, বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান–সমগ্র প্রদেশকে এক সাম্রাজ্যের অধীনে আনেন। সিংহাসনে আরোহণের ১২ বছর পরে অশোক কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ

করেন। ঐ যুদ্ধে বহুলোক নিহত হলে সেই দৃশ্য দেখে তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন হয়। এরপর উপগুপ্ত নামক জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে রাজ্য বিজয়ের পরিবর্তে 'ধর্মবিজয়'-এ আত্মনিয়োগ করেন। এতে তিনি যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেন। তিনি বহু পান্থশালা ও মন্দির নির্মাণ করেন এবং অসংখ্য কূপ খনন করেন। দুর্বল ও রুগ্ন গরু-মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর জন্য পিজঁরাপোল স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তিনি সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধদেবের অহিংস ধর্মের অনুসরণ ও জনসেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মাচার্যদের জন্য বহু মঠ ও স্তূপ স্থাপন করেন। প্রাণিহত্যা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং পূর্ববর্তী রাজাদের আইনকানুনের কঠোরতা শিথিলতর করেন। তিনি ভারতের সর্বত্র ও নানাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচারকদের পাঠান। এমনকি সিরিয়া, মিশর, গ্রীস দেশেও প্রচারকদের পাঠান। তাঁর নিজ পুত্র ও ভ্রাতা সিংহলে প্রচারকদের দলপতিরূপে যান। খ্রী:পূ: ২৫০ অব্দে অশোক তার রাজধানী পাটালীপুত্রে যে বিরাট বৌদ্ধ মহাসভা আহ্বান করেন তাতে পালি অনুশাসন গৃহীত হয়। তাঁর সময়ে ভারতে প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়। শিল্পকলার প্রসার লাভ হয়। সম্রাট অশোক সাম্রাজ্যের বহুবিধ উন্নয়নমূলক কার্যাদি ছাড়াও বৌদ্ধধর্মকে একটি বিশাল বিশ্বধর্মরূপে উন্নীত করেন। তাঁর পূর্বে বৌদ্ধগণ ভারতীয় অন্যতম ধর্ম-সম্প্রদায় মাত্র ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর মৌর্য সাম্রাজ্য দ্রুত অবনতির পথে ধাবিত হয়।

'মীরকাশিম'(১৯৩৮)–ঐতিহাসিক নাটক রচনার জন্য নাট্যকারের দেশাত্মবোধ চেতনাই মুখ্য ছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বিশ্বাসঘাতকের দুরভিসন্ধি ও চতুরতায় ভারতবর্ষের যে ভাগ্য রচিত হয়েছিল শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাশিম–এর হৃদয়ে তার কতটা দ্বন্দ্বে ও বিক্ষোভে

আলোড়িত হয়েছিল, আলোচ্য 'মীরকাশিম' নাটকে সেই আলোড়নের রক্তরাঙা করুণ অথচ বীর্যদীপ্ত ভঙ্গিটি বিবৃত হয়েছে। এ নাটকের পরিণতি দৃশ্য আকস্মিক ও অতিনাটকীয়। নবাব মীরকাশিম উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে দেশের মানুষ নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা হলেই সুখী, তারা দেশ বোঝে না দেশ চায় না। তাদের কাছে দেশের স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই। তাই তো নবাব মীরকাশিমের উদাত্ত আহ্বান দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দেশের মানুষকে জেগে উঠতে হবে, সোচ্চার হতে হবে। মীরকাশিমের উক্তিতে:

> কে আছ শহীদ, কে আছ গাজী, কে আছ যোদ্ধার নফর–অত্যাচার অবসানের এই পুণ্য জেহাদে যোগ দিয়ে পলাশীর পাপ প্রক্ষালন করবার জন্য প্রস্তুত হও। পাটনায়–মুঙ্গেরে বাংলা–বিহারে কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত সব কুঠি অবরোধ কর; সমগ্র ইংরেজ ব্যবসায়ীকে বন্দী করে শাঠ্যের সমুচিত শাস্তি দিয়ে পলাশীতে অনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।[৪৮]

'মীরকাশিম' নাটকের কাহিনীর পরিণতি সংঘটনে উলেখযোগ্য চরিত্রগুলো হল মীরকাশিম, মীরজাফর, মণি বেগম, ইংরেজ সৈন্য য়্যাডামস, পিদ্রুস, ভ্যান্সিটার্ট, হেষ্টিংস, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, ফতেমা, গুরগিন খাঁ অন্যতম।

নাটকের সংলাপ ব্যবহারে মীরকাশিমের প্রদত্ত উক্তিগুলো উদ্দীপনামূলক সংলাপ বলা যায়। তিনি উদাত্ত আহ্বানে তাঁর চারপাশের মানুষগুলোকে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছেন, অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন। সর্বোপরি তিনি দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় বদ্ধপরিকর ছিলেন। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ইংরেজ সৈনিক

'হে'-কে নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করতে সাবধান করে দিয়ে নবাবের মতই সুউচ্চ কণ্ঠে মীরকাশিম বলে উঠলেন:

> তোমাদের স্বার্থের হানি হলে আমার নবাবী কেড়ে নিয়ে এই শস্য-শ্যামলা সোনার বাংলা শোষণের পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে, বাংলার মসনদে আবার বসাবে ক্লাইভের সেই গর্দভকে। কিংবা বসবে তোমরা নিজে। সে আয়োজনও যে হচ্ছে। সে আমি জানি। কিন্তু যতক্ষণ আমি মসনদে আছি বাংলার দরিদ্র প্রজার রক্ত শোষণ করতে আর তোমরা পারবে না–সাবধান।[৪৯]

নাটকের অন্যান্য চরিত্র উপর্যুপরি পরিবেশ অনুযায়ী সংলাপ ব্যবহারে বাস্তব সম্মত হয়ে উঠেছে। আর তাই চরিত্রগুলো স্ব স্ব অবস্থান থেকে নাটকের ঘটনা সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তৎকালীন সময়ে এই নাটকটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 'মীরকাশিম' নাটকে প্রথম অঙ্কে একটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে দুইটি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে দুইটি দৃশ্য, চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে একটি করে দৃশ্য রয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের বিলুপ্তি ও নতুনকালের সূচনার সন্ধিক্ষণে যেমন ঈশ্বরগুপ্তের অবস্থান, গিরিশচন্দ্র–দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকীর্তির অবশেষ ও নাটকে আধুনিকতার সূচনার মধ্যস্থলে মন্মথ রায় তেমনি দাঁড়িয়ে আছেন। নাট্যক্ষেত্রে মন্মথ রায়ের যখন আবির্ভাব, তখন বাংলা কথাসাহিত্যে যুগান্তকারী কল্লোল যুগ শুরু হয়ে গেছে। ছাত্রাবস্থায় রচিত একাঙ্ক নাটক 'মুক্তির ডাক' বাদ দিলে মন্মথ রায়ের শুরু পৌরাণিক নাটক দিয়ে। বাংলা নাটকের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কথাবস্তুর ঐতিহ্য পূর্ণাঙ্গ নাটকের ক্ষেত্রে অনেককাল তিনি অনুসরণ করে এসেছেন। তিনি গৈরিশ ছন্দ সংলাপে পরিহার

করেছেন, পৌরাণিক হোক্ কিম্বা ঐতিহাসিক, সব নাটকেই সংলাপকে তিনি মুখের কথার কাছাকাছি নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন, বাহুল্য বর্জন করেছেন, নাটককে করেছেন দ্রুতগতি। নাট্যকার হিসাবে মন্মথ রায় নিজের জন্য একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন। মন্মথ রায় বাংলা নাটকে যে দিকগুলো নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন তা হল–পুরানো উপাদানগুলোর আধুনিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার, নাটকের সময়সীমা কমিয়ে আনা, তৎকালীন সময়ের পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটকগুলোতে প্রচলিত ভাবহীন চরণের পরিবর্তে নাটকে সরল–কাব্যিক এবং নাটকীয়তাপূর্ণ গদ্যের ব্যবহার, চরিত্রগুলোর শক্তিশালী রূপায়ণ এবং তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান, চমকপ্রদ এবং উত্তেজনাপূর্ণ নাট্যমুহূর্তগুলির গতিশীল আবেগঘন টানাপোড়েন ও আকর্ষণীয় চূড়ান্ত পরিণতি, অতিবাস্তব তার পরিবর্তে বাস্তব পরিস্থিতির উপর গুরুত্ব প্রদান, সংক্ষিপ্ত-দ্বিধাহীন-মর্মস্পশী সংলাপ, নাটকে যুগের প্রতিফলন ও নির্দিষ্ট অভিপ্রায়ের প্রতিফলন ঘটানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল।

তিনি প্রচলিত নাট্যরীতিই ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ পঞ্চাঙ্ক অঙ্কের অন্তর্গত দৃশ্যবিভাগ, বিস্তারিত মঞ্চনির্দেশ, নাট্যক্রিয়া এবং চরিত্রের বাহ্য চলাফেরা, আচরণ এবং মানসিক ভাবের অভিব্যক্তি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এই বিবৃতিমূলক অংশ নাটকের মধ্যে অনেকখানি স্থান জুড়ে থাকায় নাটকের মধ্যে অনেক স্থানে ঔপন্যাসিক রসের সঞ্চার হয়েছে। অবশ্য নাট্যপাঠকই সেই রস আস্বাদন করতে পারেন। নাট্যরস সৃষ্টিতে নাট্যকারের তুলনা নেই। পরিস্থিতির দ্রুত ও আকস্মিক পরিবর্তন, ঘনীভূত সাসপেন্স সৃষ্টি করে হঠাৎ এক অভাবনীয় মোচড়ের মধ্য দিয়ে ঘটনাকে নতুন খাতে প্রবাহিত করে দেয়া এ সবের মধ্য দিয়ে তার নাটকে নিরন্তর গতি অব্যাহত থাকে। দর্শকের মনে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম

নেই, সেখানে অবিরাম আশা-আশঙ্কার দোলায়িত লীলা রয়েছে। আবেগে থরোথরো কাঁপে তাঁর সংলাপ। নাট্যকারের যৌবনের উষ্ণ রক্তধারা নাটকে সঞ্চারিত, সেখানে সুরাসুরের মন্থন চলেছে। সেই মন্থনে উঠছে অমৃত ও বিষ। প্রেমের অমৃতময় স্পর্শ এবং আসক্তির বিষজ্বালা, প্রচণ্ড শক্তি ধ্বংসলীলা এবং ত্যাগ ও আত্মদানের মহিমা। নাট্যকার দূরতর জগতে এক বিস্তারিত ভয় ও বিস্ময় জাগানো পরিবেশের মধ্যে আমাদের নিয়ে গেছেন। সেখানে প্রমিথিউসের মতো চাঁদ সদাগর নিষ্ঠুর দেবশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে, টাইটানের মতো বৃত্রাসুর তার মহাবলের পরাক্রম দেখাচ্ছে, স্যামসনের মতো কংস সব কিছু ভেঙে চুরমার করে দিতে চাইছে, জুলিয়াস সিজারের মতো অশোক সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্নে মেতে আছেন। দূর অতীতের এই শক্তি ঐশ্বর্য ও বিস্ময়কর জীবনলীলা ফুটিয়ে তোলার জন্য সংস্কৃত ভাষার শক্তি ও সম্পদ এবং তার কবিত্ব রঞ্জিত সৌন্দর্যময় রূপ চাই। মন্মথ রায়ের সংলাপের ভাষায় এই শক্তি ও সৌন্দর্যের সার্থক সমাবেশ ঘটেছে। সংলাপে শব্দ ও বাক্যাংশ প্রয়োগে নাটকীয় গতিবেগ সৃষ্টির সফল প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

তৃতীয় অধ্যায় ॥ ৩য় পরিচ্ছেদ

একাঙ্ক নাটকের উৎস ও পরিচিতি

য়ুরোপখণ্ডে একাঙ্কিকা প্রথমে দেখা দেয় খুব সম্ভব জার্মানীতে–নাট্যকার ও বিখ্যাত সমালোচক লেসিঙের কলমের মুখে। তাঁর দি জুস কে (প্রকাশ ১৭৫৫–) য়ুরোপের প্রথম একাঙ্কিকা[৫০] বলা যেতে পারে। তারপর "Little Theatre" আন্দোলনের সঙ্গে একাঙ্কিকা নাটিকা স্বতন্ত্র মর্যাদা পায় ও নাট্যের আসরে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

একাঙ্কিকার বিলক্ষণ লক্ষণ শুধু যে একটি অঙ্কের মধ্যেই আছে তা নয় এর প্রধান লক্ষণ-লক্ষ্যের এককতায়, আয়তনের স্বল্পতায় এবং ঘটনার সংক্ষিপ্ততায়। একটি অঙ্কের মধ্যে দৃশ্যের পর দৃশ্যের যোজনা করে পূর্ণাবয়ব নাটক রচনা করলেই একাঙ্কিকা হবে না, একাঙ্কিকা হতে হলে –"It can stress but one aspect, character, action, background, emotion, of...। Dictionary of world Literature-এ এই কারণেই বলা হয়েছে "the usual one-act piece is to the play as the short story is to the novel".[৫১]

পূর্ণাবয়ব উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের যে সম্পর্ক নাটকের সঙ্গে স্বাভাবিক একাঙ্কিকার সেই সম্পর্ক। এই প্রসঙ্গে ক্লেটন হ্যামিল্টনকৃত ছোটগল্পের লক্ষণটি স্মরণ করলে বোঝার পক্ষে কিছুটা সুবিধা হতে পারে। লক্ষণটি এই "The short story aims to produce a single narrative effect with the greatest economy of means that is consistent with the utmost emphasis"[৫২] – অর্থাৎ ছোটগল্পের (ক) উদ্দেশ্যে হবে একক খ) উপায় হবে খুব সংক্ষিপ্ত এবং (গ) সংবেদনা হবে খুব তীব্র। একাঙ্কিকাতেও লক্ষ্য হবে–অবিমিশ্র অর্থাৎ একক, উপায় হবে অবান্তর শূন্য ও অপরিহার্যটুকু এবং সংবেদনা হবে তীব্রসংবেদী। এই কারণেই একাঙ্কিকাতে পরিস্থিতিকে চরম উদ্দীপক করতে হয়,

চরিত্রকে করতে হয় একাধারে ব্যক্তি এবং প্রতিনিধি (individual and typical) এবং অসাধারণ অবস্থার সম্মুখীন অসাধারণ ব্যক্তি; চরিত্রের বিকাশ দেখাবার সুযোগ থাকে না বলে চরিত্রের প্রকাশ (portrayal) মুখ্য উদ্দেশ্য হয়। আর অল্পের মধ্যে জীবন সত্যের গভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি লক্ষ্য হয়ে থাকে। পরিস্থিতি, চরিত্র, সংবেদনা, উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিষয়ে যে একাঙ্কিকা উল্লিখিত আদর্শের যত নিকটবর্তী হয় তা তত প্রশংসনীয় সৃষ্টি আর যা যত দূরবর্তী তা তত দূষ্য।

আধুনিককালে একাঙ্ক নাটিকা বা একাঙ্কিকা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। দৃশ্যকাব্য হিসেবে বিশ শতকে এর চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে; আবার শ্রব্যকাব্যরূপেও[৫৩] (Reading drama)–এর সমাদর কিছু কম নয়। নাটকের এই বিশেষ রূপটি সম্পর্কে আমাদের ধারণা কিন্তু তেমন স্বচ্ছ নয়। নামেই বোঝা যায় একাঙ্ক নাটিকায় অঙ্ক একটি মাত্রই থাকবে এবং এর ঘটনা স্বল্প আয়তনে সমাপ্তি লাভ করবে। এ হলো একাঙ্ক নাটিকার নিতান্তই বহির্লক্ষণগত কথা। তথাপি এ কথারও মূল্য আছে। এর আন্তর্লক্ষণকে বুঝে নিতে না পারলে এর স্বরূপ স্পষ্ট হবে না। একাঙ্কিকায় জীবনেরই রূপ প্রতিবিম্বিত হয়; কিন্তু অল্প আয়তনে জীবনের সামগ্রিক রূপ উপস্থাপিত করা যায় না। তাই এতে জীবনের খণ্ডরূপের মধ্য দিয়ে পূর্ণরূপে ব্যঞ্জনা-সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। জীবনের বিশেষ একটি গূঢ়–গভীর দিককে তুলে ধরে তারই সাহায্যে সমগ্রতার আভাস দেওয়াই এর কাজ। ঘটনাকে বহুশাখায়িত করার অবকাশ এখানে নেই, নানা চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে চরিত্র-বিশ্লেষণে অতিরিক্ত মনঃসংযোগেরও এখানে সুযোগ নেই। অথচ কল্পনায় অনুভূত জীবন-অভিজ্ঞতার একটি রূপকে জীবন্ত করে তুলতে হবে–জীবন সমগ্রতার ইঙ্গিত দিতে হবে। এই জন্যে এর সংলাপকে করতে হয় তীব্র গতিময়, তীক্ষ্ণ, ঋজু ও

ইঙ্গিতধর্মী। কয়েকটি, স্বল্পচরিত্রের বিশেষত একটি বা বড় জোর দুটি চরিত্রের দিকে এখানে নাট্যকারকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। অবান্তর ঘটনা বা দৃশ্যপটের বাহুল্যে একে ভারাক্রান্ত করা চলে না। একাঙ্ক নাটিকার সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত স্বল্পায়তন ঘটনার একটা একমুখী দ্রুত ধাবমানতা থাকে, একটা প্রবল গতিবেগ ঘটনাকে পরিণামের দিকে নিয়ে যায়। অন্যান্য নাটকেও এই গতিবেগ অবশ্যই থাকে, কিন্তু একাঙ্কের মতো তা লক্ষণীয় নয়। অন্যান্য নাটকে যেমন ঘটনার আদি, মধ্য ও অন্ত্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে, এখানে তা থাকলেও তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। একাঙ্কিকার সম্পর্কে যে কয়েকটি কথা বলা হয়েছে, তাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, আধুনিককালের ছোটগল্পের সঙ্গে এর নানা দিক থেকে সাদৃশ্য আছে। ছোটগল্পেও একটি মাত্র অভিজ্ঞতা-জাত জীবন সত্যকে একটিমাত্র ঘটনা বা চরিত্রকে আশ্রয় করে রূপ দেওয়া হয়। এখানে স্বল্প আয়তনে ঘটনার বাহুল্য বা চরিত্র সমাবেশের আধিক্য থাকে না। উদ্দেশ্যের একমুখিনতা ও আবেদন সৃষ্টির এককতায় একাঙ্কিকার মতোই এ বিশিষ্ট।"Singleness of aim and singleness of effect are, therefore, the two great canons by which we have to try the value of a short story as a piece of art."–An Introduction to the study of Literature."[৫৪]

একাঙ্ক নাটিকায় স্থান, কাল ও ঘটনাগত ঐক্য রক্ষা করতে পারলে একাঙ্ক নাটিকার গঠন যেমন সুদৃঢ় হয় তেমনি এর লক্ষ্য, গতি ও আবেদন অত্যন্ত প্রশংসনীয় হয়ে ওঠে। ঘটনা-ঐক্য (Unity of action) কিংবা ভাবগত ঐক্য (Unity of Impression) সব নাটকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একাঙ্কিকায় এ ঐক্য তো অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। প্রশ্ন-স্থান ও কালের ঐক্য নিয়ে। একাঙ্ক নাটিকার স্থান, কাল

ও ঘটনা ঐক্যকে মান্য করেই নাট্যকারকে অগ্রসর হতে হবে। তবে যে-ক্ষেত্রে জীবন অভিজ্ঞতার সার্থক রূপায়ণে স্থান ও কাল ঐক্যকে নিখুঁতভাবে রক্ষা করা গেল না, অথচ এর অন্যান্য লক্ষণগুলি যতদূর সম্ভব উপস্থিত থেকে স্বল্পায়তনে ঘটনা–ঐক্য বা ভাব ঐক্যকে সুন্দরভাবে রক্ষা করেছে-সেই সব নাটিকাও একাঙ্কিকারূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

একাঙ্ক নাটিকা অভিনীত হলে তার সময়-সীমা কেমন হবে এ নিয়েও অনেক ভাবনা চলছে। সাধারণত এক ঘণ্টার মধ্যেই এর অভিনয় সমাপ্ত হয়ে থাকে। তার বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এ বিষয়ে কেউ কেউ বলেছেন একাঙ্ক নাটিকার অভিনয় বিশ মিনিট বা আধ ঘণ্টা হওয়া উচিত। কেউ বা বলেছেন, চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই এর অভিনয় শেষ করতে হবে। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হল যে, যেহেতু এ মিতায়তন এবং এর একটি বিশেষ লক্ষ্য আছে, তখন এক ঘণ্টার মধ্যে এর অভিনয় সম্পন্ন করা দরকার। মিনিট দিয়ে অঙ্কের হিসেবে এর সময়সীমা নির্দেশ করা ঠিক নয়।

একাঙ্ক নাটিকা হল এক অঙ্কের স্বল্পায়তন এমন একটি স্বল্পচরিত্র-বিশিষ্ট নাটিকা যাতে কল্পনায় অনুভূত, কোনো একটি চরিত্রের বিশেষ একটি দিক বা জীবনের কোনো একটি গভীর ভাব নাটকীয় গতিবেগযুক্ত হয়ে দ্রুত চূড়ান্ত মুহূর্ত সৃষ্টি করে দ্বন্দ্বাত্মক পথে দর্শকদের উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে চরম পরিণাম লাভ করেও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বৃত্তে একটি সমগ্র কার্যের ব্যঞ্জনা দেয়।[৫৫]

সবদেশে সবকালেই দেখা যায় বড় নাটকের সঙ্গে ছোট নাটকের বা নাটিকার প্রতি দর্শকদের আকর্ষণ রয়েছে। খ্রী: পূ: চতুর্থ শতকে গ্রীসে Satyr Play[৫৬] নামক এক শ্রেণির ছোট নাটিকার সৃষ্টি হয়। সেখানে গুরুগম্ভীর ট্র্যাজিডি নাটকের অভিনয় শেষে এই ধরনের হাল্কা নাটিকার অভিনয় হত।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগের শেষে ও রেনেসাঁসের প্রথম দিকে পাশ্চাত্যে ক্ষুদ্রকায় ফার্স জাতীয় নাটিকা ও ইন্টারলুড শ্রেণির নাটিকার অভিনয় হত, এগুলি এক অঙ্কের। অল্প সময়ের মধ্যে ও অল্প আয়াসে অভিনীত হতে পারে-এই প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে শুধু এগুলিই নয় অনেক আগে 'মিষ্ট্রি, 'মর‍্যালিটি' ও 'মিরাকল-প্লে'–এরও উদ্ভব হয়েছিল। মধ্যযুগে মিষ্ট্রি ও মিরাকল প্লে ,পঞ্চদশ শতকে মরালিটি প্লে এবং ষোড়শ শতকে ইন্টারলুড–এর উদ্ভব হয়েছিল। ষোড়শ–সপ্তদশ শতকে এক শ্রেণির অপেশাদার অভিনেতার দ্বারা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আয়তনে সংক্ষিপ্ত ফার্স-জাতীয় লোকনাট্যেরও অভিনয় হত। কিন্তু সপ্তদশ শতকে এই সমস্ত ছোট আয়তনের নাটিকাগুলোর দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। আবার অষ্টাদশ শতকে ফার্স জাতীয় রচনার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর সূচনা হয়। ঊনবিংশ শতকে 'কার্তেন রেইজার' নামে ছোট নাটিকা সমাদৃত হতে থাকে। অষ্টাদশ শতকের শেষ ও ঊনবিংশ শতকে অল্প কয়েকটি একাঙ্ক নাটিকা লেখা হয়েছে বটে, তবে প্রকৃতপক্ষে বিশ শতকেই এর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। মোট কথা, বিশ শতকের পূর্বে একাঙ্ক নাটিকার চাহিদা খুব বৃদ্ধি পায়নি। বহু অঙ্কের নাটকে বৈচিত্র্য আনার জন্যে কোনো বড় নাটকের পূর্বে বা পরে ছোট এক অঙ্কের নাটিকা বা ফার্স ঊনিশ শতকে বেশ চলছিল। বিশ শতকের প্রথম দিকে এদের অস্তিত্ব ছিল। সাম্প্রতিককালে থিয়েটার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানরূপে দেখা দিয়েছে। ফলে এই প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক সুবিধার কথা চিন্তা ক'রে তিন অঙ্কের বা চার অঙ্কের নাটক এখন বেশি সমাদৃত। তবে সন-তারিখের কথা মনে রেখে বলতে হয় অষ্টাদশ শতকের জার্মান নাট্যকার ও নাট্যতত্ত্ববিদ্ লেসিঙ এর লেখা 'Die Juden'-ই সর্বপ্রথম একাঙ্ক নাটিকা।[৫৭] ঊনিশ শতকে ইংল্যান্ডে 'কার্টেন রেইজার' বা পূর্বরঙ্গ-নাটিকাগুলি মূল নাটক আরম্ভের পূর্বে অভিনীত হত। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে

জেকবের কাহিনী অবলম্বনে লুইস এন পার্কারের নাট্যরূপ দেওয়া একাঙ্ক নাটিকাটি 'The monkeys paw' লন্ডনের ওয়েস্ট এন্ড থিয়েটারে খুব সাফল্য লাভ করে প্রচুর দর্শক সমাগম হয় ও মূল নাটকের অভিনয়ের সময়ে আসর প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে। এই সংবাদটি একাঙ্ক নাটিকার ইতিহাসে স্মরণীয় হলেও এর পূর্ণ প্রতিষ্ঠালাভের সময় তখনো আসে নি। বিভিন্ন সৌখিন নাট্যগোষ্ঠী অগ্রসর হয়ে এই একাঙ্ক নাটিকার অভিনয়ে অংশগ্রহণ না করা পর্যন্ত এর সমৃদ্ধি ঘটতে পারে নি। ঊনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকে ধীরে ধীরে অনেক সৌখিন নাট্যগোষ্ঠী গড়ে উঠতে থাকে।

বাংলা নাটক ঊনবিংশ শতকে সৃষ্টি হলেও এবং একাঙ্কের ফার্স বাঙলা নাটকের আদিপর্বের নাট্যকার রামনারায়ণের হাতে পাওয়া গেলেও ঠিক তাকে একাঙ্কিকা বলা চলে না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশ ঘোষ, অমৃতলালের কিছু কিছু রচনা একাঙ্কের হলেও যাকে আমরা বিশিষ্ট অর্থে একাঙ্ক বলছি তা সেগুলি নয়। তথাপি এগুলিতে যথার্থ একাঙ্ক নাটিকার পূর্বাভাস মেলে; অথবা কোনো কোনটিতে এর অনেক লক্ষণও আছে। বাঙলা একাঙ্ক নাটিকার যথার্থ সৃষ্টি ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক'-এ। বিশ শতকের বাঙলা একাঙ্কিকা হিসেবে এটির স্থান সর্বপ্রথম। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে গভীর জীবনবোধময় শিল্পসমৃদ্ধ একাঙ্কিকা সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। আধুনিক জীবনযন্ত্রণার পরিচয় না থাকলেও রবীন্দ্রনাথের *'বিনি পয়সার ভোজ'* এবং *'খ্যাতির বিড়ম্বনা'*-কে সার্থক একাঙ্ক নাটিকা বলা চলে। দ্বিজেন্দ্রলালের *'পুনর্জন্ম'*ও সার্থক সৃষ্টি। মন্মথ রায় নতুনভাবে নাটকের এই শ্রেণিটিকে পুষ্ট করেছেন এবং এ শ্রেণির বহু নাটিকা লিখেছেন। 'একাঙ্কিকা' নামটি তাঁরই দেওয়া এবং সচেতনভাবে নাটকের এই শাখাটির সমৃদ্ধির জন্যে তাঁর মতো পূর্বে কেউ প্রয়াস করেন নি। তাঁর

'একাঙ্কিকা' গ্রন্থটি (১৯৩১) আটটি নাটিকার সংকলন। এটি পরে একুশটি নাটিকার বৃহত্তর সঙ্কলন গ্রন্থ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর 'নব-একাঙ্ক' (১৯৫৮) 'ফকিরের পাথর' (১৯৫৯) প্রভৃতি গ্রন্থে প্রথম শ্রেণির বহু একাঙ্কিকার সাক্ষাৎ মেলে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পরিমল গোস্বামী, বিধায়ক ভট্টাচার্য, শিবরাম চক্রবর্তী, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ নাট্যকারগণও অনেক একাঙ্ক লিখেছেন। গণনাট্যের লেখকগণও এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ নন। তুলসী লাহিড়ী, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় বৈরাগী, গিরিশঙ্কর, গঙ্গাপদ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, কিরণ মৈত্র, রমেন লাহিড়ী, উৎপল দত্ত, জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নাট্যকার এ ধারায় নাট্য-রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।[৫৮]

একাঙ্ক নাটকের সংজ্ঞা

সাহিত্যের কোনো ধারার সংজ্ঞার্থই সর্বসম্মত নয়। একাঙ্ক নাটকের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিয়েও বিংশ শতাব্দীতে যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তি তাঁদের নিজস্ব মত ও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। আবার সংজ্ঞা দেশ ও কালভেদে সদা পরিবর্তনশীল। সংস্কৃত একাঙ্কগুলি কঠিন নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল এবং ঐ সংজ্ঞার্থের রূপান্তর আজ অনিবার্য কারণেই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। সাধারণতভাবে এক অঙ্কের নাট্যকাহিনীই ছিল সংস্কৃত একাঙ্ক নাটকের সাধারণ লক্ষণ। বর্তমান যুগে এই সংজ্ঞার্থের ব্যাপ্তি ঘটেছে। বাহ্য লক্ষণের সঙ্গে অন্তর্লক্ষণের বিশেষ সমন্বয় ঘটেছে। আমরা বর্তমান একাঙ্ক নাটকের সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ের আগে কয়েকজন পূর্বসূরী একাঙ্ক নাটকের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন বা তার স্বরূপ চিহ্নিত করেছেন তা উল্লেখ করছি :

The one act form must, as it were, be presented in a æsingle sitting" it must start at the beginning with certain definite elements and pass quickly and effectively to the end without a half on a degression." [৫৯]

A one act play deals with a single dominant dramatic situation and aims at producing a single effect, though the method used may vary greatly from, tragedy to farce, according to the nature of the effect desired.[৬০]

একাঙ্ক নাটিকা হচ্ছে সেই শ্রেণির দৃশ্যকাব্য যার 'কার্য' একটি মাত্র অঙ্কের পরিসরে এবং স্বল্পায়তনে উপস্থাপিত হয়।

'ঘটনার অবিচ্ছিন্নতা, ভাবগত অখণ্ডতা, ঘনীভূত রসময়তা,–এইগুলিই একাঙ্ক নাটকের অপরিহার্য লক্ষণ'।

একটি মাত্র অঙ্কের পরিসরে সমাপ্য এই শ্রেণির নাটকে সংক্ষিপ্ত কালসীমায় বিধৃত জটিলতাবিহীন এমন একটি কাহিনী বা পরিস্থিতি রূপায়িত হয়, যাহাতে দর্শক এক অখণ্ড অভিজ্ঞতার স্বাদ পায়।[৬১]

নাটকের অনেকগুলি সাধারণ ধর্ম (যেমন: অবিচ্ছিন্নতা, পরিমিত আয়তন, দ্বন্দ্ব, গতি, ভাব-অখণ্ডতা, ঘনীভূত রসময়তা এবং স্বয়ং সম্পূর্ণতা) একাঙ্ক নাটকে অবশ্যই থাকবে। অবশ্য এই সাধারণ ধর্মগুলির প্রত্যেকটিকে একাঙ্ক নাটকের একক্ত্ব ও ত্বরণের সহায়ক হতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায় ॥ ৪র্থ পরিচ্ছেদ

বাংলা একাঙ্ক নাটক ॥ মন্মথ রায়

মন্মথ রায় বাংলা নাট্যসাহিত্যে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁকে একাঙ্ক নাটকের স্রষ্টা বলা হয়। তিনি নাটককে চিরাচরিত ধারা থেকে একাঙ্ক নাটককে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে রচনা করেন। মন্মথ রায় রচিত একাঙ্ক নাটকের সংখ্যা ২৭৬টি। একাঙ্কিকাগুলো চারটি সংকলন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত–'একাঙ্কিকা, 'নবএকাঙ্ক, 'ফকিরের পাথর,ও 'বিচিত্র একাঙ্ক'। প্রথম পর্বের কালসীমা ১৯২৩ থেকে মোটামুটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল পর্যন্ত বিস্তৃত, বিষয়বস্তুর দিক থেকে একান্তভাবে ভারতীয়। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক উপাদান ও চরিত্র অবলম্বনে রচিত একাঙ্কিকাগুলোতে সংরক্ত প্রবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতের এমন রক্তাক্ত চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে, যার তুলনা কোন বাংলা নাট্য সৃষ্টিতে মেলে না; ইংরেজি নাটক বিশেষ করে–শেক্সপীয়র, মার্লো, ওয়েবস্টার প্রমুখ নাট্যকারের নাটকে প্যাশানের কারারুদ্ধ মানবচিত্তের আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গিরণের যে চিত্র পাই তার সঙ্গে এই একাঙ্কিকাগুলোর তুলনা করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ–'রাজপুরী, 'বিদ্যুৎপর্ণা, 'লক্ষহীরা' প্রভৃতি নাটকের কথা উল্লেখ করা যায়।

১৯৫৬-১৯৬৬ সাল অবধি দ্বিতীয় পর্যায়ের একাঙ্ক নাটকগুলোতে তত্ত্বকথা প্রাধান্য পেয়েছে।[৬২] শ্বাসরুদ্ধ আবেগাতিশয্যের স্থলে এই পর্বের নাটিকায় বিয়ষবস্তুর প্রতি নাট্যকারের বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহ দৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। রোমান্টিক আবেগমুক্তির প্রয়াস এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

তৃতীয় পর্যায় ১৯৬৬ সালের পর নাট্যকারের জীবন সায়াহ্নকাল অবধি বিস্তৃত। সামাজিক পট পরিবর্তন, বিশেষ করে স্বাধীনতা উত্তর কালের জীবন অভিজ্ঞতা, বিষয়বস্তুর মধ্যে পরিবর্তন এনেছে। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শকে সমাজজীবনের সাফল্যের স্বর্ণ-শিখর প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্য সমাজে

এর ব্যতিক্রম সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন নাট্যকার এবং এই বিচ্যুতিকে শ্লেষে, উপহাসে, ব্যঙ্গে বারংবার বিদ্ধ করেছেন। এই পর্যায়ে শিল্প-রীতিতেও একটা ঋজু বলিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে। শিল্পসৃষ্টির শেষ দিন পর্যন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঋজু কঠিন ভঙ্গিটি নাট্যকার পরিহার করেন নি। ফলে সৃষ্টিতে বৈচিত্র্যের অভাব ঘটেনি। এই পর্যায়ে নাট্যকার গভীরভাবে জীবনমনস্ক। সমালোচনার দৃষ্টিতে সমাজকে অবলোকন করেছেন বলেই স্বল্পায়ত নাটকেও শ্লেষাত্মক মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। সংলাপে মননশীলতা অসাধারণ উইট সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে।

একাঙ্ক নাটকের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে নাট্যকার প্রথম থেকেই কোন বাধা বন্ধন মানেন নি। সাধারণ জীবনের বিভিন্ন মুহূর্ত–সুখ, দুঃখ, মৃত্যু, জন্ম, হিংসা, দ্বেষ এক কথায় জীবনের বহু বিচিত্র ভাবগুলো আশ্চর্য দক্ষতায় পরিস্ফুট করেছেন। নাট্যরস পরিবেশনার দিক দিয়েও তিন পর্বে তিন জাতীয় নাট্যরসের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথম পর্বে প্রাধান্য পেয়েছে এক জাতীয় ট্র্যাজিক রস। মন্মথ রায়ের নাটকে প্রধানত হরর ট্র্যাজেডি ও প্যাথেটিক ট্র্যাজেডির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের নাটিকাগুলোতে নৈতিক সমস্যার একটা ভিয়েন দিয়ে নাটকগুলোকে কিছুটা দার্শনিক জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর হিসাবে গ্রহণ করেছেন, যদিও দার্শনিক তত্ত্বকথা নিয়ে মন্মথ রায় কোনদিনই তেমন গভীরভাবে নাড়াচাড়া করেন নি, বরঞ্চ তত্ত্বকথাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর তৃতীয় পর্যায়ের একাঙ্কিকাগুলোতে এক অভিনব কৌতুকরসের স্বাদ পাওয়া যায়। তৃতীয় পর্যায়ের একাঙ্কিকার অভিনয়যোগ্যতা বেশ হ্রাস পেয়েছে। এগুলো ঘটনামুখ্য নাটিকা হয়ে উঠেছে। অভিনব নাট্য মুহূর্ত সৃষ্টি করে নাট্যকার দর্শক, প্রধানত পাঠকদের কৌতূহলাবিষ্ট করে রেখেছেন। এসব নাটিকায়

Dhaka University Institutional Repository

রোমাঞ্চকর ঘটনাসমূহ সংযোজিত হয়েছে–দৃশ্যের পর দৃশ্যের ভেতর দিয়ে পাঠককে রুদ্ধশ্বাসে পরিণতির দিকে অনিবার্য গতিতে অগ্রসর হতে হয়। রোমাঞ্চকর ঘটনা-প্রবাহের সঙ্গে নাটকীয় চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের যে বিশ্লেষণ তাঁর পূর্বতন পর্বের একাঙ্কিকায় সুলভ, এই পর্যায়ে তার দৃষ্টান্ত হ্রাস পেয়েছে। আমরা পর্যায়ক্রমে উল্লেখযোগ্য নাটকের বিশ্লেষণ তুলে ধরছি। উল্লেখযোগ্য পচিঁশটি একাঙ্ক নাটকের আলোচনা নিম্নরূপ:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় মন্মথ রায় হোস্টেলের ছাত্রদের অভিনয়ের জন্য **'মুক্তির ডাক'(১৯২৩)** নাটকটি লিখেছেন। ১৯২৩ সালের ২৫শে ডিসেম্বর 'স্টার' থিয়েটারে অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় এ নাটকটি অভিনীত হয়। প্রথমে এর নাম ছিল 'অম্বা'।[৬৩] নাটকটি অভিনয়ে সাফল্য লাভ না করলেও গুণীজনের প্রশংসা আদায় করে নেয়। নাটকে পুরুষ চরিত্র-৪টি, স্ত্রী চরিত্র-২টি।

একটি বৌদ্ধ আখ্যায়িকা নাটকটির উপজীব্য। মগধাধিপতি বিম্বিসারের প্রণয়িনী বারাঙ্গনা শ্রেষ্ঠা অম্বার প্রতি শ্রেষ্ঠী সুন্দরক আকৃষ্ট হয়। সে নিজের সুন্দরী স্ত্রী পদ্মাকে অবহেলা করে। এদিকে পদ্মা পিতার সম্পদ লাভ করে। তখন সুন্দরক পদ্মার কাছে অম্বার দর্শনীবাবদ দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা চায়। ইতোমধ্যে অম্বা সুন্দরকের গৃহে এসে হাজির হয়। পদ্মা তাকে দেখে ক্ষিপ্ত হয়। সুন্দরক তার প্রাসাদ-ভবন অম্বাকে দান করে পদ্মাকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করে। বিম্বিসার অম্বার সন্ধানে সেই প্রাসাদে এসে হাজির হন। পদ্মা তাঁর কাছে বিচার প্রার্থনা করেন। বিম্বিসার বিচারের জন্য তাঁর রাজদণ্ড অম্বার হাতে

তুলে দেন এবং পদ্মাকে আশ্রয় দিতে চেষ্টা করেন। রাজদণ্ড হাতে নিয়ে যখন ঈর্ষা কাতর অম্বা পদ্মার ছিন্নশির সুন্দরককে দেওয়ার আদেশ করে তখন বিম্বিসার অম্বাকে জানান পদ্মা বিম্বিসার ও অম্বার অবৈধ সন্তান। অম্বার প্রাক্তন স্বামী সুচিত্রের গৃহে ধাত্রীর কাছে সে মানুষ হয়। সুচিত্র সুন্দরকের সঙ্গে পদ্মার বিবাহ দিয়ে নিজে বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়ে যান। অনুতপ্ত অম্বা অবশেষে ভগবান বুদ্ধের শ্রীচরণে আশ্রয় নিয়ে তার যথাসর্বস্ব সংঘে দান করেন। বুদ্ধের প্রবেশের সাথে সাথে সমস্ত নাটকীয় সংঘাতের সমাপ্তি ঘটে।

যে-কোন নাট্যকাহিনী কতকগুলো দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের সমষ্টি নিয়ে গড়ে ওঠে। এই দ্বন্দ্ব বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের। দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাত যত তীব্র হয়, নাট্যপ্রবাহের গতিপথ ততই জটিল ও আবর্তসঙ্কুল হয়ে ওঠে। 'মুক্তির ডাক' এক তীব্র গতিবেগ সম্পন্ন একাঙ্ক নাটক। এ নাটকে 'অম্বা' এক মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বক্ষত জটিল চরিত্র। মূলত অম্বাকে কেন্দ্র করেই নাট্যকাহিনী বিবর্তিত হয়ে পরিণতিতে পৌঁছায়। নানা ঘাত-প্রতিঘাত পার হয়ে অম্বার জীবনতরী শেষ পর্যন্ত অপার শান্তির রাজ্যে পৌঁছায়, যেখানে সে ঈর্ষা-অসূয়া-হিংসা-দ্বেষ-কলুষ মুক্ত এক সুনির্মল জীবনক্ষেত্র তার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। সমগ্র নাটকে আমরা পাই এক প্রখর ব্যক্তিত্বময়ী, সৌন্দর্যময়ী এক নারীকে 'doing and suffering something terrible," অথচ যার পরিণতি এক ক্ষমাসুন্দর মহিমার ব্যাপ্তিতে দীপ্যমান হয়ে আছে। নাটকের অন্যান্য চরিত্র যেমন, অম্বার কন্যা পদ্মা, পদ্মার স্বামী সুন্দরক, অম্বার প্রণয়ী রাজা বিম্বিসার, অম্বার স্বামী ও পদ্মার পিতা সুচিত্র। চরিত্রগুলো প্রধান চরিত্র 'অম্বা'র সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিকশিত হয়েছে। অন্যান্য চরিত্রগুলো নাটকের মূলকাহিনীকে পরিণতির

দিকে ধাবিত হতে সাহায্য করেছে। সার্বিকভাবে 'মুক্তির ডাক' নাটকটি একটি সার্থক একাঙ্ক হিসাবে মর্যাদার দাবিদার।

'মুক্তির ডাক' নাটকটি মন্মথ রায়ের প্রথম নাটক। অথচ তিনি এতেও প্লট, চরিত্র, সংলাপ প্রভৃতির নির্মাণকৌশলে যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। এ নাটকে দ্যুতিময় সংলাপের কারুকার্যে রসঘন নাট্যমূর্তিটি উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাসিত হয়েছে, একথা বলা যায়। বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বনে প্রাচীন ভারতের পটভূমিকায় এ নাটকের বিবয়বস্তু ও চরিত্র সন্নিবিষ্ট, তাই তৎসম শব্দ বহুল নির্মিত সংলাপে নাট্যকার সার্থকভাবে পরিবেশ ও চরিত্রের গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টিতেও এ সংলাপ যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে।

'মুক্তির ডাক' ট্র্যাজেডি লক্ষণাক্রান্ত নাটক। এ নাটকের বৃত্ত এক গুরুতর সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সেই সমস্যা ক্রমশ আরো জটিল আকার ধারণ করে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। সুন্দরক ও পদ্মা–স্বামী-স্ত্রী মূল সমস্যার সূত্রপাত তাদের কেন্দ্র করেই। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অম্বা, বিম্বিসার, সুচিত্র প্রভৃতি পাত্রপাত্রী। চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে ট্র্যাজেডির বীজ সূচিত হয়েছে। সুন্দরকের নির্লজ্জ লাম্পট্যপ্রিয়তা তার জীবনকেও বৃন্তচ্যুত করেছে। সুন্দরদেহী এই শ্রেষ্ঠী যুবক লাম্পট্যের মনোভাব নিয়ে এক নিশীথে গোপনে পদ্মার শয়নগৃহে প্রবেশ করে ধরা পড়ে জীবনমৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল। তার সুন্দর মুখশ্রী দেখে পদ্মার ভালো লাগে। ফলে পিতাকে রাজি করিয়ে সে সুন্দরকের প্রাণরক্ষা ও তাকে বিবাহ করে। অথচ অকৃতজ্ঞ এই পাষণ্ড পদ্মাকে কোন দিন ভালোবাসেনি–তার লক্ষ্য পদ্মার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধনরাশি। পত্নীকে উপেক্ষা, গণিকা-মত্ততা, অম্বাকে তুষ্ট করার

মানসিকতার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি পদ্মার জীবনেও ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের সূচনা করে। বিম্বিসারের সক্রিয়তাও এই বিপর্যয় সৃষ্টিতে যথেষ্ট দায়ী। অবশেষে ভগবান তথাগতর করুণাধর্মের প্রভাবে তারা এক পরম শান্তির তীর্থপথে যাত্রা করেছে। তাই কাহিনীর করুণ রস শেষ পর্যন্ত শান্ত রসের মহাসঙ্গমে পরিণত হয়েছে।

কাল্পনিক বৌদ্ধ আখ্যায়িকার পরিমণ্ডলে মন্মথ রায় এই একাঙ্কটিতে নারীত্ব সম্পর্কে, নরনারীর প্রেম সম্পর্কে নতুন জিজ্ঞাসার সূত্রপাত করেছেন। বিবাহিত প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কের বাইরের প্রেম সম্পর্কে এক নতুন মূল্যায়ন ঘোষণা করে। পাশাপাশি নারীর প্রেমাকাঙ্ক্ষা, সতীত্ব, মাতৃত্ব এবং নারীত্বের আদর্শ ও ধর্ম নিয়ে নাটকীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছেন। অম্বার প্রেম, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নারীত্ব সম্পর্কে তার অভিনব জীবন জিজ্ঞাসা চরিত্রটিকে আধুনিক করে তুলতে সাহায্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে নাট্যকার এ নাটকে সতীত্বের চেয়ে নারীত্বকে বেশি মর্যাদা দিলেও সুস্থ সমাজ অনুমোদিত দাম্পত্য প্রেমের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব গোপন থাকেনি। বৌদ্ধ আখ্যায়িকার নাট্যরূপ দিতে গিয়ে নাট্যকার বহু ঘটনা এবং প্রসঙ্গ এনেছেন। ফলে অনেক সময় এইসব চরিত্র ও ঘটনা বাস্তবের কাছাকাছি পৌঁছতে পারেনি। এমনকি বহু ঘটনার ভিড়ে এর মূল কাহিনীবৃত্তকে অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। এ নাটকের গতিসঞ্চার করতে নাট্যকার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় দ্রুততা ও উত্তেজনামুখর নাট্যমুহূর্তের সৃষ্টি করেছেন। অতি আবেগমিশ্রিত যাত্রাধর্মী সংলাপের প্রাচুর্য কোনো কোনো চরিত্রকে কিছুটা অতিনাটকীয় করে তুলেছে। এত ঘটনা বাহুল্যের সমাবেশে যেন পঞ্চাঙ্ক নাট্যকাহিনী আভাসিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অতি দ্রুত ধাবমান ঘটনার মধ্যে দিয়ে জয়-পরাজয় ও মানব প্রকৃতির যে

Dhaka University Institutional Repository

দুর্জ্ঞেয় রহস্যলীলা এই একাঙ্কে প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে দিয়েই নাটকীয় উৎকর্ষ অভিব্যক্ত হয়েছে। শিল্পসম্মত বাংলা একাঙ্ক নাটকের সার্থক উদাহরণ হিসেবে তাই এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় **'লক্ষহীরা'(১৯২৬)** নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এ নাটকে চরিত্র চারটি–দুটি নারী, দুটি পুরুষ। এ নাটকে দেখি প্রচলিত কাহিনীর পটভূমিকায় জীবনসত্যের নিরূপণ। বারবণিতা লক্ষহীরা বিকৃত ব্যভিচারী সমাজের সত্যস্বরূপ উপলব্ধির পর ঘৃণা ও বেদনায় বারবিলাসিনীর জীবনকেই বরণ করে নেয়। যে সমাজ স্বামীর বিকৃত কামনাকে চরিতার্থ করবার জন্য স্ত্রীর দেহদানকে পতিভক্তি বলে দাবি করে, সেই জঘন্য সমাজের সঙ্গে কোন সম্পর্ক সে রাখতে চায়নি। যে দেহ বিলাসিনী লক্ষহীরার চরণ তলে সর্বস্ব দিয়ে রাজা ধন্য হন, সেই লক্ষহীরার রূপে কুষ্ঠব্যাধি আক্রান্ত দরিদ্র যুবকও কামার্ত হয়ে পড়ে। তার পতিব্রতা স্ত্রী অদিতি স্বামীর কামনাকে পরিপূর্ণ করার জন্য নিজের কেশ বিক্রি করে একশত স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করে, রাজনটী লক্ষহীরার প্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত হয়। সন্ন্যাসী চন্দন দত্ত অদিতির পতিভক্তি দেখে লক্ষহীরাকে ব্যাধিগ্রস্ত যুবকের কামনা চরিতার্থ করবার জন্য অনুরোধ জানায়। ঘৃণায় লক্ষহীরা তা প্রত্যাখ্যান করে। সমাজ অনুমোদিত বিবাহিত প্রেমের প্রতি সে তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করে, ব্যভিচারী সমাজের কুৎসিত রূপটি উপলব্ধি করে। এই সমাজ দেহের মূল্যেই নারী পুরুষের কাছে যুগ যুগ ধরে আদৃত হয়ে আসছে–এই মানবদণ্ডেই নারীকে বিচার করা হয়–জীবন থেকে উদ্ভূত এই গভীর আত্মজিজ্ঞাসায় এ নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে ! "এই তোমাদের সতী? এই সংসারের আদর্শ ?" প্রকৃত পতিব্রত্য কি ? এ সম্পর্কে নাট্যকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করেছেন। এ নাটকে নাট্যকার অত্যন্ত

দক্ষতার সাথে চারটি চরিত্রের মাধ্যমে সমাজের অভ্যন্তরীণ স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। এই নাটকীয়তা নাটকের নাট্যগুণকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। 'লক্ষহীরা' নাটকে বারবণিতা লক্ষহীরা প্রধান চরিত্র। মূলত নাট্যকার লক্ষহীরা চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করেছেন। সমাজে একশ্রেণির মানুষের লোলুপ কামনা-বাসনার কাছে পতিব্রতা স্ত্রী অদিতির অসহায়ত্ব নাট্যকারের সুদৃঢ় লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। আর তাই কুষ্ঠব্যাধি আক্রান্ত স্বামীর কামনা-বাসনা পরিতৃপ্ত করার জন্য স্ত্রী অদিতি আত্মত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হয় না। এই নাটকে সন্ন্যাসী চন্দন দত্ত অদিতির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। সন্ন্যাসী চন্দন দত্তের সমবেদনা যেন পাঠকের আর্দ্র অনুভূতিকে নাড়া দিয়ে যায়।

মন্মথ রায়েরই লেখা একটি ছোটগল্প পড়ে পরিচালক মধু বসু তাঁকে দিয়ে 'সি.এ.পি' (ক্যালকাটা অ্যামেচার প্লেয়ার্স)-র জন্য **'বিদ্যুৎপর্ণা'(১৯২৭)** নাটকটি লেখান। এই একাঙ্কটি 'ভারতবর্ষ' (১৩৩৪ আষাঢ়) পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। চারটি দৃশ্য সমন্বিত একাঙ্ক। মোট আটটি চরিত্র; পুরুষ-৫, নারী-৩।

এই নাটকের কাহিনী হিন্দু পুরোহিত ও বৌদ্ধ রাজার ধর্ম সংঘর্ষের পটভূমিকায় প্রেমের এক জটিল রূপায়ণ। হিন্দুধর্ম বিরোধী বৌদ্ধ রাজাকে হত্যা করার জন্য পুরোহিত মোহান্ত বেদে বেদেনীর অনাথা কন্যা বিদ্যুৎপর্ণাকে শৈশব থেকেই তিল তিল বিষ খাইয়ে বিষকন্যায় পরিণত করেন। এ কন্যার বিষ স্পর্শে মৃত্যু অবধারিত। একথা পুরোহিত মোহান্ত কেবল জানেন। বিদ্যুৎপর্ণার রূপের আকর্ষণে অনেকেই যারা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল সেই কামন্দক, শতযুদ্ধের বীর যুধাজিৎ–সবাইকে পুরোহিত মোহান্ত পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর শিষ্য ইন্দ্রজিৎ বিদ্যুৎপর্ণার প্রতি আকৃষ্ট একথা

Dhaka University Institutional Repository

জানার পর তিনি স্নেহবশত ইন্দ্রজিৎকে সে পথ থেকে ফেরাতে গিয়ে আবিষ্কার করেন যে বিদ্যুৎপর্ণার প্রতি তার নিজেরও আকর্ষণ বড় কম নয়। বিদ্যুৎপর্ণা ইন্দ্রজিৎকে সত্যি ভালবাসে। অথচ সে নিজের বিষাক্ত অস্তিত্বের কথা জানে না। এদিকে বৈষ্ণব-বিদ্বেষী সেই রাজা মোহান্তর নিমন্ত্রণে হৃষীকেশ মঠে আসেন। এক চরম মুহূর্তে বিদ্যুৎপর্ণার চুম্বনে ও আলিঙ্গনে তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় যে সে বিষকন্যা বিদ্যুৎপর্ণা তা বুঝতে পারে। ইন্দ্রজিৎকে সে দূরে সরিয়ে দেয়। নাটকের শেষে দেখা যায় পুরোহিত মোহান্ত বিদ্যুৎপর্ণার হাতে মন্দিরের বিগ্রহের ভার তুলে দেন। কারণ তখন সে যথার্থই সেবাদাসীতে পরিণত হয়েছে। এভাবেই নাটকের সমাপ্তি ঘটে।

এই একাঙ্কটিতে তীব্র উত্তেজনার চূড়ান্ত পরিণতিতে ট্র্যাজিক সমুন্নতি, পুরোহিতের ষড়যন্ত্র, বিদ্যুৎপর্ণার প্রতি তার কামনাজনিত অন্তর্দাহ, পরম স্নেহবশত ইন্দ্রজিৎকে রক্ষার জন্য পুরোহিতের আত্মিক দ্বন্দ্ব, বিদ্যুৎপর্ণার বিষাক্ত অস্তিত্বের কারণে সমগ্র নাটক জুড়ে গতিময় সংশয়ের দোলা নাটকটিকে সার্থক একাঙ্কের মর্যাদা দিয়েছে। নাটকে সংলাপ ব্যবহারে নাট্যকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সংলাপই এ নাটকের প্রাণ। পুরোহিত মোহান্ত যখন রাজার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন,

> ঐ রাজা অসংখ্য বিষ্ণুমন্দির ধ্বংস করেছেন। শত শত বৈষ্ণব পল্লী আগুনে পুড়িয়েছে। নিরীহ বৈষ্ণবদের ধরে নিয়ে গিয়ে ওর গৃহদেবতা করালী কালীর সম্মুখে পৈশাচিক উল্লাসে বলি দিয়েছে। ওকে তো কোনদিন দেখতে পাই না, দেখি শুধু ওর সৈন্যসামন্ত,শুধু ওর অত্যাচার। তাই ওকে নিয়ন্ত্রণ করে এনেছি–সামনা-সামনি দেখবো হাতের মুঠোর মধ্যে এনে, আজ আমি ওকে দেখবো।[৬৪]

আর তাই মন্দিরের মোহান্ত বিদ্যুৎপর্ণাকে দিয়ে বৈষ্ণব বিদ্বেষী রাজার চূড়ান্ত-সর্বনাশ করার উদ্যোগ নিতে দেখা যায়, মোহান্তের নির্দেশে বিদ্যুৎপর্ণা আগত রাজাকে নাচ–গানে মাতোয়ারা করে দেয়। রাজা বিদ্যুৎপর্ণার রূপ ও নাচ দেখে বিমোহিত হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে রাজা বিদ্যুৎপর্ণার কাছে নিজেকে সর্মপণ করেন। কিছুক্ষণ পরে বিদ্যুৎপর্ণা বিজয়ীর বেশে ছুটে এসে পুরোহিত মোহান্তকে জানায়, "রাজাকে আমি জয় করেছি। রাজাকে আমি জয় করেছি। শুধু জয়? পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে- একটি চুম্বনে, একটি আলিঙ্গনে রাজা লুটিয়ে পড়েছে।"[৬৫]

তখন মোহান্ত সবার কাছে প্রকৃত সত্য প্রকাশ করেন। বিদ্যুৎপর্ণাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ''তোমার আলিঙ্গনে বিষ, তোমার স্পর্শে বিষ-তুমি মূর্তিমতী মৃত্যু। দশ বৎসর ধরে গোপনে তিল তিল বিষ খাইয়ে রচনা করেছি যে সুদর্শন অস্ত্র, তুমি সেই সুদর্শনা-বিষকন্যা।"[৬৬]

নাটকের শেষাংশে মৃত রাজার সৈন্যরা যখন হৃষীকেশ মঠ ধ্বংস করতে চারদিকে প্রবল অত্যাচার, ধ্বংস, হত্যা, লুণ্ঠন শুরু করে দিয়েছে তখন পলায়ন উদ্যত বিদ্যুৎপর্ণা পুরোহিত মোহান্তের কাছে ফিরে আসে। পুরোহিত মোহান্ত সবাইকে অতি দ্রুত মন্দির ত্যাগ করতে বলে নিজে মন্দিরের বিগ্রহ বুকে আগলে বসে থাকেন। বিদ্যুৎপর্ণা বিগ্রহের ভার নিতে চাইলে কামনা-বাসনাযুক্ত মানুষের জন্য এ বিগ্রহ নয় বলে পুরোহিত মোহান্ত বিগ্রহের ভার দিতে অস্বীকৃতি জানান। বিদ্যুৎপর্ণা তখন বললেন,

বিদ্যুৎপর্ণা !! আমাকে কামনা করে–ইন্দ্রজিত কি শুধু একা?

মোহান্ত !! আর কে ? কে ? বিগ্রহের ভার আর কাকে আমি দিতে পারি–ভাবছি।

বিদ্যুৎপর্ণা !! মনের অজ্ঞাতে যে আমাকে কামনা করে ? কোন অঙ্গসজ্জা আমায় মানাবে–কোন রূপসজ্জা আমায় মানাবে না–কে সবচেয়ে বেশী ভাবে ? কেউ আমার পানে চাইলে–কেউ আমার সঙ্গে কথা বললে, তার মনে আঘাত লাগত–সে ক্ষেপে উঠত। আপনি জানেন, কে?

মোহান্ত !! আমি। কেন ? আর কেউ কি–না না এ দুঃসাহস ইন্দ্রজিতেরও ছিল না।

মোহান্ত !! (ক্রমশঃ জ্ঞান হতে লাগল। আপন মনে বলে যেতে লাগলেন) আমি–আমি! তাই তো ? সে কি তবে–সে কি তবে–

বিদ্যুৎপর্ণা !! রাত্রে ঘুমের ঘোরে আমার নাম–আমার কথা–কার মুখ থেকে–

মোহান্ত !! না– না–

বিদ্যুৎপর্ণা !! ঘুমের ঘোরে কে আমার নাম ধরে চিৎকার করে উঠতো–যে, পাশের ঘর থেকে ছুটে আসতাম আমি।

মোহান্ত !! আমি ! আমি! আমি! (তাঁর অবস্থা তখন অবর্ণনীয়)" [৬৭]

ড.অজিতকুমার ঘোষ এ নাটকটিকে শ্রেষ্ঠ একাঙ্কের[৬৮] মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। এ নাটকের পরিণতি অপূর্ব কাব্যময়। নাট্যকার একাঙ্ক নাটকের রূপ ও রীতি নিয়ে এ সময় থেকেই নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে শুরু করেছেন। পরবর্তীসময়ে নাট্যকার ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্সের জন্য ১৩৪৪ সালে নতুন করে এ নাটকটি লেখেন, এ নাটকটি পরিবর্ধনের ফলে চরিত্র সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। কাহিনীও পরিবর্তিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৯ই অক্টোবর ১৯৩৭ সালে ফার্স্ট এম্পায়ার মঞ্চে[৬৯] এ নাটক সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। মধু বসু পরিচালনা করেন। সাধনা বসু নৃত্য পরিচালনা করেন। সঙ্গীত অজয় ভট্টাচার্য, শিল্প নির্দেশক গীতা ঘোষ, মঞ্চাধ্যক্ষ সুশোভন বসু। ফার্স্ট এম্পায়ারে 'সি.এ.পি'(ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স)-র 'বিদ্যুৎপর্ণা' দেখে পত্রপত্রিকা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে।

'*আন্দবাজার পত্রিকা*' (১১-১০-৩৭) এ নাটক সম্পর্কে যে মন্তব্য করে তা নিম্নরূপ : "বিদ্যুৎপর্ণা' তাঁহাদের অপূর্ব কলাশক্তির আর একটি বিকাশ মাত্র।"

'*যুগান্তর*' পত্রিকায় নাটকটি সম্পর্কে লিখলো : "গ্রন্থকারের অপূর্ব সৃষ্টি। নাটকীয় ঘটনা সংস্থাপনায়, সংলাপ ও কল্পনার মনোহারিত্বে অভিনব।"[৭০]

নাট্যকার মন্মথ রায়ের কথায় জানা যায় 'বিদ্যুৎপর্ণা' অভাবনীয় সাফল্যের সাথে অভিনীত হওয়ায় প্রযোজক মধু বসু উৎসাহিত হয়ে তাদের পরবর্তী নাটকের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করেন।" সেই নাটক এই **'রাজনটী' (১৯৩৭)**। মোট দশটি চরিত্র–পুরুষ-৭, নারী-৩। নাটকের আখ্যায়িকাটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পর মণিপুরে যখন বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত হয়, এই নাটকের পটভূমি হিসেবে সেই সময়টিকে ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তিরোধানের পর ক্রমে যখন মণিপুরেও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত হয়–এই নাটকে বর্ণিত ঘটনাটি সেসময়ে সংঘঠিত বলে ধারণা করা হয়। মণিপুর রাজ্যের রাজপুত্র চন্দ্রকীর্তি রাজনটী মধুছন্দাকে ভালবাসে। মধুছন্দাও রাজপুত্র চন্দ্রকীর্তিকে ভালবাসে। কিন্তু ত্রিপুররাজকন্যার সাথে রাজপুত্র চন্দ্রকীর্তির বিয়ে ঠিক হয়েছে। ত্রিপুররাজকন্যার সাথে রাজপুত্র চন্দ্রকীর্তির বিয়েকে প্রভুপাদ কাশীশ্বর গোস্বামী সমর্থন জানায়। তিনি

শ্রীধাম নবদ্বীপ থেকে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পুণ্যপদধূলি বহন করে নিয়ে এসেছেন। এ অঞ্চলে একমাত্র এই মণিপুর রাজবংশই মহাপ্রভুর ধর্ম গ্রহণ করে। এদিকে মণিপুর রাজ্য অধিকারের জন্য ম্লেচ্ছ নাগারা সুযোগ খুঁজছে। আর তাই একদিকে মণিপুরের স্বাধীনতা রক্ষা, অন্যদিকে মহাপ্রভুর ধর্মপ্রচার সবকিছু নির্ভর করছে–ঐ এক চন্দ্রকীর্তির ওপর। সে যদি রাজনটী মধুছন্দাকে পাওয়ার জন্য সিংহাসন ত্যাগ করে তবে এ রাজ্য চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে। নাটকের শেষাংশে রাজনটী মধুছন্দা মণিপুর রাজ্যের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে যুবরাজ চন্দ্রকীর্তিকে ত্যাগ করেন। রাজনটী মধুছন্দার এই অভূতপূর্ব ত্যাগের গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রভুপাদ কাশীশ্বর গোস্বামী মধুছন্দার গৃহে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পুণ্যপদধূলি বিতরণের স্থান হিসাবে নির্বাচিত করেন। অচ্ছুত, সামাজিকভাবে অবাঞ্ছিত পতিত রাজনটী মধুছন্দা পুণ্য নারীরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠেন। প্রভুপাদ কাশীশ্বর গোস্বামীর অনুরোধে রাজনটী মধুছন্দা যুবরাজ চন্দ্রকীর্তিকে ত্যাগ করেন। মধুছন্দা যখন প্রভুপাদ কাশীশ্বর গোস্বামীকে বললেন,

> তুমি এখান থেকে চলে যাও। আমার যা বলবার ছিল আমি বলেছি। সে আমায় যে সম্মান দিয়েছে, সে সম্মান স্বপ্নাতীত! আমি তাঁর প্রিয়া–আমি তাঁর বধূ–আমি তাঁর ছায়া। জীবনে যা কখনও পাইনি–কখনও পেতাম না–সে দিয়েছে আমায় সেই প্রেম। প্রেমের সেই শ্রদ্ধা। তাকে ত্যাগ করব আমি?[৭১]

রাজনটী মধুছন্দার আবেগ তাড়িত কথার উত্তরে কাশীশ্বর গোস্বামী বললেন,

তুমি তাকে কখনো ত্যাগ করবে না, করতে পারো না–আমি জানি। কিন্তু তুমিই তাকে ত্যাগ করবে, যখন বুঝবে যে–সে ত্যাগেই তাঁর কল্যাণ তাঁর মঙ্গল। ত্যাগ করবে তুমিই তাকে প্রথম। সিংহাসন তাকে চায়। সে যদি তোমার জন্য সিংহাসন ত্যাগ করে, ত্রিপুরার রাজদূত এখনি মণিপুর আক্রমণ করবে–ওদিকে ম্লেচ্ছ নাগারা মণিপুর অধিকারের জন্য সর্বদাই সুযোগ খুজঁছে। মনিপুরের স্বাধীনতা, মহাপ্রভুর ধর্মপ্রচার, সব কিছু–সব কিছু নির্ভর করছে–ঐ এক চন্দ্রকীর্তির ওপর। সে যদি সিংহাসন ত্যাগ করে সব গেল।[৭২]

অবশেষে রাজনটী মধুছন্দা যুবরাজ চন্দ্রকীর্তিকে ত্যাগ করলেন। কাশীশ্বর গোস্বামী মধুছন্দার এই আত্মত্যাগে মুগ্ধ হয়ে বললেন,

‘‘তোমার মহত্ত্ব তোমার আত্মোৎসর্গ, আর কেউ না জানুক–আমি জানি, আজ আমার চোখে তুমি দেবী। আজ সারাটি দিন–শুধু তোমারই কথা ভেবেছি। মহাপ্রভুকে কি মহাভিক্ষা তুমি দিয়েছ। তুমি আমায় অভিভূত করেছ। আজ আমার কেবলই মনে হচ্ছে সংসারের পঙ্ক থেকে ঊর্ধ্বে উঠেছ, তুমি একটি বিকশিত পদ্ম। আজ বুঝেছি সংসারের মরুভূমিতে কত আরাধনায় সে পদ্মটি ফুটেছিল–আমি তাকে অকালে দগ্ধ করেছি।”[৭৩]

এরপর রাজনটী মধুছন্দা যুবরাজ চন্দ্রকীর্তি এলে তাকে ফিরিয়ে দেয়। যুবরাজ চন্দ্রকীর্তি অপমানিত, ক্ষুব্ধ হয়ে রাজনটী মধুছন্দাকে একঘরে করে নির্বাসন দিলেন। যদিও নাটকের শেষাংশে যুবরাজ চন্দ্রকীর্তি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। এর পর রাজনটী মধুছন্দা ও যুবরাজ চন্দ্রকীর্তি উভয়ে প্রভুপাদ

কাশীশ্বর গোস্বামীর কাছে বৈষ্ণব মতে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। প্রভুপাদ কাশীশ্বর গোস্বামী ধর্মের পথে, কল্যাণের পথে যুবরাজ চন্দ্রকীর্তি ও রাজনটী মধুছন্দাকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন।

'রাজনটী' নাটকে মোট দশটি চরিত্র রয়েছে। তন্মধ্যে রাজনটী মধুছন্দা, যুবরাজ চন্দ্রকীর্তি, প্রভুপাদ কাশীশ্বর গোস্বামী এই তিনটি চরিত্রই প্রধান। রাজনটী মধুছন্দা যুবরাজ চন্দ্রকীর্তির প্রতি গভীর পবিত্র প্রণয়ে আসক্ত। যুবরাজ চন্দ্রকীর্তি স্বয়ং মধুছন্দাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যদিও মধুছন্দার অতীত, তার বংশ পরিচয় এসব কিছু মধুছন্দা ও চন্দ্রকীর্তির মধ্যে দেয়াল হয়ে দাড়িয়েছে। নাটকে মধুছন্দার আর্ত হাহাকার রাজ্যের বৃহত্তর কল্যাণে মিথ্যা ছলনায় যুবরাজ চন্দ্রকীর্তিকে বিসর্জন দেয়ার মধ্য দিয়ে মধুছন্দা চরিত্রটি অভূতপূর্ব রূপে প্রকাশ পেয়েছে। যুবরাজ চন্দ্রকীর্তি মধুছন্দার রহস্যময় আচরণ দেখে ক্ষিপ্ত ও বিস্মিত হন। যদিও পরে তিনি আসল সত্য বুঝতে সক্ষম হন। প্রভুপাদ কাশীশ্বর গোস্বামী একজন রাজনটীকে সমস্ত পঙ্কিলতার ঊর্ধ্বে ঐশ্বরিক মহিমায় উদ্ভাসিত করে তোলেন। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে রাজনটী মধুছন্দার দুই সখী প্রিয়া, রিয়া। তাদের প্রণয়ীদ্বয় মহাকাল ও আচংফা, সেনাপতি টায়া, শ্রীকণ্ঠ, দ্বারী অন্যতম।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় **'মরা হাতি লাখ টাকা' (১৯৫৭)** নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৫৭ সালে *'ছোটদের পাততাড়ি'* (যুগান্তর) 'সব পেয়েছির আসরের' জন্মজয়ন্তী উৎসবে মহাজাতি সদনে বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের দ্বারা এটি অভিনীত হয়।[৭৪] অভিনয়ের উপযোগী করে নাট্যকার ক্ষুদ্র নাটিকাটির সামান্য বৃদ্ধি ঘটান। একাঙ্কটির প্রযোজিত

রূপে ব্যবহৃত সঙ্গীতটি নন্দগোপাল সেনগুপ্ত রচনা করেন। এর চরিত্র সংখ্যা-২৪, পুরুষ-২২, নারী ২।

সওদাগরি অফিসের ছাপোষা কর্মচারীর হঠাৎ এক টাকার লটারিতে একটি সার্কাসের হাতি পাবার খবরকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত বেদনা-মধুর কৌতুকজনক পরিস্থিতি এই একাঙ্কটির মূল ঘটনা। গরিবের কাছে হাতি পোষার অক্ষম স্বপ্ন দেখা অলীক কল্পনারই সামিল। সুবিখ্যাত 'মহাভারত সার্কাস পার্টি' এক টাকার টিকেটে তাহাদের 'হিমালয়' নামক বুড়ো হাতিটি লটারিতে তুলেছে। ৭/৫ বাদশা লেনের শ্রী এককড়ি বসুর নামে ঐ হাতিটি লটারিতে উঠেছে। এই নাটকের প্রধান চরিত্র এককড়ি বসু। এক টাকার লটারিতে হাতি পাওয়ার খবর শুনে বিস্মিত ও বিব্রত হয়ে পড়েন। দরিদ্র ছাপোষা মার্চেন্ট অফিসের কর্মচারী এককড়ি বসু অভাবের সাথে লড়াই করে টিকে আছেন। তার দুই পুত্র দেবরাজ বসু ও মহারাজ বসু এবং এক কন্যা রাজটীকা ডাকনাম টাকা। তার স্ত্রী লক্ষ্মী দেবী। মোট পাঁচ জনের সংসার। হাতি পাওয়ার খবর শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে কেউ অতি উৎসাহী, কেউ বা প্রতিহিংসায় কাতর। লটারীর টিকিট জেতার খবর মুহূর্তে পৌঁছে যায় গলির সকলের কাছে। এককড়ি বসুর দুই বন্ধু নটবর ও জলধর বাবু খবর শুনে ছুটে আসেন। নটবর বাবু হাতীর আগমন সংবাদে খুশি হন। কিন্তু জলধর বাবু হাতীর আগমন সংবাদ শুনে বিরক্ত হন। হাতি যাতে না আসতে পারে সে জন্য তিনি তৎপর হয়ে ওঠেন।

এককড়ি বসুর বড়লোক শ্যালক বাহাদুর রায় সুযোগ বুঝে এসে হাজির। দৈনিকপত্র 'প্রত্যহে'র বিশেষ প্রতিনিধি দিনমনি হালদার এই খবর শুনে ছবি তুলতে ছুটে আসেন, বাহাদুর রায় সুযোগ বুঝে

সবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছবি তুললেন। দিনমনি হালদার ক্যামেরা ক্লিক করলেন। দিলমনি হালদার এককড়ি বসুকে তার হবি সম্পর্কে জানতে চাইলে এককড়ি বসু হেসে বললেন, "সখের মধ্যে এক বড়ি আফিং। সারাদিন খেটে–খুটে এসে একবড়ি আফিং পেলেই খুশি।"

বাহাদুর–"না না ভাই, দিনমনিবাবু, এসব লেখা চলবে না। আপনি বরং লিখে নিন–সারাদিন খেটে–খুটে এসে একটু দার্শনিক চিন্তায় বুঁদ হয়ে থাকতে চান উনি। আচ্ছা, এসব আমি যেতে যেতে আপনাকে নোট করে দেব। আচ্ছা, তাহলে আমিও চলি। হাতী এলেই আসবো। খুব বড় একটা প্ল্যান আছে।"[৭৫]

দিনমনি ও বাহাদুর রায় চলে যেতে এক যুবক প্রবেশ করল। সে হাতীর মাহুত হওয়ার জন্য এসেছে। যুবকটি এককড়ি বাবুকে জানালেন,

আমি জ্যুলজির গ্রাজুয়েট। কি করবো স্যার, যেই শোনে আমি জ্যুলজির গ্রাজুয়েট, বলে এখানে নয় চিড়িয়াখানায় যাও। আজ তিন বছর হয়ে গেল, একটা চাকরি মিললো না। বাপ-মার ওপর বসে বসে আর কতদিন খাব বলুন তো ! মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয়। স্যার মাহুত হতে খুব পারবো স্যার। আমি দেখেছি, মাহুত অঙ্কুশ দিয়ে হাতীকে খুঁচিয়ে মারে যেমন খুঁচিয়ে মারছে আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা আমার ভাগ্য। আমি এখন খুঁচিয়ে মারতে চাই আমার চারপাশের সবাইকে। এই দেখুন আমার মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমি পালাই, হ্যাঁ আমি পালাই, নইলে কখন কি করে বসবো জানি না।[৭৬]

Dhaka University Institutional Repository

এরপর সুযোগসন্ধানী তথাকথিত ভূতপূর্ব-জমিদার, ভূতপূব-রায় বাহাদুর বিক্রমাদিত্য সিংহ তার পালিত পুরুষ হাতির সাথে এককড়ি বসুর সদ্যপ্রাপ্ত হাতির বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন,

> আমার সব গেছে। জমিদারী ছিল, সরকার নিয়ে নিল। রায়সাহেব, রায় বাহাদুর অতগুলো টাইটেল ছিল সাহেবদের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোও উড়ে গেল। আমার থাকবার মধ্যে আমার ঐ মেয়েটাই আছে। হেঃ হেঃ হেঃ এই তো মুখে হাসি ফুটেছে–এইবার বুঝেছেন। হেঃ হেঃ হেঃ সবাই বলে Grow more food. আমি বলি Grow more elephant. নাতী-পুতি হবে, দেশ বিদেশে চালান দিয়ে ডলার আর্ন করলেই সরকার থেকে আবার খেতাব আসবে। হেঃ হেঃ হেঃ বেয়াই আপনি হবেন হস্তীশ্রী, আমি হব হস্তীভূষণ, হেঃ হেঃ হেঃ।[৭৭]

এরপর লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট অনিত্য জীবন চৌধুরী হাতির লাইফ ইন্স্যুরেন্স করানোর জন্য আসেন। মানসিক রোগী অতুল, দিদিমা, দাদুর কাছে টাকা চাইতে আসে। লটারীতে টাকা পাওয়ার খবর শুনে বাড়িওয়ালা, মুদি, গোয়ালা সকলে এসে তাদের পাওনা চাইতে লাগল। অবশেষে তিনি লিখিতভাবে হাতির মালিকানা ছেড়ে দিয়ে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হলেন। বিচিত্র ধরনের অসংখ্য চরিত্রের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একাঙ্কটিতে রসঘন কৌতুক, নাটকীয় উৎকণ্ঠা এতটুকু ব্যাহত হয়নি।

হাতী প্রাপ্তি নিয়ে এককড়ি বসুর যে নানারকম ভোগান্তি হল এবং এরই সাথে সমাজের নানা স্তরের মানুষের বিচিত্র, স্বরূপ নাটকের বিষয় হিসাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ধনী আত্মীয় স্বজনরা দরিদ্র আত্মীয় পরিজনদের অবহেলা করেন। কিন্তু তারাই যখন দেখেন দরিদ্র আত্মীয়দের ধনপ্রাপ্তির সম্ভাবনা তখন তাদের আচরণে পরিবর্তন আসে। তারা নিজেদের স্বার্থ

হাসিলের জন্য এগিয়ে আসেন। তেমনিভাবে লটারীতে হাতী প্রাপ্তিতে সমাজের নিরন্ন ভাগ্য বিড়ম্বিত মানুষের অসহায়ত্বের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। নাটকের শেষাংশে 'মহাভারত সার্কাস পার্টি'র ম্যানেজার যখন এসে খবর দেন হাতীটি করোনারি থ্রমবোসিস রোগে মারা গেছে। হাতীটি সৎকারের জন্য প্রচুর খরচ দিতে হবে তখন লটারী বিজয়ী এককড়ি বসু মালিকানা ছেড়ে দিতে সম্মত হন। কিন্তু এককড়ি বসুর বড় পুত্র দেবরাজ বসু ম্যানেজারকে পাঁচশ টাকা দিতে বাধ্য করে। তখন দর্শকের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই হাতীর মালিকানা ছাড়তে না চাওয়ার মধ্যে সার্কাস পার্টির ম্যানেজারের গভীর উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু ছাপোষা শান্তিপ্রিয় এককড়ি বসু অত জটিলতার মধ্যে না গিয়ে ম্যানেজারের দেয়া পাঁচশ টাকাই সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন। গরীব ছাপোষা কর্মচারী এককড়ি বসু এই পাঁচ'শ টাকা প্রাপ্তিতেই খুশী হলেন। স্ত্রী লক্ষ্মী দেবীকে বললেন–

"এই নাও লক্ষ্মী মরা হাতী লাখ টাকা না হোক্ পাঁচ'শ টাকা বটেই। (লক্ষ্মীর হাতে টাকাটা দিয়া আনন্দে চিৎকার করিয়া) আজ রাতে পোলাও খাবো।"[৭৮]

'মরা হাতী লাখ টাকা' নাটকের পটভূমি হিসাবে মার্চেন্ট অফিসের ছাপোষা কর্মচারী এককড়ি বসুর হাতী প্রাপ্তির খবরকে কেন্দ্র করে যে নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সে বিষয়টি নাটকে উঠে এসেছে। মূলত পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার পর চারদিকে অভাব, বেকারত্ব প্রকট আকার ধারণ করে। এই সময় মানুষকে প্রলুব্ধ করে লটারী টিকিট বিক্রি করা হত। সাধারণ মানুষ দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় লটারী কিনত। এবং অধিকাংশ সময় প্রতারিত হত। মূলত এই

নাটকের মাধ্যমে সমাজের বাস্তব চিত্র ব্যঙ্গাত্মকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ নাটকে মোট ২৭টি চরিত্র রয়েছে। নাটকের দু'জায়গায় সঙ্গীতের ব্যবহার করা হয়েছে। সঙ্গীতের মাধ্যমে হঠাৎ এককড়ি বসুর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

'সংস্কৃতি' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় **'শীতবসন্ত'(১৯৫৮)** নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। চরিত্র সংখ্যা চার; পুরুষ ২, নারী ২। নাট্যকার এই একাঙ্কটিতে একটি অভাবী সংসারের শীতবসন্তের ছবি এঁকেছেন। ছা-পোষা কেরানী বসন্তবাবুর মাস মাইনে পাবার দিন। বাড়িতে অপেক্ষমাণ তার স্ত্রী-কন্যা। অভাবের সংসারে মাসের প্রথম কটি দিনে একটু খুশির হওয়া বয়। কিন্তু সেই সামান্য খুশির আমেজ অসামান্যতা পায় যখন তিনি তাঁর পরিবারে বাড়তি আনন্দের ব্যবস্থা করতে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' আর একগুচ্ছ রজনীগন্ধা কিনে আনেন। তিনি যখন বললেন:

"বাঁচার মন্ত্র পেতে হলে যে বই চাই তাও কিনে এনেছি আজ...জীবনের সব মন্ত্র সঞ্চিত রয়েছে এই একখানি বইয়ে...যতই শীত আসুক না কেন গরীবের জীবনেও বসন্ত আছে।"[৭৯]

তখন অভাব অনটনের সংসারে মানসিক চাপে ভারাক্রান্ত না হয়ে বাঁচবার জন্যে লড়াই করার দৃঢ়তা ফিরে আসে। শুধু শারীরিক প্রয়োজন মিটিয়ে বেঁচে থাকা নয়, মনের উপযুক্ত খাদ্য সমেত বাঁচার মন্ত্রে একাঙ্কটি উজ্জ্বল। নাটকে ছা-পোষা কেরাণী বসন্ত বসু ও তার স্ত্রী পূর্ণিমা–দুজনকেই অনেক ভেবে চিন্তে তাকে সংসারের খরচ নির্বাহ করতে হয়। এক সের ভৈসা ঘি আনতে ভুলে যাওয়ার জন্য স্বামীকে তিরস্কার করে, কিন্তু বসন্ত বসু কন্যা পুষ্পর জন্য একটা শাড়ী আনতে ভুল করে না। পুত্র

কিশোরকে সিনেমা দেখার জন্য আনা দুই পয়সা দেয়। নাটকে সংলাপ ব্যবহারে নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বসন্ত বসুর সংসারে অভাব দারিদ্র্যের মাঝেও মানসিক শান্তি বিরাজ করে।

'ভারতী' পত্রিকায় **'ভারতী'(১৯৫৮)** নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় । চরিত্র সংখ্যা ৯টি; পুরুষ-৭,নারী-২। এ কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র ভারতী। জানা যায় দোল পূর্ণিমায় তার জন্মতিথি। ঐদিন যার কপালে ভারতী আবির দেবে সেই-ই হবে তার জীবনসঙ্গী। কিন্তু ভারতী অপেক্ষা করে একজন বিশেষ মানুষের জন্য যিনি গত বছর এমনি দিনে দেশের জন্যে কাজ করার অপরাধে জেলে ছিলেন। এমন সময় খবর আসে সেই বিশেষ মানুষটি ভারতীর পুরনো মাস্টার মশাই মনীশ, মদের দোকানের সামনে পিকেটিং করতে গিয়ে আহত অবস্থায় গ্রেফতার হয়েছেন। আসন্ন মৃত্যু মুহূর্তে তিনি ভারতীকে ডেকে পাঠিয়েছেন, তাকে কিছু কাজের ভার দেবেন বলে। ভারতী উপেক্ষা করতে পারে না আহ্বান, একজন দায়িত্বশীল দেশপ্রেমিকের মত সেই আহ্বানে সাড়া দেয়। এই একাঙ্কটিতে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার প্রতি নাট্যকারের ক্ষোভ অনুচ্চারিত থাকেনি। ফলে নাটকের চরিত্রগুলির মুখ থেকেই উচ্চারিত হয়েছে ভুয়ো স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি কটাক্ষ। রোমান্টিক সাহিত্যচর্চার প্রতিও এখানে শ্লেষাত্মক বাক্য স্পষ্ট উচ্চারিত হয়েছে:

"...দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কই ? সকল সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কই ? কোথায় সেই সাহিত্য যা গানে গল্পে কবিতায় নিষ্পেষিত জীবনের বিদ্রোহকে বজ্রের ভাষা দেয়। অচেতনকে সচেতন করে, উদ্বুদ্ধ করে, সঞ্জীবিত করে।"[৮০]

Dhaka University Institutional Repository

'ভারতী' নাটকটি ভারতে স্বাধীনতা প্রাপ্তির কয়েক বছর অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে রচিত হয়েছে। এ নাটকে দেশ স্বাধীনতার পর দেশ গঠনের জন্য কল্যাণমূলক কাজের কথা বলা হয়েছে। 'ভারতী' নামটি রূপক অর্থে ভারতবর্ষকে বোঝানো হয়েছে। নাট্যকার এ নাটকের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ভোগ বিলাসের তুলনায় দেশ গঠনে মনোনিবেশ করার জন্য উৎসাহিত করতে চেয়েছেন।

'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় **'মহর্ষি ভুবনমোহন' (১৯৫৮)** নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। চরিত্র সংখ্যা–১১; পুরুষ-১০, নারী-১। একাঙ্কটিতে দিনাজপুর জেলার প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি মহর্ষি ভুবনমোহনের স্মৃতিচারণ করা হয়েছে। নাট্যকার সবিনয়ে ভূমিকা অংশে স্বীকার করেছেন কিছুটা কল্পনার আশ্রয় নিয়ে ও সজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি' গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে একাঙ্কটি লিখেছেন। ঘটনার সময়কাল ১৯১৪। দিনাজপুরে বালুবাড়ির পল্লীর দাতব্য চিকিৎসালয়ে অশীতিপরবৃদ্ধ মহর্ষি ভুবনমোহন হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা করেন। খাটো মোটা ধুতি ও একটা গামছাকে তিনি বস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। ভোর থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত প্রায় ২০০ রোগী দেখেন, ঔষধ দেন। পয়সা নেন না। ঔষধ যোগায় মিউনিসিপ্যালিটি ও জনসাধারণ। মহর্ষি ভুবনমোহনের মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নিখুঁত রূপায়ণ আলোচ্য একাঙ্কটিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

মহর্ষি ভুবনমোহন আজীবন চিরকুমার ছিলেন। মানুষকে মানুষ হিসাবে সম্মান দিতেন। সমাজের উঁচু নিচু বলে নয় সব শ্রেণি পেশার মানুষ তাঁর কাছে সমান গুরুত্ব পেত। গ্রামের ফুলি মেথরানীর বাড়ীর নেমন্তন্ন যেমন স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতেন তেমনি গ্রামের চন্দ্রাবলী নাম্নী পতিতার ব্যথা বেদনাকে আপনার করে ভাবতেন, সমাজের এই অসচ্ছল শ্রেণিকে দূরে ঠেলে না দিয়ে এদের দুঃখ মোচনে উদগ্রীব হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

উঠতেন। যে চন্দ্রাবলীর জন্য প্রাণধন নাম্নী জনৈক ব্যক্তির সংসারে ভাঙন ধরে মহর্ষি ভুবনমোহন স্বেচ্ছায় সেই চন্দ্রাবলীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হন। গ্রামের জগদীশ নামে জনৈক বালক মহর্ষি ভুবনমোহনের বাড়িতে আগত অতিথির কাছে মহর্ষি ভুবনমোহন বা পণ্ডিতমশায়ের সম্পর্কে যে মন্তব্য করে তা হল,

> মেথরানীদের পণ্ডিতমশাই 'জগৎজননী' 'জগদ্ধাত্রী' মা বলে ডাকেন। মেথর হোক, মুচি হোক আর মুদ্দফরাসই হোক ঘৃণা করেন না উনি কাউকেই। তারা কেউ ওঁকে খেতে নেমন্তন্ন করলে উনি আপনাদের বাড়ির নেমন্তন্নের চেয়ে বেশী আনন্দ পান। নিজের পাথরের থালা আর বাটিটি নিয়ে যান, ভুরিভোজন করে ফিরে আসেন।[৮১]

দিনাজপুর জেলা তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গে মহর্ষি ভুবনমোহন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মহর্ষি ভুবনমোহন 'পণ্ডিতমশাই' নামে সকলের কাছে পরম শ্রদ্ধা ও ভরসার আশ্রয়স্থল ছিলেন। শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস শৈশবে মহর্ষি ভুবনমোহনের সংস্পর্শে আশার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। সজনীকান্ত দাস তার 'আত্মস্মৃতি' গ্রন্থে মহর্ষি ভুবনমোহনের মহত্ত্ব বর্ণনা করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। মূলত সেই বর্ণনাকে ভিত্তি করে মহর্ষির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে মন্মথ রায় আলোচ্য নাটকটি রচনা করেছেন।

একজন মানুষ কতটা উদার, সহনশীল, সংস্কারমুক্ত, উপকারী মানসিকতার হতে পারে পণ্ডিতমশাই তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। মহর্ষি ভুবনমোহন তাঁর চরিত্রের অসাধারণ মানবীয় গুনাবলীর দ্বারা গ্রামের মানুষের কাছে গিয়েছেন, তাদের হৃদয় জয় করেছেন। তেমনি করে অসহায় মানুষকে সহযোগিতা

করেছেন। তাদের সমস্যা নিজের করে ভেবেছেন। চিরকুমার মহর্ষি ভুবনমোহন একদিকে অত্যন্ত সংবেদনশীল একজন মানুষ, অন্যদিকে কষ্ট সহিষ্ণু পরিশ্রমী ছিলেন। তাঁর চরিত্রের এতসব ভাল দিকের সমন্বয় ঘটেছিল বলেই তিনি মহর্ষি ভুবনমোহন। যুগ যুগ ধরে মানুষ তাকে শ্রদ্ধাভরে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে। এই ধরনের নিঃস্বার্থ মানুষেরা মানুষের হৃদয়ের মনিকোঠায় স্থান করে নেন আপন মহিমায়, যা তাঁদের প্রাপ্য।

'উজ্জ্বল ভারত' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় **'গোপালের মা' (১৯৫৯)** নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। চরিত্র সংখ্যা চার; পুরুষ-৩, নারী-১। শহরতলীর বস্তিঘরের বাসিন্দা নন্দলালকে বেপরোয়া লোক বলে অঞ্চলের সবাই সমীহ করে। পেশায় সে চোর। সংসারে তার স্ত্রী যশোদা ছাড়া আর কেউ নেই। নিঃসন্তান যশোদা সন্তান কামনায় গত দশ বছর তাবিজ-কবচ, পূজা-মানত, ঠাকুর-দেবতা করেও সন্তানের মা হতে পারে না। হঠাৎ একদিন নন্দ মল্লিকবাড়ি থেকে রূপোর তৈরি গোপালের বিগ্রহ চুরি করাতে গোটা এলাকায় সোরগোল পড়ে যায়। পুলিশ হন্যে হয়ে চোরের সন্ধান করে। তাদের সন্দেহ নন্দলালের ওপর। নন্দ সেই সন্দেহের হাত থেকে বাঁচতে গোপালের মূর্তিটি পুকুরে ফেলে দেবার জন্য স্ত্রী যশোদাকে অনুরোধ করে। নিঃসন্তান যশোদা গোপাল মূর্তিটিকে পেয়ে পরম আনন্দে সন্তানের মত বুকে আগলে রাখে। তার অতৃপ্ত মাতৃত্বের তৃষ্ণা ঐ মূর্তিটিকে ঘিরেই উৎসারিত হতে থাকে। সে স্বামীর কথা শোনে না। সন্তান বাৎসল্যের ফল্গুস্রোতে স্বামীর নিরাপত্তার চিন্তা ধুয়ে মুছে যায়। এরই মধ্যে পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলেছে তখন আতঙ্কিত নন্দ ক্রোধে দিশেহারা হয়ে গোপাল মূর্তিটি উনুনের আগুনে ফেলে দিতে উদ্যত হলে যশোদা গোপালকে বাঁচাতে স্বামীকে

পুলিশের হাতে তুলে দেয়। মাতৃসত্তা যে পার্থিব লাভ লোকসানের হিসেব কষে না এই একাঙ্কটিতে নাট্যকার স্বল্প পরিসরে সেই বক্তব্যই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

নারীর মাতৃসত্তাকে কেন্দ্র করে তাঁর বেশ কয়েকটি একাঙ্ক রয়েছে। যেমন–বহুরূপী, গোপালের মা, অমৃত। মাতৃত্বের ক্ষুধা তথা বন্ধ্যাত্বের বেদনা মন্মথ রায়ের অনেক একাঙ্কেই ঘুরে ফিরে এসেছে।

একাঙ্ক নাট্যগ্রন্থ সংকলনে **'ফকিরের পাথর'** অন্তর্ভুক্ত হয়ে ১৯৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৯৫৮ সালের ১৬ই অক্টোবর এই একাঙ্কটি আকাশবাণী কর্তৃক জাতীয় অনুষ্ঠানে সারা ভারতে বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত হয়েছে। এ নাটকের চরিত্র সংখ্যা পাঁচ; পুরুষ-৩, নারী-২। এক গ্রাম্য পরিবারের পটভূমিতে নাট্য কাহিনীর বিস্তার ঘটেছে। চৈত্র সংক্রান্তির চাঁদনি রাতে যদি ফকিরের পাথরের সামনে বসে একাগ্র মনে কিছু চাওয়া যায় তবে তা অবশ্যই পাওয়া যায়। গৃহকর্তা সদাশিব দৃষ্টিশক্তিহীন। অথচ প্রখর অনুভব শক্তিতে সেসব কিছু দেখতে পায়। সংসারের সব ফাঁকি, সকলের ফাঁকি তার উপলব্ধিতে ধরা পড়ে। সেই সদাশিব যখন দৃষ্টি ফিরে পায় তখন তার প্রখর অনুভব শক্তি হারিয়ে যায়। খোলা চোখে পৃথিবীর কুৎসিত রূপ তার কাছে অসহ্য মনে হয়–তার স্ত্রীর অতীতের চারিত্রিক স্খলন তার বুকে কাঁটা হয়ে বেঁধে। সদাশিব মানসিক যন্ত্রণায় আবার দৃষ্টিশক্তি হারায়। দৃষ্টি হারিয়ে সে ক্ষমা-সুন্দর চোখে সকলকে দেখে। সংসারের সব চাইতে বড় চাওয়া হল শান্তি–এই উপলব্ধি তার ঘটে। এ একাঙ্কটিতে নাট্যকার কাহিনীবৃত্ত নির্মাণে, সদাশিব ও গঙ্গার জীবন রহস্য উদঘাটনে কার্তিক, গণেশ কলাবতীর জীবন ঘনিষ্ঠ রূপচিত্রণে, ফকিরের পাথরকে কেন্দ্র করে নাট্যকাহিনীকে ধাপে ধাপে

Dhaka University Institutional Repository

চরম শীর্ষে পৌঁছে দেবার দক্ষতায়, সংলাপ সৃষ্টির সহজ স্বাভাবিক নৈপুণ্যে, সবশেষে স্বল্প পরিসরের মধ্যে অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব সংক্ষোভের রূপায়ণে নাট্যকার শৈল্পিক দক্ষতার ছাপ রেখেছেন।

'কোটিপতি নিরুদ্দেশ'(১৯৫৯) নাটকের পটভূমি হিসাবে কালীগঞ্জের 'সিংহ কুটীর' নামক সুরম্য গৃহের বসার ঘরকে নির্ধারণ করা হয়। গৃহস্বামী লক্ষপতি ব্যবসায়ী প্রতাপচন্দ্র সিংহ নাটকের প্রধান চরিত্র। নাটকের শুরু দিনের প্রথমভাগে অর্থাৎ সকাল থেকে। নাটকে কাহিনীর সূত্রপাত আরও আগে। এই ব্যবসার অন্যতম বিজ্ঞাপন লেখক শঙ্খ সরকারের অসাধারণ বিজ্ঞাপন দেয়ার জন্যই ক্রেতার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সেই বিজ্ঞাপনের জোরে 'প্রতাপ সিং অয়েল মিলের' প্রতি ফোঁটা সরষের তেল শুধু খাঁটিই নয়–ক্রেতার কাছে একেবারে সর্বরোগহরণ ওষুধে পরিণত হত। আর সে কারণেই প্রতাপচন্দ্র সিংহ ভেজাল তেলের ব্যবসা করে লাখ টাকার মালিক হয়েছেন। শঙ্খ সরকার এলাকার তরুণদের অনুরোধে পাড়ায় যে অনাথ আশ্রম খোলা হয়েছে সেই আশ্রমের জন্য সাহায্য চাইতে এলে প্রতাপ সিংহ ক্রুদ্ধ হয়ে শঙ্খ সরকারের চাকরি নাকচ করে দেন। শঙ্খ সরকারের লেখা বিজ্ঞাপনের জোরে প্রতাপচন্দ্র সিংহ ভেজাল তেলের ব্যবসার এমন রমরমা অবস্থা। অথচ তাকে কিনা সামান্য কারণে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হচ্ছে তাই কৌশলে শঙ্খ সরকার প্রতাপচন্দ্র সরকারের নাম দিয়ে 'দৈনিক 'দেশবার্তা'র বিজ্ঞাপন বিভাগে প্রতিশোধমূলক একটি বিজ্ঞাপন ছাপতে দেয়। বিজ্ঞাপনটি হল কোটিপতি এক বাঙালী ব্যবসায়ী হঠাৎ মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে রাতারাতি পথের ভিখারী হয়েছেন। অর্থাৎ দীনদরিদ্র বেশে সকলের অজ্ঞাতে গৃহত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। মধ্যবয়সী, কিন্তু চেহারা দেখলে বয়স অনুমান করা

কঠিন। ঘনকৃষ্ণ চুল, কিন্তু কিছুদিন যাবত ন্যাড়া হবার মতলব হয়েছিল, পারিবারিক কারণে ফটো এবং নামধাম প্রকাশ করা গেল না। যদি কোন হৃদয়বান ব্যক্তি গোপনে লোকটিকে সশরীরে ধরিয়ে দিতে পারেন তবে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবেন। এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর থেকে পুরস্কারের লোভে কলকাতার ঘরে ঘরে গরীবদের ধরে এনে মহানাটকের অভিনয় হতে থাকে। এর ফলে একদিকে যেমন ধনীদের ধনলিপ্সা প্রকাশ পেয়েছে অন্যদিকে হাস্যরসাত্মক সংলাপের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের নানা অসঙ্গতি ফুটে উঠেছে। বিজ্ঞাপনটি প্রচারের পর চারদিকে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাই নাট্যকার সহজাত কৌতুকবোধ তথা সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণির অর্থলোলুপতার চিত্র হিসাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এরই সাথে উপযোগী সংলাপ পরিবেশ পরিস্থিতিকে আরও বক্তব্য উপযোগী করে তুলেছে।

শঙ্খ সরকার বাড়ির চাকরের কাছে জানতে পারল বাড়ির কর্তা–গিন্নী সেই বিজ্ঞাপন দেখে উক্ত কোটিপতির অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েছে। তখন শঙ্খ সরকারের কৌতুকবোধের সীমা থাকে না। এমনকি বাড়ির চাকর দশরথও অর্থ প্রাপ্তির লোভ সামলাতে না পেরে সেও কোটিপতি খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। দশরথ বেরিয়ে গেলে বাড়ির দাসী সৈরভী ঝি খাবারের প্লেট নিয়ে আসল। শঙ্খ সরকার সৈরভী ঝিকেও ভাগ্য ফিরিয়ে দেয়ার প্রলোভন দেখায়। সৈরভী ঝি সহজেই রাজি হয়ে যায়। শঙ্খ সরকার তখন তাকে শিখিয়ে দেয় তার স্বামী ষষ্ঠীচরণকে কি বলতে হবে ও কীভাবে বলতে হবে।

শঙ্খ–"ছোট একটি বীজমন্তর। শুধু দুটি কথা "কাল রাজা–আজ ফকির" বলবে তোমার স্বামী বিড় বিড় করে বারবার বলবে বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে সোজা এই বাড়ির ফটকে বিড় বিড় করে কেবল যেন বলে 'কাল রাজা আজ ফকির'। কিন্তু খবরদার, এই মন্তর ছাড়া একটি বাজে কথা নয়। যদি কিছু বলতেই হয়–তবে ইশারা। খেতে বললে খাবে, বসতে বললে বসবে–ব্যাস। ঐ মন্তরটির জোরে ফকির কেমন করে রাজা হয় তুমি স্বচক্ষে দেখবে সৈরভী! আজই। কিন্তু খবরদার–কেউ যেন না জানে, ও তোমার কে! জেনেছো কি গেছো![৮২]

সৈরভী ঝি এই প্রস্তাবে সাথে সাথে রাজি হয়। সৈরভী বেরিয়ে যেতেই গৃহকর্ত্রী জগদ্ধাত্রী দেবী মধ্যবয়সী একটি লোককে নিয়ে একপ্রকার টানাটানি করেই ভিতরে প্রবেশ করলেন। লোকটির ছিন্নভিন্ন বেশ, মাথা ন্যাড়া, বোকা বোকা চাহনি। কপালে ফোঁটা তিলক, ভিক্ষার ঝুলি, হাতে একতারা, মুখে, 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ' গান। জগদ্ধাত্রী দেবী যতই তাকে মহাপুরুষ জ্ঞানে সেবা করছে। ততই সে ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। জগদ্ধাত্রী দেবী আগত এই মহাপুরুষের জন্য খাবার আনতে ভিতরে গেলেন। মহাপুরুষটি অনুনয় করে শঙ্খ সরকারকে বললেন বাবা 'জয় রাধে' বলে মা লক্ষ্মীর কাছে ভিক্ষা চেয়েছি অমনি আমাকে ধরে নিয়ে এল, আমাকে ছেড়ে দাও বাবা-তোমার পায়ে পড়ি। শঙ্খ সরকার কৌশলে বুদ্ধিমত্তার সাথে তাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করল। এ সময়ে গৃহকর্ত্রীর অনুপস্থিতিতে শঙ্খ সরকার বাড়ির পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ে বহুরূপা নাট্যসঙ্ঘের ডিরেক্টর ভোলানাথ চৌধুরীর সাথে টেলিফোনে আলাপ করে জানতে পারলেন সব

বাড়িতেই কোটিপতির অন্বেষণের খেলা শুরু হয়ে গেছে। শঙ্খ সরকার ভোলানাথের দলবল নিয়ে এই বাড়ির সামনে আসার জন্য অনুরোধ করল। এমন সময় বাড়ির কর্তা প্রতাপচন্দ্র সিংহ সৈরভীর স্বামী ষষ্ঠীচরণকে পথ হতে ধরে নিয়ে আসলেন। এসেই সৈরভীকে চা-জল খাবারের জন্য তাড়া দিলেন। নির্দেশ মতো ষষ্ঠীচরণ সেই একই বুলি 'কাল রাজা আজ ফকির' মন্ত্র উচ্চারণ করে যেতে লাগলেন। চা জল খাবার এলে প্রতাপচন্দ্র আগত আগন্তুককে খাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

ষষ্ঠীর দৃষ্টি কিন্তু সৈরভীর দিকে নিবদ্ধ। এইবার দুই পা নাচাতে নাচাতে পায়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতে লাগল। প্রতাপচন্দ্র সিংহ ব্যাপার কি জানতে চাইলেন। শঙ্খ সরকার (চাপা গলায়) বললেন, "বোধ হয় সৈরভীকে পা টিপতে ইশারা করছেন–দেখছেন না! পা দুখানির কি ব্যাকুলতা ?" শ্রীসিংহ সৈরভীকে আগন্তুকের পা টিপে দিতে বলল। ষষ্ঠীচরণ এই সুযোগে হাই তুলে সোফায় দেহ এলিয়ে দিল। শ্রীসিংহ আগন্তুককে খুশি করার জন্য নিজেই পা টিপতে শুরু করে দিল। শঙ্খ পাশের ঘরে যাচ্ছিল, দেখল শ্রীসিংহ স্বয়ং মেঝেতে বসে ষষ্ঠীচরণের পা টিপতে শুরু করেছেন। শঙ্খ মুচকি হাসল। কিন্তু তার কৌতুক আরো বেড়ে গেল। যখন সে দেখল অপর দরজায় সৈরভী এসে এই দৃশ্য দেখে জিভ কেটে ঘোমটা টেনে আবার ছুটে পালাল। শঙ্খ হো হো করে হেসে উঠল। এই হাসিতে ষষ্ঠীচরণ চমকে উঠে বসল। কিন্তু তার মর্দিত পা দুটি টেনে নিল না। ষষ্ঠীচরণ আবার তার দেহ এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল। বলা বাহুল্য শ্রীসিংহ আগের মত

তার পা দুটি টিপে দিতে লাগলেন। কেবল চাপা গলায় 'দৈনিক দেশবার্তা'র বিজ্ঞাপন বিভাগে ফোন করার জন্য শঙ্খকে নির্দেশ দিলেন।

শঙ্খ পাশের ঘরে চলে গেল। বাইরে থেকে প্রতাপসিংহের কন্যা ইন্দ্রাণী ঘরে ঢুকে এই দৃশ্য দেখে থমকে দাড়াল। কোন কোটিপতি নয় বরং ঝি সৈরভীর স্বামী ষষ্ঠীচরণের পা টিপছে–ইন্দ্রাণী বাবাকে এ কথা বলতেই প্রতাপসিংহ আঁতকে উঠে সরে গেল। ইন্দ্রাণীর এই কথাটি শোনামাত্র ষষ্ঠীচরণ তড়াক করে সোফা হতে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। প্রতাপসিংহ বিব্রতস্বরে ষষ্ঠীচরণকে সাবধান করে বললেন পা টিপার কথা যেন দুই কান না হয়। আর এজন্য ষষ্ঠীচরণের হাতে কিছু নোট গুঁজে দিলেন। ষষ্ঠীচরণ জিভ কেটে ইশারায় বোঝাল যে, সে কখনও একথা কাউকে বলবে না। ষষ্ঠীচরণ নোটগুলো নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে বের হয়ে গেল। প্রতাপসিংহ তার কপালের ঘাম মুছে দাঁড়াতেই দেখেন শঙ্খ সরকার পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। বলা বাহুল্য, শঙ্খ এই স্বর্গীয় দৃশ্যটি পাশের ঘর হতে মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখার প্রলোভন ও আনন্দ ত্যাগ করতে পারেনি। শঙ্খ সরকার এসে জানাল টেলিফোনের লাইন ব্যস্ত। প্রতাপসিংহ তখন বললেন: "ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন, নইলে লাইনটা পেলে, ঐ জোচ্চোরটাকে নিয়ে আমার কেলেঙ্কারিটা আর এক ধাপ এগিয়ে যেত।"[৮৩]

শঙ্খ সরকার বিদ্রূপ করে প্রতাপসিংহকে নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি হয়ে বস্তির দরিদ্রনারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য বললেন। প্রতাপসিংহ শঙ্খ সরকারের উপহাস, বিদ্রূপ হজম করে শঙ্খ সরকারের চলে যাওয়া চাকরিতে পুনরায় বহাল রাখার কথা দিলেন।

এই সময়ে ইন্দ্রাণী ভোলানাথের দলবল নিয়ে প্রবেশ করল। প্রতাপসিংহ ভোলানাথের পরিচয় জানতে চাইলে ভোলানাথ বললেন:

> পিতা মাতা নাম দিয়েছিল ভোলানাথ–ভোলানাথ আঢ্য। আজ চেয়ে দেখ, ধনাঢ্যের পরিণতি। ওরে–ওরে ভোলানাথ ভুলে যা, ভুলে যা তোর পিতৃদত্ত 'আঢ্য'–শুধু মনে রাখ আজ তুই বোম ভোলানাথ।[৮৪]

ভোলানাথের এই কথাবার্তায় সিংহ পরিবার পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় দ্বারা বুঝে নিল এই ভোলানাথই সেই বিজ্ঞাপিত লোকটি। বাড়ির কর্তা প্রতাপ সিংহ ও কর্ত্রী জগদ্ধাত্রী ভোলানাথকে সন্তুষ্ট করার জন্য মেয়ে ইন্দ্রাণীকে দায়িত্ব দিলেন। ভোলানাথের দলের অন্যান্য যারা আছে তাদের সন্তুষ্ট করতে প্রতাপ সিংহ ও জগদ্ধাত্রী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। প্রতাপ সিংহ আগত লোকটিকে সন্তুষ্ট করতে হোটেল থেকে যত খাবার আছে এই মুহূর্তে পাঠিয়ে দেয়ার আদেশ করল। এভাবে পুরো বাড়িটা জমে উঠল। কখনও মনে সন্দেহে দাড়ি ধরে টেনে দেখছে সত্যি কিনা। আবার আগত তথাকথিত সাধুদের কেউ কেউ ছদ্মবেশ ধারণ করার কারণে অসাবধানে হঠাৎ দাড়ির একটা অংশ খুলে পড়ছিল। সাথে সাথে ধরা পড়ে যায় শেষে পালিয়ে গিয়ে প্রাণটা বাঁচাল। এমনিভাবে হাস্যকৌতুকের মাধ্যমে নাট্যকার যেমন পাঠককে আনন্দ দিচ্ছেন তেমনি ধনী শ্রেণির অর্থলোলুপ চিত্র দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন। নাটকের শেষাংশে ভোলানাথ তার স্বরুপ উন্মোচন করেন। প্রতাপসিংহ ও জগদ্ধাত্রীকে কটাক্ষ করে বললেন যে লক্ষ টাকা পুরস্কারের লোভে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির হাতে মেয়েকে অসঙ্কোচে অবলীলাক্রমে যারা ছেড়ে দিতে

পারে অর্থের মোহ তাদেরই বেশী। ভোলানাথের এই ধরনের তীর্যক কটুক্তি শুনে প্রতাপসিংহ ভোলানাথের প্রকৃত পরিচয় জানতে চাইলে ভোলানাথ বললেন:

> আমি? আমি ভোলানাথ চৌধুরী। বি.এ. ফেল–বেকার যুবক–কাজকর্ম নেই। বহুরূপা নাট্যসঙ্ঘের ডিরেক্টারি করে সময় কর্তন করি? আজ কাগজে ক্রোড়পতির নিরুদ্দেশ সংবাদ বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম–লক্ষ টাকা পুরস্কারের লোভে কলকাতার ঘরে ঘরে গরীবদের ধরে এনে এক মহানাটকের অভিনয় হচ্ছে। তাতে আমিও অংশ গ্রহণ না করে পারলাম না। অভিনয় করলাম সামান্য–কিন্তু শিখলাম অনেক। আচ্ছা চলি–নমস্কার।[৮৫]

ইন্দ্রানীও ভোলানাথের সাথে যেতে ইচ্ছা পোষণ করলেন। পিতামাতার অর্থলোলুপ মানসিকতায় ইন্দ্রানী ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত। জগদ্ধাত্রী নিজের ভুল বুঝতে পেরে মেয়ের কাছে ক্ষমা চায়। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। প্রতাপসিংহ টেলিফোনে দেশবার্তা পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগের কর্মকর্তার সাথে কথাবার্তা থেকে যা জানতে পারলেন তা হলো ক্রোড়পতি নিরুদ্দেশ বিজ্ঞাপনটি প্রতাপসিংহের নামে দেয়া হয়েছে। তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে জানতে পারলেন উক্ত বিজ্ঞাপনটির পাবলিসিটি অফিসার শঙ্খ সরকার। বিজ্ঞাপন দেখে লোকজন পত্রিকা অফিস ঘেরাও করেছে। এমনকি পথ থেকে জন পাঁচেক পাগল ধরে এনেছে। প্রত্যেকে লক্ষ টাকা পুরস্কার চাইছে। পত্রিকা অফিস আরোও জানিয়েছে নিজেদের রক্ষা করতে পত্রিকা অফিসের চারপাশে ঘেরাও করা পাঁচশ' পাগল প্রতাপসিংহের বাড়িতে লেলিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রতাপসিংহ নিজেকে বাঁচাতে সমস্ত ঝামেলা মেটানোর ভার শঙ্খ সরকারকে দিয়ে স্ত্রী-কন্যা নিয়ে শ্বশুর বাড়ি যাত্রা

করলেন। এমন সময় ঘরের বাইরে কোলাহল শোনা গেল। সেই কোলাহল ছাঁপিয়ে উঠল দশরথের কণ্ঠ। বলতে বলতে একদল পাগল প্রায় ভবঘুরে নিয়ে দশরথের প্রবেশ। শঙ্খ সরকার দশরথকে বললেন: " হ্যাঁ করে দেখছো কি ? চা আনো–খাবার দাও। আজ কলকাতার ঘরে ঘরে দরিদ্র নারায়ণের পূজার লগ্ন এসেছে। এই মহালগ্ন যতক্ষণ আছে–এসো ভাইসব–আমরা সকলে মিলে সার্থক করি বসুন–আপনারা সবাই বসুন। খান দান–ফুর্তি করুন-"[৮৬]

এ নাটকে নাট্যকার সমাজের বিত্তবান মানুষের ধনলিপ্সা, অর্থলালসার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। সমাজে ধনী শ্রেণির অর্থলালসা কতটা তীব্র হতে পারে, তারা যে মানসিকভাবে কতটা দরিদ্র এ নাটকে তাই নাট্যকার দেখিয়েছেন। নাটকে শম্ভু সরকার এবং ভোলানাথ ও তার গ্রুপটাকে নাটকে বিবেকরূপে দেখানো হয়েছে।

'যষ্টিমধু' পত্রিকার প্রফুল্লচন্দ্র রায় জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যায় **'নারায়ণ'(১৯৬১)** নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। চরিত্র সংখ্যা–৪, নারী বর্জিত নাটক। এ নাটকে দেখা যায় কোন এক গভীর রাতে কলকাতার নির্জন সীয়ার পার্কে তৎকালীন বিপ্লবী পুলিন দাস ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্নেহভাজন ছাত্র জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার একটি বেঞ্চে বসে কথা বলছে। তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সাথে সাক্ষাৎ করা। এই একাঙ্কে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে পুলিন দাস ও জ্ঞানেন্দ্র মজুমদারের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বৈপ্লবিক ভাবনা আভাসিত হয়ে ওঠে। স্বদেশপ্রেমিক প্রফুল্লচন্দ্র রায় যে দেশের স্বাধীনতার জন্য বৈজ্ঞানিক সাহায্য দিয়ে নিজেকে পরোক্ষভাবে বিপ্লবীদের সাথে যুক্ত রেখেছিলেন অনেকের অজ্ঞাত এ বিষয়টিকে উপজীব্য করে নাট্যকার এ একাঙ্কটি রচনা

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। সে যুগের অন্যান্য খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকরাও যে (নীলরতন সরকার, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানেন্দ্র ঘোষ) এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তা নাট্যকার সুকৌশলে নাট্যকাহিনী গ্রন্থনের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তথ্যসমৃদ্ধিই এ একাঙ্কটির প্রাণ।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) প্রখ্যাত রসায়নবিদ, অধ্যাপক ও ভারতবর্ষে রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভারতীয় উদ্যোক্তা। ১৯০১ খ্রি. স্থাপিত ভারতবর্ষের প্রথম রাসায়নিক দ্রব্য ও ওষুধ প্রস্তুতের কারখানা 'বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড'–এর প্রতিষ্ঠাতা।[৮৭] ১৯২৪ খ্রিঃ তার প্রেরণায় ও অর্থ সাহায্যে 'ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। চিরকুমার প্রফুল্লচন্দ্র অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে গেছেন। ছাত্র-শিষ্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় প্রীতির বন্ধন ছিল। অধ্যাপনার গুণে তিনি ছাত্রদের আকৃষ্ট করে একটি ভারতীয় রাসায়নিক বিজ্ঞানীগোষ্ঠীর সৃষ্টি করেন ও ভারতে রসায়নচর্চা এবং গবেষণার পথ উন্মুক্ত করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী বীরদের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব ছিল। ১৯২১ খ্রিঃ অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজির খদ্দর-প্রচারে তিনি অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি প্রায় লক্ষ টাকা দান করেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা প্রবর্তনের তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁর রচিত আত্মচরিত 'Life and Experiences of a Bengali Chemist'(২ খণ্ড, ১৯৩২ এবং ১৯৩৫) অন্যতম অনুপ্রেরণাদায়ক গ্রন্থ। তিনি জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, পণ প্রথা প্রভৃতি হিন্দু সমাজের বিবিধ কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন। সর্ববিধ জাতীয় শিক্ষা ও শিল্পোদ্যোগের প্রতি অকৃপণ সহায়তা এবং মানব-কল্যাণে অর্জিত অর্থের অকাতর বিতরণ, তাকে

দেশবাসীর সামনে বিশিষ্ট করে তুলেছে। নাট্যকার মন্মথ রায়ের 'নারায়ণ' নাটকটি এই মহামনীষীকে নিয়ে রচিত হয়েছে।

শারদীয়া 'সংহতি' পত্রিকায় **'বীক্ষণ'(১৯৬১)** নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। চরিত্র সংখ্যা-২টি; নারী বর্জিত নাটক। মনের ভাষা পড়ার যন্ত্র যদি আবিষ্কৃত হয় তাহলে বোঝা যাবে মুখে সহৃদয়তার ভাব দেখালেও আসলে পরশ্রীকাতর মানুষের সংখ্যাই বেশি। মন-মুখ এক–এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম।

সুবিখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিদ ডক্টর মানস চৌধুরীর সদ্য আবিষ্কৃত 'বীক্ষণ' নামক যন্ত্রটি নিয়ে নাটকের বিষয় আবর্তিত হয়েছে। এই নিয়ে বন্ধু তাপস রায়ের সাথে আলাপ-আলোচনা। দীর্ঘ পরিসরে মানুষের মনোরাজ্যের গুপ্তরহস্য প্রকাশ করার বিস্ময়কর সমর্থ রাখে (বীক্ষণ-'বিশেষভাবে দর্শন')। আমেরিকার বিখ্যাত'নিউইয়র্ক হেরাল্ড'-এ খবর প্রকাশ করে। বন্ধু তাপস রায় মানস চৌধুরীর এই আবিষ্কারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল দুটি চরিত্র–মানস চৌধুরী ও তাপস রায়। এই দুজনের কথোপকথন থেকে নাটকের মূল বক্তব্য জানা যায়। বাল্যকালের বন্ধু তারা দুজন। যন্ত্রটির আবিষ্কারক মানস চৌধুরীর সংলাপ সূত্রে এর সঠিক ব্যবহার জানা যায়। যন্ত্রটি দিয়ে ছোটবেলার বন্ধু তাপসকে পরীক্ষা করাতে চায়। কিন্তু তাপস পরীক্ষার গিনিপিগ হতে সাহস পায় না। সে অসম্মতি জানায়, কিন্তু মানস নিরস্ত হয় না। বিজ্ঞানী মানসের বাগ্মিতা ও যুক্তির কাছে তাপস আত্মসমর্পণ করে। তার উপরেই পরীক্ষা চলে। যথা নিয়মে মানস যন্ত্রাদি চালু করে। তাপস ধীরস্থির, গম্ভীর হয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে দেখা গেল

যন্ত্রের শব্দকে ছাপিয়ে তাপস উচ্চ কণ্ঠে মনোভাব প্রকাশ করছে এবং কলম দিয়ে তা প্যাডে নিজ হাতে লিখছে।

"উঃ! শেষকালে তুই এতবড় একটা আবিষ্কার করে ফেললি মানস! তোর এই জয়, তোর এই যশ, এ যে আমি কিছুতেই সইতে পারছি না। তুই এত বড় হলি আর আমি ! কে আমাকে চিনছে ? যা দেখছি, তুই কোটিপতি হবি। আর আমি!"[৮৮]

মানসের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বন্ধুর কথা শুনে বেদনাহত হলেন। মানস কাগজটি টেনে নিল ও টুকরো টুকরো করে ফেলল। আশ্চর্য আবিষ্কারক যন্ত্রটি বন্ধ করে দিল। দীর্ঘ সময় পরে তাপস ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসল। মানসকে তার ভাবনা সম্পর্কে জানতে চাইলে মানস হেসে বললেন, 'ঐ এক কথা আমার গর্বে তুই কত গর্বিত তাই। সত্যি, এত ভালোবাসিস তুই আমাকে'।

তাপস দেখতে চাইল কাগজে সে কী লিখেছে। মানস বলল সে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলেছে। তাপস শুনে অবাক হয়। তাপস তখন বললেন,

"ওরে মানস, আমি আজ একটি যুগান্তকারী বিষয় আবিষ্কার করলাম। আসলে মুখে আমরা বলি বটে 'সত্যমেব জয়তে' কিন্তু সত্য থেকে দূরে থাকতে চাই আমরা। ঘৃণা করি সবচেয়ে বেশি ঐ সত্যকে। আর শোন মানস একটা ভবিষ্যৎবাণীও আজ আমি করছি–তোমার এই যন্ত্র তুমি রক্ষা করতে পারবে না। চুরমার করে ফেলা হবে একে। ধর্ম,

রাজনীতি, সমাজ–এই তিন শক্তি একযোগে ছলে হোক, বলে হোক, কৌশলে হোক তোমার বীক্ষণকে ভক্ষণ করবে। তার চেয়েও বড় ভয় এখন তুমি প্রাণে বাঁচলে হয়।"[৮৯]

নাট্যকার মন্মথ রায় সংলাপের সুসংহত গাঁথনি দিয়ে মানুষের স্বভাবজাত ঈর্ষাপরায়ণতার স্বরূপটি তাপস চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। ষড়রিপুর প্রভাবে প্রভাবিত মানুষ এই বৈশিষ্ট্যের বাইরে যেতে পারে না। এই কঠিন সত্য যখন প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখনই একে নিশ্চিহ্ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। মূলত রূপক অর্থে নাট্যকার এটাই বোঝাতে চেয়েছেন, যুগে যুগে কালে কালে যখনই সত্যদ্রষ্টার আবির্ভাব হয়েছে মানুষ এই রিপুর তাড়না থেকে মুক্ত হতে পারেনি। নাটকে অন্য কারও উপরে এই যন্ত্রের কার্যকারিতা প্রয়োগ করতে দেখা যায় না। নাটকে বিজ্ঞানী মানসের নিকটাত্মীয়েরা এই যন্ত্রকে প্রতারণা করেছেন। নাটকে মানস একা, নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন। সমাজে সকলে সত্যের জয়গান গাইলেও উপরে উপরে প্রত্যেকেই ভাল মানুষ। কিন্তু অন্তরালে একেকটি মানুষ ধ্বংসাত্মক প্রবণতা নিজের মধ্যে ধারণ করে বেঁচে থাকে। স্বার্থহানি হলে, মানুষের ভেতরের নগ্ন চেহারা তখনই প্রকাশ পায়। মানসের অভূতপূর্ব আবিষ্কারে তাপস যেমন ঈর্ষান্বিত, যন্ত্রটির অভাবনীয় ক্ষমতার কাছে নিজের মনের গোপন সত্যটি গোপন রাখতে পারেনি। আর এভাবেই যদি প্রত্যেকের মনের গভীরতম কথা প্রকাশ হয়ে যায় তাহলে মানুষের জন্য তা সুখকর হবে না। মূলত সভ্যতার মধ্যে ভণ্ডামি, শঠতা, প্রতারণা সামাজিক জীবনে ঢুকে গেছে তারই একটা আয়না হিসেবে এই কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

'দামোদর' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় **'এই হয়েছে আইন'(১৯৬১)** নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এ নাটকে প্রশাসনিক অসঙ্গতিকে তুলে ধরা হয়েছে। হবুচন্দ্র রাজা তীর্থ ভ্রমণ থেকে পাঁচ বছর পর ফিরে এসে দেখেন রাজ্য শুদ্ধ প্রজারা হাসছে। তারা সুখে আছে ভেবে রাজা খুশি হয়। পরদিন একজন প্রজা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। চুরির কারণ জিজ্ঞেস করলে সে হাসিমুখে জানায় যে রাজ্যের সমস্ত মানুষ আজ ক্ষুধার্ত। গবু মন্ত্রীর অন্যায় শাসন ও শোষণে দেশে দুর্ভিক্ষ তৈরি হয়েছে। গবু মন্ত্রীই আদেশ দেয়-প্রতিটি প্রজা যা করবে হেসে হেসে করবে–নয়ত শূলে দেওয়া হবে। তাই প্রজারা হেসে হেসে বিদ্রোহ করছে ও ঘোষণা করছে গবু মন্ত্রী নিপাত যাক। দীর্ঘকাল শোষিত হতে হতে নিরীহ প্রজারা বিদ্রোহের ধ্বজা তোলে এবং শাসক শ্রেণির অনিবার্য পতন ঘটে।

এটি একটি রূপক নাটক। এই নাটকে রাজা হবুচন্দ্র তীর্থ ভ্রমণে গেলে রাজার অনুপস্থিতিতে মন্ত্রী গবুচন্দ্র রাজ্য পরিচালনা করে। মন্ত্রীর আদেশে দেশের মানুষের মুখে সবসময় হাসি লেগেই থাকে। রাজা তীর্থ ভ্রমণ থেকে ফিরে প্রজাদের হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখে আনন্দিত হন। কিন্তু প্রজাদের কথা শুনে রাজা বুঝতে পারেন এটা মন্ত্রীর কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। প্রজারা রাজার কাছে তাদের বক্তব্য পেশ করছে এভাবে:

> হাসে, হাসতে হয়। এটাই রাজ্যের নতুন আইন। এইতো দেখুন আমি দুদিন খেতে পাইনি, স্ত্রী পুত্র দুদিন না খেয়ে উপবাস করেছে। হা–হা–হা তাও দেখুন মহারাজ হাসছি। কারো পেটে ভাত নেই কিন্তু দেখবেন সবাই হাসছে। হি হি করে হাসছে, হা হা করে হাসছে, দাঁত বার করে হাসছে। আজ্ঞে মহারাজ, গবুমন্ত্রী নতুন আইন করে দিয়েছেন

হাসতেই হবে। খেতে না পাও হাসবে, পড়তে না পারো হাসবে–জ্বর জারি হোক হাসবে, বাপ মা মরুক হাসবে–ছেলেপিলে মরুক হাসবে–কাঁদতে হয় সেও হেসে হেসে কাঁদবে। না হাসলেই শূলে চড়তে হবে। শূলের ভয়ে হাসছি।[৯০]

রাজা জানতে চাইলেন প্রজারা বিদ্রোহ করছে কিনা। প্রজারা জানালেন বিদ্রোহ হচ্ছে। হেসে হেসে বিদ্রোহ হচ্ছে। প্রজারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তাও হেসে হেসে হে-হে-হে। রাজা তখন বুঝতে পারলেন প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তখন রাজা হবুচন্দ্র কৌশলে প্রজাদের রাজ্যভাণ্ডার খুলে দিয়ে বিদ্রোহ দমন করলেন। কিন্তু কৌশলী রাজা প্রজাদের ঠাণ্ডা করে পরোক্ষে প্রজা শাসনের কৌশল হিসাবে 'হাসতে হবে' আইনটি বহাল রাখতে চাইছেন। রাজা বুঝতে পেরেছেন প্রজা শাসনের নামে শোষণ করার জন্য এই হাসতে হবে আইনের বিকল্প নেই।

সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তব তার প্রেক্ষাপটে শাসকদের–জনবিচ্ছিন্নতা এই নাটকের উপজীব্য বিষয়। এ নাটকে ব্যাঙ্গার্থে নাট্যকার বোঝাতে চেয়েছেন যে শাসকরা শাসনব্যবস্থার সমালোচনা সহ্য করে না। এমনকি বিদ্রোহ, প্রতিবাদকে দমনের কৌশল হিসাবে লোক দেখানো সংস্কার কর্মসূচী বহাল রাখেন।

শারদীয়া 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় **'এক টিন বার্নিশ'(১৯৬১)** প্রথম প্রকাশিত হয়। শয়তানের সিন্দুক থেকে এক টিন বার্নিশ চুরি গেছে। এমন হাতে গিয়ে তা পড়েছে যাতে সমস্যা সব চাপা পড়ে যায়। সব সমস্যার গায়েই লাগানো হচ্ছে উন্নয়নের বার্নিশ। শয়তানের অনুচর বার্নিশের

টিনের খোঁজ পেলেও তা উদ্ধারের বিষয়ে তারা হতাশা অনুভব করে। বার্নিশের টিন খুঁজতে গিয়ে যে চরিত্রগুলোর কথোপকথন শুনেছেন, তাতে ভোগসর্বস্ব এই পৃথিবীতে সবাই নিজ নিজ কামনা চরিতার্থ করায় ব্যস্ত–এই চিত্রই ফুটে উঠেছে। নাটকে দেখা যায়, রমণীর কাছে প্রৌঢ় ব্যক্তি লালসা চরিতার্থ করতে আসে। ভেজালের ব্যবসা করলেও জনৈক ধনী ব্যক্তি আইনের ধরা ছোঁয়ার বাইরেই রয়ে যায়। ভদ্রগোছের যে বর্ণনা নাটকে রয়েছে তাতে দেখা যায়, তেল ঘি কারখানার মালিক উৎপন্ন দ্রব্যে ভেজালে ভোক্তাকে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এরপর আসে নেতাও সহচর; উভয়ে প্রতারত ও ধূর্ত। নেতা সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা করছে। উপরোক্ত নেতা ও তার সহচরের কথোপকথন থেকে এই সত্যিই প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতারণা, ভোগ সর্বস্ব মানসিকতা, জনগণের প্রতিনিধি হয়েও জনগণের সাথে প্রতারণা করা, ঠকানো ও দেশের সম্পদ আত্মসাৎ করাই এদের উদ্দেশ্য। এই নাটকের মধ্যে যে বক্তব্য রয়েছে তা হল–সততা, ন্যায়নিষ্ঠা আজ পৃথিবীতে বিরল। নৈতিক মূল্যবোধ আজ উপহাসের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। নাটকে ৮টি চরিত্র রয়েছে–শয়তানের দুই অনুচর, প্রৌঢ়, তরুণী, ভদ্রলোক, ডাকাত, নেতা, সহচর। নাট্যকার নাটকের বক্তব্যকে যথাযথ সংলাপ ব্যবহারের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। নাট্যকা স্বভাবজাত লেখনীর দ্বারা ব্যঙ্গের চাবুকে আধুনিক সমাজ ও শাসন ব্যবস্থাকে কশাঘাত করেছেন।

'বলাকা' শারদীয়া সংখ্যায় **'দাওয়াই'(১৯৬১)** নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। দুটি হৃদয়ের চাওয়া পাওয়াকে কেন্দ্র করে এর নাট্যকাহিনী গড়ে উঠেছে। নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত শেষে মধুর

মিলনে নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে। সাঁওতাল পরগনায় প্রচণ্ড শীতের মধ্যে গভীর রাতে অরণ্যে সাঁওতাল–দম্পতির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এই নাটকের শুরু। এই নাটকে মংলু ও রাঙ্গী দুজনের মধ্যে দাম্পত্য কলহের কারণে একজন অন্যজনকে অবিশ্বাস, সন্দেহ করছে। আরেক সাঁওতাল মেয়ে ফুলিকে তার আয়না ও চিরুনি দেয়ার জন্য রাঙ্গী তার স্বামী মংলুকে অবিশ্বাস করে। রাঙ্গী মনে করে মংলু ফুলিকে ভালোবাসে। আর তাই দাম্পত্য কলহের এক পর্যায়ে উভয়ে উভয়কে পরিত্যাগ করতে চাইলে গ্রাম পঞ্চায়েত কোন প্রকার প্রস্তুতি ছাড়া এক কাপড়ে এক রাতের জন্য তাদের বনে নির্বাসন দেয়। একদিকে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং অন্যদিকে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ভয়ে দুজনেই ভীত। এসময় রাঙ্গী ও মংলু উভয় উভয়কে দোষারোপ করতে লাগল, হাড়িয়া খেয়ে, মাতাল হয়ে একজন অন্যজনকে মারধর করার জন্য শাস্তিস্বরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত এই গভীর বনে এক রাতের জন্য নির্বাসন দিয়েছে। রাঙ্গী নিজের মনের ক্ষোভ প্রকাশ করে বলল–আরেক সাঁওতাল মেয়ে ফুলিকে মংলু তার আয়না-চিরুনি কেন দিল ? রাঙ্গীর কথা শুনে মংলু বলল যে ফুলির খসম রাঙ্গীর জন্য উতলা হয়েছে ফুলিকে এখন আর ভালোবাসে না। তখন মংলু ফুলিকে রাঙ্গীর আয়না-চিরুনি দিয়ে বলল:

> ফুলি তোর রূপের বাহারটা আপনা চোখে দেখ। এই আয়নাটাকে দেখ–আয়নাটার দাম আছে পাঁচ পাঁচটা টাকা। তুহার পাঁচ সিকার আয়না ইটা না আছে। তু সে দেখলো। নিজের মুখটা তুর আয়নাতে দেখল তবে বুঝলো। বললাম এই ফুলি, তুহার খসম হামার

বহুটাকে কেন চুপি চুপি দেখবে, এবার সেটা বুঝলি? কোন ফুলটার কেমন বাহার দেখলি?'[৯১]

রাঙ্গী নিজের ভুল বুঝতে পেরে স্বামীর কাছে ক্ষমা চাইল। রাঙ্গী আফসোস করে বলল কেন সে এসব কথা আগে বলেনি; বললে তো দুজনের মধ্যে মারামারি হত না, তালাকের কথাও উঠত না। আর গ্রামের পঞ্চায়েত তাদের শীতের রাতে এই পাহাড়ে, জঙ্গলে বাঘের মুখে ঠেলে দিত না।

রাঙ্গীর কথা শুনে মংলু তখন বলল–

'তালাকের কথা যেই হবে পঞ্চায়েত লোক এই কাজটা করবে। ইটা হামাদের আইন আছে।'

দুজন কথা বলছে। একে অন্যের কাছে অভিযোগ-অনুযোগ করছে। এদিকে শীতের রাত। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় দুজন কাঁপছে। গ্রাম পঞ্চায়েত কৌশলে কাঁটা ভরা শিমুল গাছের মাথায় একটা কম্বল রেখেছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় নিরুপায় হয়ে মংলুর কাঁধে চড়ে রাঙ্গী শিমুল গাছ হতে কম্বলটি পেড়ে আনলো। এরপর দুজনে ঠাণ্ডার তীব্রতায় একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে শারীরিক উষ্ণতায় ঘুমিয়ে পড়ল। ঊষার আলো ফুটলে সেখানে সর্দার পঞ্চায়েতের প্রবেশ ঘটল। কম্বলাচ্ছাদিত দম্পতিকে দেখে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। শব্দ করে দুজনকে ডাকল। কোন সাড়া না পেয়ে হাতের লাঠি দিয়ে উভয়কে ঠেলা দিল। উভয়ে ধড়মড় করে জেগে উঠে সর্দারকে দেখল এবং তাকে হাসি মুখে

নমস্কার জানাল। সর্দার দুজনকে তালাক দেয়ার এখনও ইচ্ছা আছে কিনা জানতে চাইলে উভয়ে অসম্মতি জানায়। সর্দার তখন বললেন–

'বহৎ আচ্ছা। হামাদের হাতে এই দাওয়াইটা আছে তাই হামার জাতিটাতে তালাক না হবে–তালাক না হবে। (হেসে) চল ঘর চল।'[৯২]

মিলনান্তক এই একাঙ্ক নাটকের মধ্য দিয়ে একটি দম্পত্তির মধুর কলহ, শীতের রাতের প্রতিকূল পরিবেশে বনে থাকার কারণে ভয় পাওয়া, একে অন্যের সাথে একান্তে ও আন্তরিকভাবে কথা বলছে। এতে করে একজন অন্যজনের কাছে মনের দুঃখ-কষ্টের কথা বলছে এবং দুজনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়। নাটকের শেষাংশে সর্দারের আগমন এবং মংলু ও রাঙ্গীর সুন্দর মিলন দৃশ্য পাঠক ও দর্শককে নির্মল আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছে।

প্রকৃতি বনাম সভ্যতা। পরিবার প্রথার উদ্ভব। মত পার্থক্য বা প্রণয়জনিত সমস্যা। এর সমাধান হিসাবে নাট্যকার প্রকৃতির অকৃত্রিম সান্নিধ্যে উদ্ভুত সঙ্কটের সমাধান দেখিয়েছেন। মূলত সভ্যতার মধ্যে যে মিথ্যা, স্বার্থের সংঘাত, বস্তুতান্ত্রিক লোভ-লালসা, ভণ্ডামি–এসব থেকে মুক্তির জন্য প্রকৃতির সান্নিধ্যে যেতে হবে। এ নাটকটি এক দম্পত্তির দাম্পত্যের কাহিনী হলেও আমাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সুখী জীবন–যাপনের জন্য নাটকটি শিক্ষণীয় বটে।

'রবীন্দ্র ভারতী' পত্রিকায় **'সমান্তরাল'(১৯৬২)** নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। চরিত্র সংখ্যা তিন; পুরুষ-২, নারী-১। পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করেছে। দেশপ্রেমিক অধ্যাপক মনোজ বসু যুদ্ধের ত্রাণ-তহবিল সংগ্রহের জন্যে নানা জায়গায় সভা করে বক্তৃতা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করছেন। তাঁকে এ

কাজে সাহায্যে করছেন জয়া সেন, তাঁর সহকর্মিণী। অধ্যাপকের অসুস্থ স্ত্রী সবিতা ব্যাপারটিকে সহজভাবে নিতে পারে না, ভুল বোঝে। সেজন্য সে স্বামীকে মাথা ধরার ওষুধের বদলে ব্লাড-প্রেশার কমানোর বড়ি দেয়, যাতে পরদিন সে কোনো সভায় যেতে না পারে। এ ঘটনা কিন্তু গোপন থাকে না। পরে নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে। স্ত্রী সবিতা স্বামী (অধ্যাপক মনোজ বসু-দর্শন শাস্ত্র) সহকর্মী জয়া দেবীকে নিয়ে সন্দেহ করে। স্বামী মনোজ বসুর সাথে জয়া দেবীর সম্পর্কের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করছে। এর মধ্য দিয়ে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময়কার প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। মনোজ বসু মফস্বল শহরে কলেজ-কলোনীতে থাকেন। সকালে পাশের গাঁয়ে লড়াই-এর মিটিং করতে আর প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য টাকা তুলতে যাবার কথা। দেশপ্রেমমূলক গান গেয়ে জনতাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জয়া দেবী মনোজ বসুর সাথে যাবেন। স্ত্রী সবিতা জয়া দেবীর প্রসঙ্গ একদম সহ্য করতে পারেন না। হঠাৎ ফোন বেজে উঠলে সবিতা দেবী দৌড়ে ফোনের রিসিভার তোলেন:

"এ হয়েছে আর এক যন্ত্রণা। (ফোন ধরিয়া) হ্যাঁ, আমি মিসেস বোস। আপনি জয়া দেবী।... শ্যামপুর থেকে গাড়ি নিয়ে লোক এসেছে আপনাদের নিয়ে যেতে ?...বেশ তো, আপনি যান না।...না, উনি যেতে পারবেন না। (রিসিভারটি রাগত ভাবে রাখিয়া দিয়া, স্বামীর কাছে আসিয়া)...মিটিং করবার লোক কি তুমি শুধু একা ? দেশরক্ষার দায় কি একা তোমার-ই ? জয়া সেন কি একদিনও একা যেতে পারেন না ?"

মনোজ–– জয়া সেন তো আর বক্তা নন। বক্তা আমি।

সবিতা––তবে উনি যে সব মিটিং এ ধেই ধেই করে তোমার সঙ্গে যান, কেন যান ? রূপ দেখাতে যান?

মনোজ––বলেছি তো, দেশপ্রেমের গান গেয়ে আসর আগুন করে তোলেন উনি। বক্তৃতার চেয়েও কাজ হয় তাতে বেশী।[৯৩]

স্বামী, স্ত্রীর কথোপকথনের মধ্যে ডাক্তার আসেন। ডাক্তার মনোজ বসুর কাছে জানতে পারেন মনোজ বসু গত রাতে মিটিং সেরে বাড়ি ফেরার পর থেকে অসহ্য মাথা ব্যথায় ভুগছেন। স্ত্রী সবিতাকে প্রশ্ন করে জানতে পারলেন মাথা ধরার তিনটি ওষুধই স্বামীকে খাইয়েছেন। কিন্তু মাথা ধরা তো কমছেনা বরং অবসন্নতা বেড়েই চলেছে। পুরো শরীর জুড়ে প্রচণ্ড অবসাদ অনুভব করছেন। সব শুনে ডাক্তার সবিতা দেবীর কাছে জানতে চাইছেন মাথা ধরার ওষুধের পরিবর্তে স্বামীকে ব্লাড প্রেশার কমানোর পিল খাইয়েছেন কিনা জানতে চাইলে সবিতা দেবী অস্বীকার করেন। তিনি ডাক্তারকে বললেন স্বামীকে মাথা ধরার ওষুধই দিয়েছেন। ডাক্তার চলে গেলে মনোজ বসু স্ত্রীর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বললেন:

"তুমি আমায় কাল রাতে মাথা ধরা সারাবার পিল না দিয়ে ব্লাড প্রেসার নামাবার পিল দিয়েছ। এমন অবসাদ এনে দিয়েছ যে, মাথা তুলতে পারছি না আজ। না-না, প্রতিবাদ করো না। তোমার ইচ্ছে ছিল না জয়া সেনকে নিয়ে মিটিং করতে যাই আজ।

সবিতা––এতটা নীচ তুমি আমাকে ভাবছো!

মনোজ––যখন ওষুধ দিয়েছিলে তখন তুমি তোমাতে ছিলে না সবিতা। অবচেতন মন কাজ করে যাচ্ছিল, আর তা হচ্ছিল তোমার বাহ্য চেতনার অজ্ঞাতে।"[৯৪]

স্বামী- স্ত্রীর উত্তপ্ত কথাবার্তার এক পর্যায়ে মনোজ বসু স্ত্রীকে জানায় কমিশনড্ মিলিটারি অফিসার হিসাবে তার এপয়েন্টমেন্ট লেটার এসেছে। শুধু স্ত্রীর শারীরিক অসুস্থতার জন্য নিজেকে দূরে রেখেছেন। সবিতা দেবী স্বামীর কথা শুনে অবাক হন। স্বামীর কথা থেকে আরও জানতে পারেন জয়া সেনও নার্সের চাকরি নিয়ে দেশের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার মনস্থির করেন। সবিতা দেবী নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং তার প্রতি স্বামীর দায়িত্ববোধ ও ভালোবাসার কথা উপলব্ধি করে আনন্দ ও ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে ওঠেন। একাঙ্কটিতে নাট্যকার দেশপ্রেমিক অধ্যাপক ও তার সন্দেহপ্রবণ বাতিকগ্রস্ত স্ত্রীর মানসিক বিশ্লেষণ নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। এ নাটকে নাট্যকার সংলাপ ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নাট্যকার পরিবেশ ও চরিত্রের ধরণ অনুযায়ী অধ্যাপকের স্ত্রী সবিতার সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত মানসিকতার সফলরূপ অঙ্কন করেছেন।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় **'শ্রেষ্ঠ শাশুড়ী পুরস্কার প্রতিযোগিতা' (১৯৬২)** নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। চরিত্র সংখ্যা পাঁচ; পুরুষ-৩, নারী-২। মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের বউ-শাশুড়ী দ্বন্দ্বের চিরন্তন সমস্যার সুন্দর চিত্রায়ণ। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের গল্প। শীতলা দেবী পরিবারের কর্ত্রী, নববধূ ক্ষমা, বড় ছেলে মহিম, ছোট ছেলে দেবেশ। শীতলা দেবী বদরাগী স্বভাবের, তার অত্যাচারে বড় ছেলের প্রথম স্ত্রী মারা যায়। মহিম দ্বিতীয়বার বিয়েতে সম্মত ছিল না। শুধু সংসার অচল হয় বলে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে। শাশুড়ী শীতলা দেবীর অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা

কাশী-বৃন্দাবন-হরিদ্বার-কন্যাকুমারী তীর্থ করতে যাওয়া, কিন্তু পুত্রদের আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য তার ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে যায়। আর তাই সমস্ত ক্ষোভ, সমস্ত রাগ পুত্রবধূর উপর প্রকাশ করেন। ছোট ছেলে দেবেশ কৌশলে সংবাদপত্রে 'শ্রেষ্ঠ শাশুড়ী পুরস্কার প্রতিযোগিতা'র নাম করে মা শীতলা দেবীকে দিয়ে ভাবীকে সেবা করিয়ে নেয়। পুরস্কার হিসাবে পাঁচশ টাকা প্রাপ্তির কথা শুনে শীতলা দেবী পুত্রবধূ ক্ষমাকে সেবা করতে সম্মত হন। সাংবাদিক তার সেবারত ছবি খবরের কাগজে প্রকাশ করবেন। শীতলা দেবী পুরস্কারের আশায় ফটো সাংবাদিকের সামনে পুত্রবধূকে সেবা করার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পুত্রবধূকে চুল বেঁধে দেয়া, পান বানিয়ে খাওয়ানো শেষ পর্যন্ত কোনটিই শীতলা দেবীর মনঃপূত হয় না। তখন পুত্র মহিমের কাছে হাত পাখা চাইলেন, ঘরে ইলেকট্রিকের ফ্যান থাকতে পাখা দিতে ব্যর্থ হলে শীতলা দেবী প্রচণ্ড রেগে যান। ছেলেকে ভর্ৎসনা করে বললেন,

"তর্ক করিস না মহিম, আমার পেটেই তুই হয়েছিস, তোর পেটে আমি হইনি। বিজলীর হাওয়া অনেক রোগীর সয় না, ঘরে পাখা নেই, তাতে কী হয়েছে, আঁচল দিয়ে হাওয়া করছি আমি। একটু কোঁ-কোঁ কর বউমা। কী ! এত করে বলছি, তাতেও তোমার কানে যাচ্ছে না, শতেক-খোয়ারীর ঝি ? "[৯৫]

ফটো সাংবাদিক সুনীল দ্রুত ছবি তোলার প্রস্তুতি নেয়ার জন্য শীতলা দেবীকে তৈরি হতে বললেন।

শীতলা দেবী––একে মাথা–(বৌয়ের মাথা টিপতে লাগলেন)

সুনীল––দুই– ।

শীতলা দেবী––দুইয়ে হাত ! (বৌয়ের হাত টিপতে লাগলেন)

সুনীল––তি–ন !

শীতলা দেবী––তিনে–পা ! (বৌয়ের পা টিপতে লাগলেন)

সুনীল–থ্যাঙ্কস। একেবারে চরম ![৯৬]

ফটো সাংবাদিক সুনীল চলে গেলে পুত্রবধূ ক্ষমা শাশুড়ি শীতলা দেবীকে প্রকৃত সত্য কথাটা বলে দেয়। পুরস্কারের প্রসঙ্গ, ছবি তোলা এসবই আসলে মিথ্যা, এসব আসলে ছোট ছেলে দেবেশের চালাকি। শাশুড়ি যাতে পুত্রবধূকে ভালবাসে সেজন্য দেবেশ এই ধরনের চালাকি করেছে। অবশেষে ক্ষুব্ধ, হতাশ মাকে শান্ত করার জন্য বড় ছেলে মহিম পূজার বোনাস হিসাবে পাওয়া পাঁচশ টাকা তীর্থ করার জন্য মাকে দেয়। মা শীতলা দেবী টাকা পেয়ে সমস্ত ক্ষোভ, রাগ ভুলে পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করলেন। এ নাটকে শাশুড়ি শীতলা দেবী চরিত্রটি নাটকের কেন্দ্র বিন্দুতে ছিল। শীতলা দেবীর প্রচণ্ড রাগী মূর্তি, পুরস্কারের টাকা পাওয়ার পর বিগলিত মূর্তি, নাটকের শেষাংশে হতাশার অবয়ব, অবশেষে তীর্থে যাওয়ার টাকা হাতে পেয়ে অতি আনন্দিত হওয়ার স্বরূপ–সব মিলিয়ে শীতলা দেবী চরিত্রটি নাট্যকার দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্যান্য চরিত্রগুলো নাটকটিকে সফলভাবে সমাপ্তির দিকে নিয়ে গেছে। মূলত একাঙ্কটি অনাবিল হাসির ফল্গুধারায় মধুর হয়ে উঠেছে। নাটকের সংলাপ ব্যবহারে নাট্যকার বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। প্রত্যেকটি চরিত্রের মুখ নিঃসৃত সংলাপ চরিত্রগুলোকে আরও জীবন্ত করে তুলেছে। সর্বোপরি বলা যায়, এ নাটকটি মানুষের স্বার্থপরতার

নির্ভেজাল কমেডি। হাস্য রসের মাধ্যমে তা প্রকাশ করা হয়েছে। আকাশবাণী কেন্দ্র থেকে বেতার নাটক হিসেবে এটি সাফল্যের সঙ্গে অনেকবার প্রচারিত হয়েছে।

'বেতার জগৎ' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় **'মুখোশ'(১৯৬২)** নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। চরিত্র সংখ্যা আট; পুরুষ-৬, নারী-২। এই একাঙ্কটিতে সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। নিঃস্পৃহ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রত্যেকের মুখোশ খুলে দেওয়া হয়েছে। পতিতা রমণী সমাজের চোখে অসতী হলেও মহত্ত্বে যে সে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের চেয়ে অনেক ওপর তলার মানুষ–এটি ঘটনাচক্রে প্রমাণিত হয়ে যায়। শেষে দেখা যায় সমাজের মান্য ধর্মাত্মা বলে পরিচিত মানুষের দল তার উপার্জিত অর্থের লোভে তাকে ঘিরে ধরেছে। তাদের নীচ লোভী স্বার্থপর মনুষ্যত্ববোধ বর্জিত চরিত্রের স্বরূপ এ একাঙ্কে সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

নাটকের প্রধান চরিত্র শ্রীমতী প্রতিমা চৌধুরী। এ নাটকের পটভূমি হিসাবে প্রতিমা চৌধুরীর সৌধ ভবনের উপবেশন কক্ষকে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিমা চৌধুরীর প্রচুর অর্থবিত্ত থাকলেও এককালের দেহপসারিণী বলে সামাজিকভাবে ঘৃণিত ও অস্বীকৃত। প্রতিমা চৌধুরীর বর্তমান বয়স পঞ্চাশ বছর। তিনি মনস্থির করেছেন জীবনের বাকি দিনগুলো বৃন্দাবনে গুরুদেবের সান্নিধ্যে কাটাবেন। একটু শান্তির জন্য বৃন্দাবনে গুরুদেবের কাছে ছুটে যেতে চান। এই কলকাতা শহর আর তাকে টানছে না। রাতে ঘুম হয় না, মানসিক অস্থিরতা, শারীরিক অসুস্থতা তাকে দিশেহারা করে তুলেছে। ব্লাডপ্রেশার এত বেশি যে যেকোন সময় মৃত্যু হতে পারে। আর তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গুরুদেবের আদেশে এখানকার মায়া কাটিয়ে সমস্ত সম্পত্তি উইল করে দিয়ে যাবেন। আর তাই উইল করা অর্থ আগতদের

মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে এ উপলক্ষে প্রতিমা চৌধুরীর সৌধ ভবনের উপবেশন কক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত ব্যক্তিবর্গ ও উকিল সকলে উপস্থিত আছেন। উকিল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির জন্য বরাদ্দ অর্থ প্রদানের বিবরণ পড়ছেন, ঠিক তখনই প্রতিমা চৌধুরী উইল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। প্রতিমা চৌধুরী মনে করেন তারই মত সমাজে যারা অসহায়, সামাজিকভাবে নিগৃহীত শেষ বয়সে অর্থবিত্তহীন, আত্মীয়-পরিজন শূন্য অবস্থায় জীবন কাটাতে হয়। তিনি চান এই অসহায়াদের জন্য সমস্ত সম্পত্তি দান করে যাবেন। যদিও অতি উত্তেজনার কারণে ব্লাডপ্রেশারের রোগী প্রতিমা চৌধুরী নাটকের শেষাংশে স্ট্রোক করে মারা যান। এ নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার সমাজের চতুর, অসংযত জৈবিক তাড়নায় পর্যুদস্ত মানুষের কারণে সমাজের ভাগ্য বিড়ম্বিত এই সব নারীদের অসহায়ত্ব ও মানসিক যন্ত্রণার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। 'মুখোশ' নাটকের নামকরণের মধ্যে এই সত্য নিহিত আছে। নাটকের প্রধান চরিত্র প্রতিমা চৌধুরী, অন্যান্য চরিত্র হল উকিল, পালিত পুত্র আনন্দ, আশ্রমের স্বামীজী, আশ্রমের সেক্রেটারী, স্কুল সেক্রেটারী, ভৃত্য বনমালী, বিশ্বস্ত দাসী মোক্ষদা, বাজার সরকার, ডাক্তারসহ মোট ৯টি চরিত্র। নাটকের সংলাপ ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আগত ব্যক্তিদের কথাবার্তা থেকে প্রতিমা চৌধুরীর প্রতি তাদের নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। ব্রহ্মচর্য সাধনাশ্রমের প্রতিনিধি স্বামীজী বললেন:

"আমি ব্রহ্মচর্য সাধনাশ্রমের প্রতিনিধি রূপে আজ এখানে এসেছি। আপনি আমাদের সাধনাশ্রমে দশহাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা উইলে করেছেন, এটা জানিয়েছেন। আমি আপনাকে আজ

জানাতে এসেছি যে, আপনার ঐ দান গ্রহণ করতে আশ্রমের কর্তৃপক্ষ অসমর্থ। ঐ টাকা পাপের টাকা। ব্যভিচার অর্জিত টাকা আর যেই গ্রহণ করুক, ব্রহ্মচর্য আশ্রম গ্রহণ করতে পারে না।"[৯৭]

যদিও নাটকের শেষাংশে আশ্রম সেক্রেটারী এসে জানান আশ্রমের কার্যনির্বাহক সমিতির বিশেষ জরুরী মিটিং-এ আশ্রমের জন্য প্রদত্ত অর্থ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এছাড়া অন্যান্যরা প্রাপ্ত অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনায় প্রতিমা চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। স্কুল সেক্রেটারী বললেন, "দাত্রী শতায়ু হোন। আমাদের স্কুলের যে দশা, যে দুর্দশা চলছে, তাতে প্রতিমা দেবীর এই মহৎ দান–যাকে বলে 'গডস্ সেন্ট' মানে ঈশ্বর প্রেরিত। ওঁর ঐ কৃপাদৃষ্টির জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"[৯৮]

মূলত নাট্যকার প্রতিমা চৌধুরীর মনঃকষ্ট, অন্তর্নিহিত যন্ত্রণাকে যথাযথ সংলাপ ব্যবহারের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন, "আমি যে পতিতা নারী, সেটা আমি অস্বীকার করছি না। সমাজে কোন্ কোন্ রথী-মহারথী আমার এখানে টাকা ঢেলে, আমাকে এত বড় করেছেন। আমি মারা গেলে, সে সব নাম আপনারা খুঁজে পাবেন আমার চিঠিপত্রে।"[৯৯]

একজন পতিতা সমাজের কাছে কতটা অবহেলিত, ঘৃণিত হতে পারে তার কিছুটা স্বরূপ এ নাটকে উন্মোচিত হয়েছে। এ নাটকে প্রতিমা চৌধুরী চরিত্রের বিশেষত্ব হলো প্রতিমা চৌধুরী প্রচুর টাকার মালিক, নাট্যকার এ নাটকে অর্থনিয়ন্ত্রিত সমাজের মুখোশ উন্মোচন করেছেন এবং সমাজের নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরেছেন। নাটকের শেষাংশে প্রতিমা চৌধুরীর মৃত্যু দর্শককে বেদনাকাতর করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

'বেতার জগৎ' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় **'সত্যমেব জয়তে'(১৯৬২)** নাটকটি প্রকাশিত হয়। 'কুম্ভমেলা' হল বার বছর পর পর মাঘ ফাল্গুন মাসে তিথি বিশেষে হরিদ্বার, প্রয়াগ, দ্বারকায় মেলা বসে এবং সাধু সন্ন্যাসীদের মহাসম্মেলন হয়। এই মেলা বা মহাসম্মেলনে আগত পাঁচজন সাধু ও স্বয়ং আচার্য উপস্থিত। এ নাটকের পটভূমি হিসাবে রয়েছে কুম্ভমেলার শেষ দিবস, স্থান–'ওঁ তৎসৎ' আশ্রমের সাধনচক্র ; সময়–সন্ধ্যা রাত। কুম্ভমেলার এই শেষ দিনটিতে ওঁ তৎসৎ আশ্রমমার্গী হিসাবে শেষ কাজ এ বছরের শ্রেষ্ঠ সৎ মহাপুরুষটিকে অভিনন্দন ও আশীর্বাদ জানানো। উপস্থিত পাঁচজন সাধু তারা জানতে চাইছে এ বছরের শ্রেষ্ঠ সৎ মহাপুরুষটি কে ? তারা কি ভাবছেন শুধু অভিনন্দন ও আশীর্বাদেই কি শ্রেষ্ঠ সৎ মহাপুরুষের উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হবে ? জবাবে আচার্য বললেন ধন সম্পদ নয় বরং সদিচ্ছা শুভেচ্ছা জ্ঞাপনই আমাদের একমাত্র ঐশ্বর্য। সকলের মধ্য থেকে পঞ্চম সাধু জানালেন গত বছর কুম্ভমেলার সময়ে স্বয়ং আচার্যকে শ্রেষ্ঠ সৎ মহাপুরুষ নির্বাচনের গুরুভার অর্পণ করা হয়েছিল। মহামান্য আচার্য স্বীয় যোগবলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বছরের শ্রেষ্ঠ সৎ মহাপুরুষটিকে নির্বাচন করবেন। অবশেষে আচার্যের আহবানে শ্রেষ্ঠ সৎ মহাপুরুষ হিসাবে একটি গুণ্ডা, মূর্তিমান এক শয়তান আবির্ভূত হয়। উপস্থিত সাধুগণ অবাক, বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হন। মহামান্য আচার্য সকলকে শান্ত হতে অনুরোধ জানান। মহামান্য আচার্য সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

''যোগ শক্তি প্রভাবে উপযুক্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত যে, বর্তমান সমাজে একমাত্র এই লোকটির কর্ম এর চিন্তাকে অনুসরণ করে। একমাত্র এই লোকটির কার্যাবলী ও বাক্যাবলী আমি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছি। একে আমি বুঝতে পেরেছি, চিনতে পেরেছি,

জানতে পেরেছি, যা অন্য কাউকে যোগবলেও পারিনি। এই শয়তান মনে যা ভেবেছে মুখে হয়তো বলেনি, কিন্তু কাজে তা করেছে। কিন্তু অন্য সব লোক সম্পর্কে আজ আর এ কথা বলা চলে না। তারা মনে ভাবে এক, মুখে বলে আর এক, কাজে করে অন্য কিছু। তাদের মন-মুখ ও কাজের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য থাকে না আজ। এই যে শয়তান তার মুখে শান্তির বাণী নেই। কারো উন্নতি বা উন্নয়নের কথাও সে বলে না, চিন্তাও করে না। অপরের সর্বনাশই সে চিন্তা করছে। তাকে বুঝতে পারি আমরা। তার চিন্তা ও কার্যের সামঞ্জস্য ও সততা সন্দেহাতীত। আর এই শয়তানই আজ সত্যাশ্রয়ী ও নিঃসন্দেহে সৎ–শ্রেষ্ঠ।"[১০০]

উপস্থিত সকল সাধু আচার্যের এই মতকে সমর্থন জানাল। এবং সকলেই এক স্বরে বলে উঠল 'সত্যমেব জয়তে' ! সকলেই উত্তোলিত হস্তে শয়তানকে আশীর্বাদ করল।

এ নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার সমাজের অধঃপতিত, মূল্যবোধহীন, ভঙ্গুর অবস্থাকে নির্দেশ করেছেন। নাট্যকার নাটকের চরিত্রগুলোর কথোপকথন থেকে এই সত্যকে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন যে, মানুষ এতটাই অধঃপতিত হয়েছে যে নিকৃষ্ট শয়তানও মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভে সক্ষম হয়েছে। নাট্যকার স্বল্প পরিসরে যথাযথ সংলাপ ব্যবহারের মাধ্যমে নাটকের অন্তর্নিহিত ভাব অর্থকে সার্থকভাবে প্রকাশে সক্ষম হয়েছেন। নাটকে সাতটি চরিত্র; স্বয়ং আচার্য, পাঁচজন সাধু এবং শয়তান।

'আনন্দধারা' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় **'স্বর্গের সিঁড়ি'(১৯৬২)** নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। চরিত্র সংখ্যা-পাঁচ, নারী বর্জিত একাঙ্ক। নাটকের ঘটনাস্থল পুরীর সমুদ্রতীর। ইন্দ্র বিশ্বকর্মাকে অনুরোধ করেন যে অমরাবতীতে তিনি যেন এমন এক মন্দির নির্মাণ করে দেন যার অপরূপত্ব

জগন্নাথদেবের মন্দিরের সৌন্দর্যকেও হার মানাবে। বিশ্বকর্মা জানালেন মর্ত্যের মানুষের সাহায্য ছাড়া সে কাজ সম্ভব নয়। মানুষই পারে তার সীমিত আয়ুষ্কালের মধ্যে বিরাট সৃষ্টির রহস্য ও যাদু আয়ত্ত করতে। কারণ ক্ষণস্থায়ী জীবনের স্বল্প পরিসরের মধ্যেই তাকে রূপে রসে গন্ধে শতদলে বিকশিত হয়ে উঠতে হয়। সুতরাং মানুষের সাহায্যে স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি করে তবেই মন্দির বানানো যাবে। স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি হলে স্বর্গ ও মর্ত্যের ভেদ ঘুচে যাবে, জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য ঘুচে যাবে দেখে ব্রহ্মা কৌশলে দেবকুলের মধ্যে আত্মকলহের সূচনা করলেন। ব্রহ্মা মর্ত্যবাসীদের অভিশাপ দিলেন:

> "এই মুহূর্তেই আমি অভিশাপ দিচ্ছি মর্ত্যবাসীরা এই দেবভাষা বিস্মৃত হোক–মর্ত্যবাসীরা দেবভাষা বিস্মৃত হোক–মর্ত্যবাসীরা দেবভাষা বিস্মৃত হোক। আমার অভিশাপে মানুষ দেব-ভাষা বিস্মৃত হয়েছে। বিশ্বকর্মার একটি কথাও মানুষের বোধগম্য হবে না। "[১০১]

ব্রহ্মার অভিশাপে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মানুষের বিভিন্ন রাষ্ট্রের শিল্পীদের পরিণতি দেবতা মহেশ্বরের উক্তি থেকে জানা যায়:

> "জানো ভগবান বিষ্ণু আমি আমার ত্রিনয়নে কি দেখতে পাচ্ছি ? বিভিন্ন রাষ্ট্রবাসীদের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে বাগ্-বিতণ্ডা নিজ নিজ ভাষায়–যে ভাষা অন্য রাষ্ট্রভাষী বুঝতে পারছে না। দেখ দেখ রহস্য দেখ। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাষার গুণ-কীর্তণ করছে, শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করছে এবং তাতে যে আত্মকলহের সৃষ্টি হচ্ছে–তাতে শিল্পী সংহতি নষ্ট হচ্ছে।"[১০২]

স্বর্গের সিঁড়ি রচিত হলে স্বর্গ-মর্ত্যের ভেদাভেদ ঘুচে যাবে, জন্ম-মৃত্যুর যে রহস্য তা আর থাকবে না। এমনকি মাটির মানুষের সঙ্গে স্বর্গের দেবতার এই যোগাযোগে মানুষ হারাবে তার মনুষ্যত্ব, দেবতা

হারাবে তার দেবত্ব। অতএব স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি বন্ধ হল। পৌরাণিক বিষয় নিয়ে এ নাটকটি রচিত হলেও নাট্যকার মন্মথ রায় যুক্তি–বুদ্ধির প্রয়োগে নাটকটিকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন। এখানেই নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ নাটকে সংলাপ বিনির্মাণে নাট্যকার পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। নাটকে পাঁচটি দেবতা চরিত্র (ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বিশ্বকর্মা) স্ব স্ব অবস্থান থেকে নাটকটিকে সার্থকভাবে সমাপ্তির দিকে নিয়ে গিয়েছেন। নাট্যকার দেবতা চরিত্র নির্মাণে সফল হয়েছেন।

উইকিপিডিয়া থেকে প্রাপ্ত বাইবেলের কাহিনী 'টাওয়ার অব বেবেল' 'Tower of Babel' অংশে বলা হয়েছে, বাইবেলের আদি পুস্তক অনুসারে 'নোয়া'র বংশধরেরা একটি নগরী ও একটি টাওয়ার নির্মানের পরিকল্পনা করে। এই টাওয়ারটি টাওয়ার অব বেবেল নামে পরিচিত। যার চূঁড়া স্বর্গে পৌঁছে যাবে। এই টাওয়ার তৈরি হতে দেখে ঈশ্বর মনে করলেন মানুষ অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, তাই মানুষকে এই কাজ থেকে বিরত রাখতে একদিন পরস্পরের ভাষা আলাদা করে দিলেন। কেউ কারও কথা বুঝতে পারল না এবং যোগাযোগের অভাবে টাওয়ার নির্মাণের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে ঈশ্বর মানব শ্রেণিকে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। আলোচ্য 'স্বর্গের সিঁড়ি' নাটকে রূপক অর্থে স্বর্গের সিঁড়িকে বোঝানো হয়েছে। মূলত পৃথিবীকে স্বর্গের মতো পরিপূর্ণ করতে এই স্বর্গের সিঁড়িকে কল্পনা করা হয়েছে।

'শারদীয়া' পত্রিকার 'স্বাধীনতা' সংখ্যায় **'একটি রাজকীয় মৃত্যু'(১৯৬২)** নাটকটি প্রকাশিত হয়। নাটকে পুরাকালকে সময় হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। স্থান–রাজপ্রাসাদ। নাটকের প্রধান চরিত্র

তিনটি ; রাজা স্বয়ং, রানী, মহামন্ত্রী। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে দ্বারপাল, রাজবৈদ্য, দক্ষিণাবর্ত ও বামাবর্তের প্রতিনিধিসহ মোট ৭টি চরিত্র। রানীর যবনী কৃতদাসী তৃষাকে নিয়ে রাজা–রানীর মধ্যে দূরত্ব তৈরি হলেও তৃষাকে মঞ্চে আনা হয়নি। নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অসাধারণ সংলাপের ব্যবহারে প্রতিটি চরিত্র পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

রাজ্যের মহামন্ত্রী রাজ্যের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের মঞ্জরীপত্র স্বাক্ষর করার জন্য রাজার কাছে নিয়ে এসেছে। এই মঞ্জরীপত্রে আছে বামাবর্তের প্রজাপুঞ্জ শিক্ষা বিস্তার ও প্রসারের জন্য আয়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দাবী জানিয়েছে। আর দক্ষিণাবর্তের প্রজাপুঞ্জ শিক্ষা বিস্তারের চেয়েও স্বাস্থ্যের উন্নতি, পথঘাটের প্রসার, বানিজ্যের বিস্তার, কৃষিকাজের সম্প্রসারণ ও সংস্কৃতিমূলক কলাচর্চার বিকাশের জন্য দাবী জানাচ্ছে। রাজা দুই রাজ্যের প্রজা-প্রতিনিধিদের বললেন:

> "শোন দক্ষিণাবর্ত, তোমার কাম্য হচ্ছে অন্ধকার–যে অন্ধকারের সুযোগে দস্যু করে দস্যুতা, শাসক করে শোষণ, প্রবল করে দুর্বলকে পেষণ। আর তুমি বামাবর্ত, তুমি চাইছো শিক্ষার আলোকে সেই অন্ধকার দূর করতে, যে আলোকে উদ্ভাসিত হবে সমগ্র জাতি, প্রতিষ্ঠিত হবে এক শোষণহীন সমাজ, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাই যে সমাজের লক্ষ্য। আজ অকপটে তোমাদের কাছে ঘোষণা করছি যে শিক্ষার ঐ আশ্চর্য শক্তিকে আমি ভয় করি। রাজত্ব করার লোভ রয়েছে আমার, একাধিপত্যের লালসা রয়েছে আমার। আর তা আছে বলেই ছলে-বলে-কৌশলে শিক্ষার অগ্রগতি রোধ করছি। হ্যাঁ এইবার সত্যটা বলতে পেরে আমি সুস্থ বোধ করছি, শান্তি পাচ্ছি।"[১০৩]

নাটকের প্রধান চরিত্র মহামন্ত্রী মন্ত্রীত্ব পদ পাওয়ার জন্য যত ধরনের অপকর্ম করেছে তা রাজার সংলাপের সার্থক ব্যবহারে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। মহামন্ত্রীর গুপ্ত অন্যায় কাজের কথা রাজা অকপটেই বলে দিচ্ছেন। মহামন্ত্রীত্ব পদ পাওয়ার জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপসারণ করতে বিষ প্রয়োগে গুপ্ত হত্যার কথা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে উপপত্নী করে রাখার গুপ্ত সত্য কথাটা প্রকাশ করলেন। মহামন্ত্রী রাজাকে যত্র-তত্র সত্য কথা বলা থেকে নিবৃত করতে চাইলে রাজা মহামন্ত্রীর আরও কুকীর্তির কথা প্রকাশ করলেন, "বিদ্রোহী প্রজাশক্তিকে দমন করতে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছিলাম আমি আর এই মন্ত্রী। যে দুর্ভিক্ষে প্রাণ গেছে শত শত প্রজার।"

অবশেষে রানী ও মহামন্ত্রী রাজার এই সর্বনেশে আচরণ থেকে রাজাকে নিবৃত করতে, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নানাবিধ গুপ্ত কথা প্রকাশ না হওয়ার জন্য, রাজ্যের মঙ্গল কামনায় রাজবৈদ্যের দেয়া পথ্য রাজাকে সেবন করানো হয়। মুহূর্তেই মৃত্যুর প্রশান্তি রাজাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। রাজা গভীর ঘুমে নিমজ্জিত হলেন। রানী আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলতে লাগলেন:

> "রাজা ! আমার রাজা ! তোমার রাজ–সম্মান রক্ষা পেয়েছে। এইবার ঘুমোও রাজা, ঘুমোও ! শুধু তোমার সম্মান রক্ষা হয়নি প্রিয়তম, তোমার রানীর সামাজিক প্রতিষ্ঠাও রক্ষা পেয়েছে। এইবার আমি নিশ্চিন্ত। শ্রান্ত–ক্লান্ত আমার অশান্ত রাজা, ঘুমোও। তোমার অধরে এখনো লেগে রয়েছে সুখ নিদ্রার পরম ঔষধ। ঐ অমৃত লেহন করে আমিও এখন ঘুমিয়ে পড়ব তোমার বুকে। আঃ ! আজ কতদিন তোমার চুম্বন পাইনি। নিশ্চিন্ত মনে তোমার অমৃত অধরে একটি চুম্বন এঁকে দিব আমি আজ।...কে আছ, আলো নিভিয়ে দাও। আলো নিভিয়ে দাও।"[১০৪]

নাটকের শেষাংশে সম্মান রক্ষার্থে রানী রাজাকে বিষ পান করিয়ে নিজেও বিষ পান করে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। নাটকের শেষাংশে রানীর আর্ত হাহাকার, রাজার প্রতি রানীর প্রগাঢ় ভালোবাসা সংলাপের যথাযথ ও সার্থক ব্যবহারে প্রকাশ পেয়েছে। যথোপযুক্ত সংলাপ ব্যবহারে রাজা চরিত্রের অন্তর্নিহিত যন্ত্রণার স্বরূপ নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছে। রাজা চরিত্রে নির্মম সত্য কথা বলানোর মাধ্যমে নাট্যকার সুকৌশলে সমাজে বিদ্যমান অনিয়ম, দুর্নীতি, অপরাধপ্রবণতাকে নির্দেশ করেছেন। রাষ্ট্রের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ নানারকম দুর্নীতি ও অপরাধপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। দেশে সম্পদের অসম বণ্টন, প্রজার স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তি স্বার্থকে বড় করে দেখা–সমসাময়িক কালে যেসব নেতিবাচক দিকগুলো নাট্যকার ঘটতে দেখেছেন, সেসব দিকগুলোকে উপজীব্য করে বক্তব্যধর্মী আলোচ্য নাটকটি রচনা করেছেন।

'সপ্তর্ষি' পত্রিকার (ষষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা) **'বিস্মৃত তরঙ্গ'(১৯৬২)** নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান নেতা ক্রুশ্চভের জীবনের একটি কোমল মুহূর্তের চিত্রায়ণ আলোচ্য একাঙ্ক নাটকের বিষয়। নাটকের পটভূমি হিসাবে অস্ট্রিয়ার একটি হোটেলের প্রতীক্ষাকক্ষকে নির্ধারণ করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান নেতা নিকিতা ক্রুশ্চফ এই অঞ্চলে সফরে এসেছেন। এবং একটি হোটেলে উঠেছেন। সেই অনুযায়ী হোটেলের সাজসজ্জা ও জাঁকজমকে পরিপূর্ণ। পাঁচজন পুরুষ ও তিনজন মহিলা মহান নেতা ক্রুশ্চফের সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। মহিলা পুরুষ প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে কথোপকথনরত। তারই মধ্যে মহান নেতা ক্রুশ্চভ তাঁর ত্রিশ বছর আগের

দেখা বান্ধবী তাতিয়ানাকে আবিষ্কার করেন। শ্রমিক তাতিয়ানা যে একদিন ক্রুশ্চভের জীবনে প্রথম আনন্দের উৎস হয়ে এসেছিল দুজনের কথোপকথন থেকে তাই ব্যক্ত হয়েছে।

মহিলারা নিকিতা ক্রুশ্চফের সাথে অতীতের পরিচয় প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করছেন। অপেক্ষারত দ্বিতীয় মহিলা স্মরণ করেন একবার ট্রেনে কমরেড ক্রুশ্চফের সাথে যাত্রা পথে আলাপ হয়। দীর্ঘক্ষণ আলাপের প্রসঙ্গ নিয়ে অপেক্ষারত দ্বিতীয় মহিলা গল্প বলতে থাকেন। উপস্থিত অন্যান্য মহিলারা তার গল্প শোনেন। উপস্থিত আগত নারী পুরুষদের আলাপচারিতার এক পর্যায়ে উচ্চ পদস্থ দেহরক্ষী অফিসারটি ঘোষণা করলেন যে কমরেড ক্রুশ্চফ এসে গেছেন। সকলে ব্যস্ত সমস্তভাবে কমরেড ক্রুশ্চফকে অভ্যর্থনা করার জন্য প্রস্তুত হল। কমরেড ক্রুশ্চফ প্রবেশ করার পর সকলে সমস্বরে 'মীর-ই-দ্রসবা' বলে অভিনন্দন জানাল। কমরেড আগত এই সকল অতিথিদের সাথে লাঞ্চ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। আগত অতিথিদের অতিথিশালায় নিয়ে যাওয়ার জন্য উচ্চপদস্থ দেহরক্ষী অফিসারকে নির্দেশ দিলেন। আদেশ পালন করে সকলে কক্ষ হতে বের হয়ে গেল। শুধুমাত্র অপেক্ষারত তৃতীয় মহিলাটি কমরেড ক্রুশ্চফের কাছে এগিয়ে গেল। একটি ফটো বের করে ক্রুশ্চফের হাতে দিলেন এবং বললেন যে এখুনি তাকে দেশে ফিরতে হবে। লাঞ্চ খাবার সময় নেই। কমরেড ক্রুশ্চফ ফটোটি একদৃষ্টে দেখতে থাকেন। একসময় উৎফুল্ল কণ্ঠে মহিলার নাম (তাতিয়ানা ফ্লাবিচকা) ধরে ডেকে ওঠেন। দীর্ঘ তিরিশ বছর পর আবার দুজনের দেখা হয়েছে। কমরেড ক্রুশ্চফ তাতিয়ানাকে তার জীবনের প্রথম আনন্দ-উৎস বলে অভিহিত করেন। তাতিয়ানা আবেগাপ্লুত কণ্ঠে কমরেড ক্রুশ্চফকে জাতির সূর্য বলে প্রশংসা করেন।

উভয়ে কথা বলছে আর এক আশ্চর্য দৃষ্টিতে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। কমরেড ক্রুশ্চফ হঠাৎ অতীত দিনের কথা স্মরণ করে আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠেন। তাতিয়ানা আর সময় নষ্ট করতে চাইছে না। এত বড় একজন নেতা তার জন্য সময় অনেক মূল্যবান। তাতিয়ানা প্রগাঢ় অনুরাগের সুরে কমরেড ক্রুশ্চফের দীর্ঘায়ু ও উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভূত উন্নতির জন্য কমরেড ক্রুশ্চফকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাতিয়ানা বললেন:

"তোমার আজকের দিনগুলোর দাম আরও কত বেশি! প্রতিটি মিনিটের কত দাম! এমনভাবে তা নষ্ট হয়, এ আমি চাই না নিকিতা। আমি চলি। তুমি আরও বড় হও। আরও ক্ষমতা হোক তোমার।"

অক্লান্ত পরিশ্রমে মরুভূমিকে শস্য-শ্যামল করে তোলার জন্য, সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মহাকাশ জয়ে সাফল্য অর্জনের জন্য তাতিয়ানা কমরেড ক্রুশ্চফকে অভিনন্দন জানান। বিদায় মুহূর্তে তাতিয়ানা রহস্য ভরা দুষ্টুমির ছলে বলল:

"কিন্তু তবু বলবো একটি ক্ষমতা এখনও পাওনি।

ক্রুশ্চফ--(অধীর আগ্রহে) কী কী?

তাতিয়ানা--(সহাস্যে) তোমার টাকটা? ওকে রুখতে পারোনি তুমি।

ক্রুশ্চফ--(ক্রুশ্চফ উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফাটিয়া পড়িলেন) সত্যি, খুব সত্যি।

তাতিয়ানা--(হাসি মুখে) বিদায়!

ক্রুশ্চফ--(হাসিতে হাসিতে এক হাতে টাক বুলাইতে বুলাইতে আর এক হাত তুলিয়া) দাঁড়াও।

আরো একটা জিনিস আমি পারিনি। কাউকে যদি না বলো তো বলি–

তাতিয়ানা--কি?

ক্রুশ্চফ--তোমাকে ভুলতে পারিনি !...ভুলিনি।[১০৫]

উভয়ে হাসিতে ফেটে পড়লেন। এই সময় দায়িত্বরত অফিসারটি এসে খবর দিল যে মস্কো থেকে জরুরী কল এসেছে। ক্রুশ্চফ বিদায় জানিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে শিস্ দিতে দিতে অন্য কক্ষে চলে গেলেন। কিন্তু তাতিয়ানা হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল।...উদগত ভাবাবেগ দমন করে দ্রুত বাইরে চলে গেলেন।

এ নাটকে নাট্যকার যে বক্তব্য তুলে ধরেছেন তা হলো কর্তব্যের কাছে আবেগ অনুভূতি বড় নয়। অতি কাছের মানুষও কর্তব্য পালনের সময় গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। চরিত্র সংখ্যা-১০; নারী-৩, পুরুষ-৭।

'উত্তরা' পত্রিকায় **'অলৌকিক'(১৯৬৫)** নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ভণ্ড দেশনেতার স্ত্রীর চোখে তার স্বামীর আসল স্বরূপ–কুকীর্তির কাহিনী ধরা পড়ে। তাই দেশনেতা নির্বাচনের আগে তার স্ত্রীকে পাগল বানিয়ে পাগলাগারদে পাঠিয়ে দিতে চান। নাট্যকার এই একাঙ্কে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে এঁকেছেন সেই নেতার ছবি যিনি রাতের অন্ধকারে মেয়েদের নষ্ট করেন, চোরাকারবারকে মদত দেন আর মনে করেন পদ পেতে গেলে সত্যিকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করতে হবে, আর মিথ্যেকে সত্যি। এটাই নাকি রাজনৈতিক নেতা হবার মন্ত্রগুপ্তি।

স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বাস–অবিশ্বাসের দিকটি নাটকের পটভূমি হিসাবে এসেছে। নাটকে চক্রবর্তী (অমলার স্বামী), ডাক্তার (চক্রবর্তীর শ্যালক,অমলার ভাই) জিজ্ঞাসা করছেন অমলা(চক্রবর্তীর স্ত্রী)-কে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছে কিনা। নাটকটি শুরু থেকে ক্ল্যাইম্যাক্সে অবস্থান করছে। নাটকে অমলা অলৌকিক শক্তি বলে স্বামীর সমস্ত আচরণ, ভাল–মন্দ সব কিছুই বলে দেন। অমলার স্বামী একজন দেশবরেণ্য নেতা। অমলা স্বামীর সমস্ত অপকর্ম বলে দেয়। অমলার স্বামী চক্রবর্তী ডাক্তারকে বললেন:

> ''শোন ভাই ডাক্তার, অমলার সহোদর তুমি। তাই বলতে পারি এক তোমাকেই। বিপদ হয়েছে কি জানো ? অমলা যা কিছু বলছে–বলছে শুধু আমারই সম্পর্কে। আমি কাল কোথায় কি করেছি, আজ এখন কি ভাবছি, ও বেলা কি করবো–এটা ও নখদর্পণে দেখছে। তুমি হেসো না ডাক্তার। হাসবার কথা এটা মোটেই নয়। সত্যি সত্যি অমলা তার নখ আনে চোখের সামনে। নখ দেখে আর বলতে থাকে। ওর নখের পর্দায় যেন আমার জীবনের ছবি সিনেমার মত ভেসে ওঠে। ও দেখে আর বলে। আর দেখেন উনি আমারই সব ঘটনা। সেসব ঘটনা যাদের সঙ্গে ঘটে তাদেরও দেখেন বৈকি। একেবারে যেন হুবহু দেখেন । এ আচরণ আমি একেবারেই সইতে পারছি না ডাক্তার।"[১০৬]

অমলার স্বামী ডাক্তারকে এর একটা সমাধানের জন্য অনুরোধ করছে। কিছুদিন সবার থেকে অমলাকে আলাদা রাখার জন্য ডাক্তার ভগ্নীপতিকে পরামর্শ দেয়। কিন্তু অমলার কারণে তাও সম্ভব হয় না। চিৎকার চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় তোলে। কিছুদিন তীর্থে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য

ডাক্তার ভগ্নীপতিকে পরামর্শ দেয়। কিন্তু অমলা তীর্থে যেতে রাজি হয় না। অমলার মতে তীর্থ করে যে পূণ্য হয়েছে তারই ফলে এই দিব্য ক্ষমতা পেয়েছে। রক্ষাকবচের মত এখন স্বামীকে রক্ষা করতে চায়। কিন্তু অমলার স্বামী চক্রবর্তী স্ত্রীর এই দিব্যজ্ঞানকে ভয় পায়; সব কথা ফাঁস হয়ে গেলে মহা কেলেঙ্কারী বেঁধে যাবে। তাই স্ত্রীর এই সত্য বলা ও দিব্যজ্ঞানের বিপদ থেকে রক্ষা পেতে স্ত্রীকে পাগল হিসাবে ডাক্তারি আদেশ পেলে তবে ধরে বেঁধে অমলাকে রাঁচি পাঠিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু ডাক্তার সম্মত হয় না। ডাক্তারের মতে:

"উঃ ! যে পাগল নয়, তাকে পাগল বলে চালানো। তুমি কি পাষণ্ড!"

ডাক্তার ও চক্রবর্তীর কথোপকথনের সময় অমলা প্রবেশ করল। আপন মনে সে বলে যাচ্ছে যে কথাগুলো তা হল–গতরাতে সেই মেয়েটি আবার এসেছে। মেয়েটি মাঝে মাঝে এসে অমলার স্বামীকে প্রলোভন দেখায়। অমলার স্বামীও মেয়েটির সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য ছটফট করতে থাকে। অমলা তার স্বামীকে সাবধান করে দেয়, মেয়েটি তার রূপ-যৌবনের ফাঁদে ফেলে সর্বোচ্চ ক্ষতি করতে চায়। অমলা দিব্য দৃষ্টিতে আরও দেখতে পায় তার স্বামী কালোবাজারি করে শত শত চালের বস্তা গুদাম ঘরে আটকে রাখে। অথচ বাজারে চালের দাম আকাশ ছোঁয়া। লোকজন খেতে না পেয়ে মারা যাচ্ছে। এই মানুষগুলোকে বাঁচাতে ওই মেয়েটি অমলার স্বামীকে অনুরোধ করে। মেয়েটির মোহপাশে ধরা না দিতে অমলা তার স্বামীকে বার বার নিষেধ করছে। অমলা আর্তনাদ করে ওঠে, আপন মনে বলতে থাকে,

সত্যি এ অসহ্য। মানুষের জীবন নিয়ে এসব কি ছিনিমিনি খেলা। এ আমি দেখতে পারি না। এত পাপ আমি সইতে পারি না। আমি এখান থেকে চলে যাবো। এ পাপপুরীতে আমি থাকবো না। আমি পথে গিয়ে দাঁড়াবো। জনে জনে ডেকে বলবো, যদি বাঁচতে চাও এই পাপপুরী পুড়িয়ে দাও। একি! কে এসে আমার মুখ চেপে ধরছে। জোর করে আমাকে গাড়িতে তুলছে! এ আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? কি সুন্দর পথ! কি সুন্দর পাহাড়! কি সুন্দর শোভা! চিনেছি–হ্যাঁ, এখানে আমি আগে বেড়াতে এসেছি। সেই রাঁচি-রাঁচি।[১০৭]

নাটকের সমাপ্তিতে দেখা যায়,অমলা নিজেই স্বামীর কাছে অনুরোধ করে তাকে রাঁচি পাঠিয়ে দেয়ার জন্য।

রূপকধর্মী নাটক। নাট্যকার পচনধরা সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন। চক্রবর্তীর চারিত্রিকভাবে অধ:পতিত হওয়া, সত্য প্রকাশের ভয়ে স্ত্রীকে দূরে পাঠিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র যেমন অমানবিক তেমনি অস্বাভাবিকও বটে। যদিও এ নাটকে অমলা রাঁচী যেতে সম্মত হয়েছে যা লৌকিকতার বাইরে। বাস্তবে কোন স্ত্রী এভাবে যেতে সম্মত হবে না।

'গণনাট্য' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় **'কষ্টিপাথর'(১৯৬৫)** নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার দেখিয়েছেন 'দুর্নীতিটাই পুণ্য, নীতিটাই পাপ'–ব্যবসার আজকের দিনে এটাই উদ্দেশ্য। তৎকালীন শাসক শ্রেণির অকর্মণ্য নীতিহীনতা, মূল্যবোধের অবনমন এবং সামাজিক অবক্ষয় ও বিপর্যয় সম্পর্কে উদাসীনতাকে এই নাটকে তীব্র আক্রমণ করা হয়েছে। একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী নিয়োগ সমিতির বৈঠক। এই বৈঠকে উপস্থিত আছেন পরীক্ষক

সভাপতি ও সদস্যসহ তিনজন এবং প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক। রুদ্ধ কক্ষ। মোট তিনজন প্রার্থী উপস্থিত আছেন। প্রথম প্রার্থীর নাম ধনঞ্জয় রায়। তিনি ১৯৬০ সালে কমার্সে এম.এ–তে ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করেন। প্রার্থী সহজ সরল ভাল মানুষ। তাকে যে প্রশ্ন করা হচ্ছে তাতে প্রার্থী নীতি আদর্শ ঠিক রেখে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। পরীক্ষকবৃন্দ নানারকম প্রশ্নের মাধ্যমে প্রার্থীকে যাচাই করে নিচ্ছেন। যদি দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, আর চালের দাম হু হু করে বেড়ে যায়, এ অবস্থায় চালের সাথে কাঁকর ভেজাল দিয়ে আশাতীত মুনাফা অর্জন সম্ভব। প্রার্থী এই ভেজাল দিয়ে মুনাফা অর্জনে সম্মত কিনা নিয়োগ কমিটির সভাপতি প্রার্থীর কাছে জানতে চাইলেন। কিন্তু বড় ধরনের কোন সংকটের মুহূর্তেও প্রার্থী দুর্নীতির আশ্রয় নিতে সম্মত নন। প্রার্থীর মতে ভেজাল দেয়া অনৈতিক ও বেআইনী।

দ্বিতীয় প্রার্থী তরুণ মিত্র, তিন বছর আগে এল.এল.বি. করেছেন। কিন্তু ওকালতি পেশা মানেই মিথ্যার বেসাতি। বিবেকটি বিক্রি করতে পারলে তবেই টাকা পাওয়া যায়। তাই ওকালতিকে পেশা হিসেবে নিতে পারলেন না। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি প্রার্থী তরুণ মিত্রকে প্রশ্ন করলেন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে গভর্নমেন্ট থেকে লাইসেন্স বের করতে হবে। লাইসেন্সটা বের করা জরুরি। দেরি হলে প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ক্ষতি হবে। আর লাইসেন্সটা পেতে হলে ঘুষ দিতে হবে, এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। কিন্তু সভাপতির এই ধরনের প্রশ্নের উত্তরে দ্বিতীয় প্রার্থী তরুণ মিত্র সম্মত হন না। তার মতে ঘুষ দেয়া–নেয়া দুটোই কঠিন অপরাধ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় প্রার্থী যুধিষ্ঠির বসু। গ্রাজুয়েট, তার ওপর বিজনেস এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনে ডিপ্লোমা করেছেন। তৃতীয় প্রার্থীকে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নানরকম প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা তাতে সন্তুষ্ট নন। তিনজন প্রার্থী বিদায় নিলেন। নিয়োগ সমিতির বৈঠকে উপস্থিত সকল কর্তাব্যক্তিরা প্রার্থী নির্বাচনে হতাশা প্রকাশ করলেন।

এমন সময় শেষ প্রার্থী আসল। যুবকটির মাথায় টিকি। কপালে চন্দন ফোঁটা। নাম ঈশ্বরদাস। বি কম পাশ করে চার বছরে চারটি ফার্মে কাজ করেছে। এক ফার্ম থেকে আর এক ফার্মে ধরে নিয়ে গেছে প্রত্যেকবার বেশি বেতন দিয়ে। আড়াইশো থেকে শুরু করে, বোম্বের যে ফার্মে আছেন, সেখানে পাচ্ছেন হাজার টাকা। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি প্রার্থী ঈশ্বরদাসকে প্রশ্ন করলেন,

আচ্ছা ধরুন, আপনার চাকরি এখানে হয়েছে। কমার্শিয়াল ফার্মে নানারকম করাপসান এর সম্ভাবনা থাকে যাকে বলা হয় দুর্নীতি।

ঈশ্বর দাস–তা যদি বলেন, দুর্নীতিই আজ নীতি হয়ে দাড়িয়েছে স্যার।

সভাপতি–মানে?

ঈশ্বরদাস–মানে দুর্নীতিই আজকের দিনে ভারচু-নীতিটাই 'ভাইস'।

সভাপতি–আশা করি এটা আপনি সমর্থন করেন না?

ঈশ্বরদাস–না করে উপায় নাই স্যার। শাস্ত্রেই বলেছে 'যস্মিন দেশে যদাচারঃ'।

সভাপতি–'অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি' আপনি মানেন না?

ঈশ্বর দাস–ওটা ছিল সে যুগে। এ যুগে 'ডিজ অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি'। এ নিয়ে আমি একটা থিসিস লিখেছি। আমি এটা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে দিয়েছি ফ্যাক্ট দিয়ে ফিগার দিয়ে।

সভাপতি– ভেরি ইন্টারেস্টিং।

প্রথম সদস্য– ইন্টারেস্টিং সন্দেহ নেই। কিন্তু ডিজ অনেস্টি আপনার বিবেকে বাধবে না?

ঈশ্বর দাস– না স্যার। আমি ঈশ্বর বিশ্বাসী। আমি ঘুম থেকে উঠতে আর শুতে যেতে হাত জোড় করে বলি "ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি"।

তৃতীয় সদস্য– ঐ কথা বলেই আপনি পাপ থেকে মুক্তি পাবেন?

ঈশ্বরদাস– হ্যাঁ স্যার পাব। কারণ আমি সদা সর্বদা মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করি।

সভাপতি–আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন।

ঈশ্বরদাস– যাচ্ছি স্যার। বুঝলাম তাড়িয়েই দিচ্ছেন। তা দিন, ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

(ঈশ্বরদাসের প্রস্থান।)

সভাপতি– (অন্য দুই সদস্যকে) বলুন।

সদস্যদ্বয়– (একযোগে) শেয়াল।

সভাপতি–শেষটায় তবে একটি পাওয়া গেল।

প্রথম সদস্য– শুধু শেয়াল নয়, শেয়াল পণ্ডিত।

সভাপতি–তাহলে একেই–

উভয় সদস্য–তা আর বলতে !

সভাপতি– সেক্রেটারি ![১০৮]

অফিসের সেক্রেটারিকে উক্ত পদটির জন্য ঈশ্বর দাসকে মনোনীত করে ঈশ্বর দাসের নামে অর্ডার লিখতে আদেশ দিলেন। একই সাথে প্রাথমিক নিয়োগেই তাকে উচ্চতর বারশো টাকার গ্রেড দেওয়া যেতে পারে বলে নিয়োগ কমিটির সকল সদস্য একমত হন।

'কষ্টিপাথর'–একাঙ্ক নাটক থেকে যে বক্তব্য পাওয়া যায় তা হল নীতি আদর্শের কথা মুখে বলা হলেও তা মেনে চলা কঠিন। সত্য–ন্যায়-নিষ্ঠার কথা বলা হলেও বাস্তবে এর প্রয়োগ দুঃসাধ্য বটে। ব্যাঙ্গার্থে রচিত এ নাটকে দেখা যায় অতীতে যখন সৎ, যোগ্য, নিষ্ঠাবানের মনোনয়ন দেয়া হত তার স্থানে বর্তমানে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে সবদিকে ধূর্ততারই জয়জয়কার। আদর্শহীন, মতাদর্শহীন, চতুর এবং শঠ প্রকৃতির লোকেরাই সমাজের নেতৃস্থানীয়দের মনোরঞ্জন করে থাকে। নাটকে দেখা যায় প্রথম তিনজন প্রার্থী বাদ গেলেও চতুর্থ প্রার্থী তার সুচতুর উত্তরের জন্য মনোনীত হয়। নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন ন্যায়, সততা বর্তমান সমাজে অন্তঃসার বুলি মাত্রে পরিণত হয়েছে। সবখানেই মিথ্যাচার–অসততা–বুলি সর্বস্বতাই দেখা যায়। নাট্যকার ভাষা ব্যবহারে যেমন পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন তেমনি প্রার্থীদের মুখ থেকে যেসব উত্তর পর্ব পরিবেশন করিয়েছেন তা পাঠককে যেমন আনন্দ দিয়েছে তেমনি চরিত্রগুলো জীবন্ত ও সময়োপযোগী হয়ে উঠেছে। একাঙ্ক নাটক হিসাবে স্বল্প পরিসরে ও সুনির্দিষ্ট বক্তব্য উপস্থাপনে নাট্যকার সার্থক ও সফল হয়েছেন।

নাট্যকার মন্মথ রায় তার রচিত নাটকের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন যে তিনি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আর সন্তুষ্ট নন। ফলে তাঁর এই অসন্তোষকে ঘিরে রঙ্গ-ব্যঙ্গ কৌতুকে ঘেরা সামাজিক অসঙ্গতির চিত্র সমন্বিত বহু একাঙ্ক নাটক রচিত হয়েছে। এমনকি পাঁচ, দশ, কুড়ি ও পয়ত্রিশ মিনিটে অভিনয়যোগ্য নাটকও তিনি রচনা করেছেন। এই অতি ছোট নাটকগুলি সম্পর্কে তিনি তার 'বিচিত্র একাঙ্ক'-এর ভূমিকায় যা লিখেছেন তা অনুধাবনযোগ্য। "আজ এই স্পুটনিক যুগের গোড়াতে আধঘণ্টার একাঙ্ক নাটকও চলছে। এমন দিনও আসছে যখন দশ মিনিটের নাটকেরও চাহিদা হবে। সেদিন আসছে মনে করে পাঁচ, সাত, দশ মিনিটের কিছু একাঙ্ক নাটকও রেখে গেলাম আমি।"

'একাঙ্কিকা, 'নব একাঙ্ক, 'বিচিত্র একাঙ্ক, 'ফকিরের পাথর' ও 'নাট্যগুচ্ছ, 'ছোটদের নাট্যমঞ্চ, 'ছোটদের একাঙ্কিকা' প্রভৃতি শিরোনাম গ্রন্থে তাঁর নানান স্বাদের একাঙ্কগুলি বিধৃত হয়েছে। শেষের দুটিতে শিশুদের জন্যে লেখা একাঙ্কই প্রচুর। 'কাজলরেখা' নাটকটি পড়লে বোঝা যায় তিনি শিশুদের জন্য নাটক রচনাতেও স্বচ্ছন্দ ছিলেন। এগুলোর প্রায় প্রত্যেকটিতেই রয়েছে কিছু উপদেশ। নাট্যদ্বন্দ্বেরও অভাব ঘটেনি। সেদিক থেকে তাঁর সকল একাঙ্ক রচনার মধ্যেই বার্নার্ড শ'-এর কথা যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে– "I do not write a single line except for teaching something." যেকোন সমস্যা তাকে জর্জরিত করলে নানা প্রশ্ন ও তর্কের সমাবেশ ঘটিয়ে তিনি সর্বদা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছেন। ফলে কখনও তা প্রচারধর্মী হয়ে উঠলেও খুব সহজেই নাট্যকারের জীবনাদর্শ বোঝা গেছে।

পূর্ণাঙ্গ নাটকের মত তাঁর একাঙ্কগুলিতেও দুটি স্পষ্ট পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্যায়ের একাঙ্কগুলিতে দেখি রোমান্টিক ভাবনার প্রাধান্য, নরনারীর প্রেমভাবনার এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক রূপ। দ্বিতীয় পর্যায়ে নাট্যকার অনেক বেশি বস্তুনিষ্ঠ। এই স্তরে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় মানুষের মানসিক জটিলতা, কপটতা, শঠতা, বঞ্চনা, নৈতিক স্খলন চিরন্তন মূল্যবোধকে কিভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে তার প্রাঞ্জল রূপায়ণ–হাসি-কান্না, বেদনায়, সরল, সরস, ব্যঙ্গের অভিঘাতে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

একাঙ্ক নাটক রচনার প্রথম পর্যায়ে তিনি রাজতন্ত্রের পটভূমিকায় রচনা করেন–'মুক্তির ডাক, 'রাজপুরী, 'লক্ষহীরা, 'অরূপরতন, 'বিদ্যুৎপর্ণা, 'মাতৃমূর্তি'। এই পর্বে বৌদ্ধ যুগের কল্পিত ঐতিহাসিক রোমান্স-রসে তিনি গভীরভাবে আপ্লুত ছিলেন। এ সব নাটকে প্রেমের জন্য হত্যা, আত্মহত্যা, বিষ প্রয়োগে প্রতিদ্বন্দ্বীর জীবনাবসান ঘটানো, সুন্দরী বারাঙ্গনার হৃদয় জয়ের জন্য সর্বস্ব পণ, প্রেমিকের চোখের মণির সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে জীবনভর তার ধ্যান এবং তার জন্য যে-কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকা প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকল্প বড় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এগুলির বিষয় নারী ও পুরুষের নৈতিক স্খলন, রাজপুরুষের ব্যভিচার, স্বেচ্ছাচার, আধিপত্য বিস্তারের উদগ্র কামনা রূপায়ণের পাশাপাশি নিষিদ্ধ কামনার জ্বালাময়ী সর্বনাশা রূপের চিত্রায়ণ বলা যায়।

তথ্যসূত্র

১.শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী,"নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা" ,কলকাতা,১৩৮১,পৃ.২৩

২.ড.শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্য", শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী,প্রাগুক্ত,

পৃ.২৫ থেকে উদ্ধৃত

৩.প্রাগুক্ত,পৃ.২৫

৪.ড.সাধনকুমার ভট্টাচার্য,"নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা", কলকাতা,১৯৬৩, পৃ.২৩১

৫.শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, পূর্বোক্ত,পৃ.২৮

৬.ড.সাধনকুমার ভট্টাচার্য,পূর্বোক্ত, পৃ.২৪০-২৪১

৭.মন্মথ রায় নাট্য গ্রন্থাবলী, পূর্ণাঙ্গ (প্রথম খণ্ড)"চাঁদ সদাগর"-নাটকের প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্য,

পৃ.৮২। এর পর থেকে 'নাট্যগ্রন্থাবলী' নামে উল্লিখিত হবে।

৮.প্রাগুক্ত,পৃ.৮৩

৯. প্রাগুক্ত, পৃ.১১১

১০. প্রাগুক্ত পৃ.২৮৬

১১.প্রাগুক্ত পৃ.২৬৬

১২. প্রাগুক্ত পৃ.২৬০

১৩. নাট্য গ্রন্থাবলী, পূর্ণাঙ্গ (দ্বিতীয় পর্ব) ,পৃ.২০৮

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ.২০৮

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ.২১৩

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ.২৫০

১৭. জয়তী ঘোষ,"মন্মথ রায় জীবন ও সৃজন", কলকাতা-২০০০,পৃ.৫১

১৮.অজিতকুমার ঘোষ,"বাংলা নাটকের ইতিহাস" জয়তী ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬-৫৭ থেকে উদ্ধৃত

১৯.নাট্য গ্রন্থাবলী, পূর্ণাঙ্গ (প্রথম খণ্ড), পৃ.৩

২০. প্রাগুক্ত, পৃ.১১

২১.প্রাগুক্ত, পৃ.৩২-৩৩

২২. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ.২৪

২৪.নাট্য গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড,পূর্ণাঙ্গ (প্রথম পর্ব),পৃ.১৬২

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ.১৭০

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ.১৮২-১৮৩

২৭. প্রাগুক্ত,পঞ্চম খণ্ড,পূর্ণাঙ্গ (তৃতীয় পর্ব),পৃ.২৩৬

২৮. প্রাগুক্ত,পৃ.২৩১

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৫-২৫৬

৩০. প্রাগুক্ত,পৃ.২৫৬

৩১. প্রাগুক্ত,পৃ.২৫৪

৩২.বাংলা বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড,পৃ.–২৪১

৩৩.জয়তী ঘোষ,পূর্বোক্ত,পৃ.৬৫

৩৪. নাট্য গ্রন্থাবলী, পূর্ণাঙ্গ (চতুর্থ পর্ব), পৃ.২২১

৩৫. প্রাগুক্ত,পৃ.২২৪

৩৬. প্রাগুক্ত,পৃ.২৭৮

৩৭. প্রাগুক্ত,পৃ.২৭৮-২৭৯

৩৮. প্রাগুক্ত,পৃ.২৭৯

৩৯. নাট্য গ্রন্থাবলী, পঞ্চম খণ্ড,পূর্ণাঙ্গ (তৃতীয় পর্ব),পৃ.৩০৬

৪০. প্রাগুক্ত,পৃ.৩১০

৪১. নাট্য গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড,পূর্ণাঙ্গ (প্রথম পর্ব),পৃ.৯-১০

৪২. নাট্য গ্রন্থাবলী, পূর্ণাঙ্গ (দ্বিতীয় পর্ব), পৃ.২৬৪

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৮

৪৪. প্রাগুক্ত,পৃ.২৬৮

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩১-৩৩২

৪৬.জয়তী ঘোষ,পূর্বোক্ত,পৃ.৭৪

৪৭. বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড,পৃ.–৪৭

৪৮.নাট্য গ্রন্থাবলী, পঞ্চম খণ্ড,পূর্ণাঙ্গ (তৃতীয় পর্ব), পৃ.৬৩

৪৯. প্রাগুক্ত,পৃ.৬১

৫০.সাধনকুমার ভট্টাচার্য,পূর্বোক্ত, পৃ.৪৭৩

৫১.ড.সাধনকুমার ভট্টাচার্য,"নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা", কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ.৪৭৩

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭৩-৪৭৪

৫৩.দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়,"নাট্যতত্ত্ব বিচার" কলকাতা-১৩৯১,পৃ.২৫০

৫৪.W.H.Hudson p.340, প্রাগুক্ত,পৃ.২৫১

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৩

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৪

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৪

৫৮. প্রাগুক্ত,পৃ.২৫৬

৫৯.B.R.Lewis.কৃষ্ণলাল ভট্টাচার্য,"বাংলা একাঙ্ক নাটকের উদ্ভব,প্রকৃতি ও বিকাশ",কলকাতা-১৩৯৫, পৃ.৩

৬০.John Hampden. প্রাগুক্ত, পৃ.৩

৬১. ভারতকোষ, প্রাগুক্ত,পৃ.৫

৬২. সনাতন গোস্বামী (সম্পা:) "নাট্যকার মন্মথ রায় : স্মরণ ও মনন" কলকাতা-২০০৮,পৃ.৭৪

৬৩. জয়তী ঘোষ,পূর্বোক্ত,পৃ.১৩৭

৬৪. নাট্য গ্রন্থাবলী,একাঙ্ক (দ্বিতীয় পর্ব) ,পৃ.১৩৫

৬৫. প্রাগুক্ত,পৃ.১৩৬

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৬

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৯

৬৮. জয়তী ঘোষ, পূর্বোক্ত,পৃ.১৪২

৬৯. প্রাগুক্ত,পৃ.১০৮

৭০. প্রাগুক্ত,পৃ.১০৯

৭১. নাট্য গ্রন্থাবলী,একাঙ্ক (দ্বিতীয় পর্ব), পৃ.১৬৫

৭২. প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৫-১৬৬

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৯-১৭০

৭৪. জয়তী ঘোষ, পূর্বোক্ত,পৃ.১৬৭

৭৫. নাট্য গ্রন্থাবলী,একাঙ্ক (দ্বিতীয় পর্ব) পৃ.৭০

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৭১

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ.৭২

৭৮. প্রাগুক্ত,পৃ.৮৯

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৭

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ.৩০২

৮১. প্রাগুক্ত,পৃ.৩৭২

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ.৯৫

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ.১০২

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ.১০৩

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ.১১১

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ.১১৩

৮৭.সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান (প্রথম খণ্ড) সাহিত্য সংসদ,সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পা: কলকাতা-১৯৭৬,পৃ.৪১০

৮৮. নাট্য গ্রন্থাবলী,একাঙ্ক (দ্বিতীয় পর্ব), পৃ.৩৩

৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪

৯০. প্রাগুক্ত, পৃ.৪০

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬-৩৭

৯২. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮

৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪০-৩৪১

৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৩

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৯

৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ.২৯০-২৯১

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ.২৩-২৪

৯৮ . প্রাগুক্ত, পৃ.২৫

৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ.২৪

১০০ . প্রাগুক্ত, পৃ.৩১-৩২

১০১ . প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৯

১০২. প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৯

১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ.২০

১০৪. প্রাগুক্ত, পৃ.২২

১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫১-৩৫২

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩

১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ.৫০-৫২

চতুর্থ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

মন্মথ রায়ের নাট্যকর্মে যুগের প্রভাব

মন্মথ রায় ময়মনসিংহের গালা শহরে ১৯০৫ সালে ছ'বছর বয়সে 'বিসর্জন' নাটকে 'ধ্রুব' চরিত্রের অভিনয়ের মাধ্যমে অভিনেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৩৪ সালে বালুরঘাট হাইস্কুলে 'বানগড়ে এক রাত্রি'-নাটকের অভিনয় করেন। ১৯৬০ সালে তিনি আকাশবাণী থেকে প্রচারিত 'কৃত্তিবাস' নাটকে সূত্রধারের পাঠ করেন। ১৯৫৭ সালে মহাজাতি সদনে তাঁর লেখা 'মরা হাতি লাখ টাকা' নাটকের অভিনয় হয়। নাট্যকার মন্মথ রায় এতে বিক্রমাদিত্য সিংহের ভূমিকায় রূপদান করেন। মন্মথ রায় কৈশোরে অষ্টম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় স্কুলের হেডমাষ্টার পণ্ডিত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর তত্ত্বাবধানে স্কুলে 'ডাকঘর' নাটকে অমলের ভূমিকায় অভিনয় করেন। অমল চরিত্রের সাথে কতটা একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন তা তিনি নিজেই বলেছেন,"ঐ ভূমিকায় (অমল) অভিনয় করার কালে আমি যেন সত্যি সত্যি অমল হয়ে গিয়েছিলাম।" এই ভূমিকায় অভিনয় করে তাঁর বেশ নাম হয়েছিল। অভিনয়ের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাংকেতিক নাটকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল, এর সম্ভাব্য প্রভাব পরবর্তীকালে তাঁর সৃষ্টিকর্মেও প্রতিফলিত হয়েছিল। 'ডাকঘর' নাটকটি ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিশ্বের মৌলিক রহস্যদ্যোতক ভাব নিয়ে লেখা কোনো কোনো সাংকেতিক একাঙ্ক নাটকে হয়তো কৈশোরে অভিনীত 'ডাকঘর' নাটকের অস্পষ্ট প্রেরণা থাকতেও পারে। 'অরূপরতন', 'পঞ্চভূত', 'হারিকেন' (ডাকঘর এর সঙ্গে সাদৃশ্য খুব বেশি), 'জন্মদিন', 'আম্রমঞ্জুরী' প্রভৃতি সাংকেতিক রহস্যমণ্ডিত নাটকগুলোর প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

কৈশোরকালে বালুরঘাটে থিয়েটারের প্রতি মন্মথ রায়ের তীব্র আকর্ষণ ছিল। বালুরঘাটে একটি স্থায়ী নাট্যশালা গড়ে তুলতে স্থানীয় সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিদের পাশাপাশি মন্মথ রায়ের পিতৃদেব দেবেন্দ্রগতি রায়ের পৃ'পোষকতা উল্লেখযোগ্য। সরকারি হাসপাতালের উত্তর দিকে এক খণ্ড জমি সংগৃহীত হল, কাছের একটি ইটখোলা থেকে ছেলের দল ইট বয়ে আনল। মন্মথ রায় লিখেছেন, "এবং আজ আমার এই বয়সেও পরম গর্ব যে, ওখানে পরে যে স্থায়ী নাট্যশালাটি গড়ে উঠল তার ভিত-এ আমার বয়ে আনা ইট আর তার মেহনৎ আছে। এবং এটিও আমার পরম আনন্দ যে, জনসাধারণের সম্পত্তি ঐ স্থায়ী নাট্যশালাটি প্রথমে এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ক্লাব এবং দেশ স্বাধীন হবার পর নাট্যমন্দির নামে আজও সগৌরবে বর্তমান।" একসময়ে তাঁর বাবা দেবেন্দ্রগতি এই নাট্যশালার সম্পাদক ছিলেন। মন্মথ রায়ও পরবর্তীকালে কিছুদিন এর সম্পাদক হিসাবে দায়িত্বরত ছিলেন। বালুরঘাট থেকে বাইরে গিয়ে কলেজে পড়ার সময়েও বালুরঘাটের নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে তাঁর পুরোপুরি যোগ ছিল। কলেজের ছুটিতে বালুরঘাটে এসে ভেকেশান ক্লাব স্থাপন করে বন্ধুদের সহযোগিতায় অতুলানন্দ রায়ের 'পানিপথ' এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নুরজাহান'-ই.এস.ডি ক্লাবমঞ্চে অভিনয় করে নামও হল এবং অভিজ্ঞতাও বাড়ল। শুধুমাত্র অভিনয় নয়, এই বালুরঘাটেই নাটক লেখার চেষ্টাও শুরু হয়েছে। বক্তিয়ার খিলজি কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের কাহিনী অবলম্বনে নাটক লিখলেন 'বঙ্গে মুসলমান'। ১৯২০ খ্রীঃ নাটকটি ভেকেশান ক্লাবের প্রযোজনায়ও মন্মথ রায়ের পরিচালনায় ই.এস.ডি মঞ্চে অভিনীত হয়।

এরপর স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ, গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জনশিক্ষা প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ, সংবাদপত্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগরক্ষা, দুর্ভিক্ষগ্রস্ত বালুঘাটবাসীদের

সেবায় আত্মনিয়োগ প্রভৃতি নানা ধরনের দেশহিতকর ও সমাজসেবামূলক কাজে বালুরঘাটে ১৯২৬ থেকে ১৯৩৮ খ্রীঃ পর্যন্ত মন্মথ রায় অতিমাত্রায় ব্যস্ত ছিলেন। সমাজ ও স্বদেশ সেবার সঙ্গে তাঁর নাট্যসাধনার জনসংবর্ধিত উজ্জ্বল সূচনাপর্ব তাঁকে রাতারাতি নাট্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। মন্মথ রায় মাত্র চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সেই নাট্যকার হিসাবে সুপরিচিতি লাভ করেন। তাঁর ছাত্রাবস্থায় তাঁর নাটক (মুক্তির ডাক) কোলকাতার শ্রেষ্ঠ থিয়েটার স্টারে অভিনীত হয়।

সাধারণ নাট্যশালায় তাঁর রচিত পূর্ণাঙ্গ নাটক শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত হয়ে দর্শকদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেছিল। কিন্তু ওই পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলোর পাশাপাশি যে একাঙ্ক নাটকগুলো তিনি লিখেছিলেন সেগুলোর জন্য মঞ্চের কোন তাগিদ ছিল না, সেগুলি প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। নাট্যকারের বন্ধনহীন কল্পনা, জীবনের জটিল নানা সমস্যা, মানবচরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তা এবং নাট্যকারের শিল্পসৃষ্টি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অদম্য অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা একাঙ্ক নাটকগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে। নাটকগুলো তখনকার নামকরা পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়েছিল এবং শিল্প সার্থক, সাহিত্য রসাশ্রিত রচনা রূপে প্রশংসিতও হয়েছিল।

১৯৩৬-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত মন্মথ রায় বিভিন্ন সরকারী পদে দায়িত্ব পালন করেন। এরই মধ্যে ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয়। পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন, সরকারী বিভিন্ন পদে নিযুক্ত থাকার পরেও নাট্যকার মন্মথ রায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পর আবার যখন তিনি নাট্যজগতের সংস্পর্শে এলেন তখন দেখলেন পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের বর্ণোজ্জ্বল, স্বপ্নময় জগৎ শেষ হয়ে গেছে। সমস্যাক্ষুব্ধ বাস্তব জগতের বিরূপ ও

বিকৃত রূপ তাঁর সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই ক-বছরে বাংলার সমাজ ও পরিবেশ ভিতর ও বাইরের ঘটনার অভিঘাতে একেবারে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত। অবাঞ্ছিত এক মহাযুদ্ধের ধ্বংসাত্মক লৌহপাশে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাদেশও আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। যুদ্ধের কালো সঙ্গীগুলো অর্থাৎ কালোবাজারি, মুনাফাখোর, মজুতদার প্রভৃতি তখন অত্যন্ত সক্রিয়। মন্বন্তরের কবলে সমাজের একটা বিরাট অংশ, অশান্ত অসহিষ্ণু মানুষের ধৈর্যহীন ক্রোধ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে, ভাঙনও লুণ্ঠনে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অবশেষে ১৯৪৭-এ দ্বিখণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা এল। এদিকে হিন্দু-মুসলমানের প্রচণ্ড দাঙ্গায় প্রাপ্ত স্বাধীনতা যেন এক রক্তমাখা স্বাধীনতার ক্লিষ্ট করুণ মূর্তি। লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের ভয়ার্ত মিছিল, জনবিন্যাস অর্থনৈতিক সুস্থিতি, সর্বপ্রকার ধ্যান ধারণা, মূল্যবোধ বিলুপ্ত।

এই মুক্তমাটি শ্মশানে একদল দুর্জয় আত্মপ্রত্যয়ী নাট্যকর্মী সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গণনাট্য আন্দোলনের মাধ্যমে ধ্বংসের আগ্রাসন হতে সমাজকে সর্বাঙ্গীণ মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হল। বিজন ভট্টাচার্য, দিগীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, ঋত্বিক ঘটক, জীবনধর্মী নাট্যকার সলিল সেন প্রমুখ নাট্যকারের নাটকে গণনাট্য আন্দোলনের আদর্শ রূপায়িত হতে দেখা যায়। এই গণনাট্য আন্দোলনের পাশে তখনকার দুজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার স্বতন্ত্রভাবে একই আদর্শ ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরা হলেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মন্মথ রায়। যদিও মন্মথ রায়ের অবস্থান ছিল গণনাট্য সংঘ থেকে দূরে। তিনি সাধারণভাবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন বটে কিন্তু তিনি মার্কসবাদী ছিলেন না, শ্রেণিসংকট, সহিংস বিপ্লব তিনি দেখাননি।

অনেকটা মানবিক সহানুভূতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি কৃষক, শ্রমিক, বঞ্চিত ও উৎপীড়িত মানবশ্রেণির সমস্যা ও তার প্রতিকারের দিকগুলো নাটকের আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন। মহাভারতী, চাষীর প্রেম ও লাঙল-এ কৃষকজীবনের কথা ফুটে উঠেছে। 'ধর্মঘট'-এ শ্রমিক জীবনের সমস্যা রূপায়িত হয়েছে। 'জীবনটাই নাটক'-এ অভিনয় শিল্পীদের দারিদ্র্যপীড়িত জীবন সমস্যা ফুটে উঠেছে। 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' নাটকে সাঁওতাল বিদ্রোহের অগ্নিময় কাহিনী লিখলেন। 'বন্দিতা' নাটকে এক বঞ্চিতা নারীর দুঃখ ভোগ দেখালেন। 'পথে বিপথে' নাটকে বর্তমান সমাজের ভয়াবহ চিত্র আঁকলেন। 'বন্যা' নাটকে বন্যার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপন্ন মানুষের চিত্র আঁকলেন। এই যুগের শেষ হল ১৯৬৩-তে। এই সঙ্গে তাঁর মৌলিক ভাব ও রসাশ্রিত নাটকের যুগ শেষ হল।

দ্বিতীয় পর্বের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মন্মথ রায়ের মৌলিক কল্পনাপ্রসূত নাট্য রচনার যুগ শেষ হয়ে গেল। তখন তিনি নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়েছেন। বাইরের কর্মব্যস্ততা ও উত্তেজনা যত বেড়েছে ততই নিভৃত কল্পনাশক্তি ও মৌলিক সৃষ্টির আবেগ কমে এসেছে। তবে সমসাময়িক অনেক ঘটনা, বহু মনীষীর স্মরণোৎসব, জাতীয় জীবনের কোনো স্মরণীয় অনুষ্ঠান তাঁকে নাট্যরচনায় প্রেরণা যুগিয়েছে। সেই নাটক হয়ে উঠেছে কোনো জীবনী নাটক অথবা কোনো ঘটনাশ্রিত তথ্যনাটক। তেমনই সমসাময়িক কিছু স্মরণীয় ঘটনা যথা দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের শতবর্ষপূর্তি, নাট্যশালার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তিনি ওইসব ঘটনা নিয়ে নাটক লিখেছিলেন। এছাড়া নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিলের বিরুদ্ধে সমবেত অভিযান, রবীন্দ্র সদনের নির্মাণ শেষ করার জন্যে সম্মিলিত দাবি, রবীন্দ্র সদনকে জাতীয় নাট্যশালা করার জন্য আন্দোলন, পৌর প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ,

কয়েকজন বামপন্থী শিল্পীর গ্রেফতার প্রতিক্রিয়ায় বিক্ষোভ, রাশিয়া ও ভিয়েতনামের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন এসব গণ-আন্দোলনের অমিতবিক্রমশালী-নেতা মন্মথ রায়।

মন্মথ রায় একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমে চিরকাল উদ্বুদ্ধ ছিলেন, তবে তাঁর স্বদেশমুক্তি ভাবনার আদর্শের ক্রমবিবর্তন ঘটেছিল। ছাত্রজীবনে এবং পরবর্তীকালে পরিণত যৌবনে তিনি মহাত্মা গান্ধির অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করতেন। যতদিন তিনি কংগ্রেসি সরকারের অধীনে এবং আকাশবাণীতে কাজ করেছেন তত দিন তিনি সরকারে অনেক সামাজিক পুনর্গঠনের ভাবনা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সমর্থন করেছেন। তাঁর লেখা অনেক নাটক, যথা-'লাঙল', 'জীবনমরণ', 'মহাভারতী', 'জটাগঙ্গার বাঁধ', 'আমরা কোথায়', 'সাত ভাই চম্পা', 'এক আকাশ দুই আঙিনা', পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণের উদ্দেশ্যেই প্রচারিত হয়েছিল। অবশ্য নাটকগুলোর নিজস্ব নাটকীয় গুণ যথেষ্ট রয়েছে। লোকরঞ্জন শাখার সফল অভিনয়ের মাধ্যমে নাটকগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা যায় ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত তিনি কংগ্রেস ও কংগ্রেসি সরকারের সমর্থক, সংগঠক ও প্রচারক ছিলেন। অবশ্য এই সময়ের মধ্যে তিনি 'ধর্মঘট' (১৯৫৩), 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' (১৯৫৮), 'অমৃত অতীত' প্রভৃতি নাটক লিখেছেন। বোঝা যাচ্ছে তার মধ্যে বিদ্রোহ ধূমায়িত হচ্ছে, কংগ্রেসের সর্বাত্মক জাতীয়তাবাদ থেকে শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের শ্রেণিসংগ্রামের দিকে তাঁর দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে নিবদ্ধ হচ্ছে।

মন্মথ রায় শেষ জীবনে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রতি দ্বিধাহীন ভাষায় তার সমর্থন জানিয়েছিলেন বটে। কিন্তু তার বংশগত ও চিরকালীন ধর্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ অটুট ছিল। তিনি পরম কালীভক্ত ছিলেন।

তাঁর সমাজতন্ত্রবাদ উদার সর্বাত্মক মানবিকতার নামান্তর। ভাববাদী দৃষ্টি দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন সকল মানুষের মুক্তি, সকল মানুষের কল্যাণ। তিনি চিরায়ত সামাজিক মূল্যবোধ এবং ঈশ্বরের বিশ্বাসী ছিলেন। সেজন্য তিনি তাঁর আন্দোলনসঙ্গী কমিউনিস্টদের শিবিরে নিজেদের লোক বলে স্বীকৃত হননি। আবার জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস শিবিরও তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখেছে। তাই কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস কোনো দলেরই অন্দরমহলে তাঁর স্থান হয়নি। জনকল্লোল মুখরিত উচ্চ আসনে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ নেতা।

নিজের ভিতর থেকেই চারদিকের উত্তাপ ও উত্তেজনার প্রভাবে তাঁর নিজস্ব প্রতিবাদ তীব্র ও জোরালো হয়ে উঠছিল এবং বিক্ষুব্ধ, উগ্রবাদী সংগ্রামী জনগণের চাপে তিনি স্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ এবং বামপন্থী সংগ্রাম সমর্থন করলেন। শরীর যত ভেঙেছে, লড়াইয়ের মনোভাব তত বেড়েছে। মৃত্যুর মাত্র তিন বছর আগে গণনাট্য পত্রিকার একটি সাক্ষাৎকারে (১৯.৯.৮৫) তিনি বললেন, "গণতন্ত্রী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থান যে জাতিকে এই দুর্দশা থেকে উদ্ধার করে সাম্য ও মৈত্রীভিত্তিক আদর্শ জীবনে উত্তরণের এক মাত্র প্রমাণিত পথ–এই মহাসত্যকে জাতির জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।"

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন ভাবনা নিয়ে মন্মথ রায় বাংলা নাট্যাঙ্গনে পদার্পণ করেন। ১৯২৩-১৯৮৮ এই ছয় দশক ধরে বাংলা নাটক সৃজন ও নাট্য আন্দোলনকে সংগঠিত ও উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। প্রগতিশীল, স্বদেশানুরাগী, মানবপ্রেমিক এই মানুষটির কাছে আমাদের প্রাপ্তি অনেক। কারণ এ দেশের প্রগতি-ঐতিহ্যের পথরেখা ধরেই তিনি বিচিত্রমুখী সৃজনসম্ভারে বাংলা নাট্যসাহিত্যকে, নাটক-কেন্দ্রিক সৃজনশীলতাকে সমৃদ্ধ করেছেন যতদিন জীবিত ছিলেন। তাঁর নিমার্ণশীলতার গতিপথ কখনও রুদ্ধ হয়নি। প্রয়োজনে সময়ের দাবি মেনে তিনি প্রকরণ বদলেছেন, বিষয় অভিব্যক্ত করার ভঙ্গিটিও পরিবর্তিত করেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে যে কখনও তিনি তার উপলব্ধ জীবনবোধ থেকে, আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি। যা সমগ্রের হিত সাধন করে তাকে অনুসরণ করাই যে মানুষের একমাত্র ধর্ম–এই বিশ্বাসে তার সমগ্র সৃজনকর্মে প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। সমসময়ের যুগভাবনা ও জীবন জিজ্ঞাসাকে মন্থন করে তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন অগণিত জীবনানুগ নাটক–যা মানুষের কথা বলেছে, দেশকে ভালবাসতে শিখিয়েছে, ঐক্য ও সংহতিকে সুসংহত রাখতে অনুপ্রাণিত করেছেন। আদর্শহীনতা, মূল্যবোধের অভাব তাকে যন্ত্রণা দিত। ধর্মান্ধতা, অজ্ঞতা, প্রথাবদ্ধতাকে তিনি জাতীয় সংকটের কারণ বলে মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন একমাত্র নাটক ও নাট্যশালাই পারে এই ভয়ংকর সংকট থেকে গোটা দেশ ও সমাজকে রক্ষা করতে ; জাতির চেতন ও অবচেতন মনে অবনমনের বিষময় প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে চৈতন্যের জাগরণ ঘটাতে। নাটকই হচ্ছে তার উপযুক্ত মাধ্যম। সেই মাধ্যমটিকে তিনি দেশ ও মানুষ গড়ার লক্ষ্যে আজীবন কাজে লাগিয়েছেন। জীবনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় নানা প্রতিবন্ধকতা, টানাপোড়েন ও সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন, কিন্তু পরাজয়

স্বীকার করেন নি। সর্বদাই সময়ের সঙ্গে, যুগের সঙ্গে সংগতি রেখে এগিয়ে গেছেন। এ কারণেই তাঁর সৃজনে আমরা পেয়েছি পুরাতন ও আধুনিক মননের সমন্বিত রূপায়ণ। পুরাতন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নয়–অঙ্গীকার করে নিয়েই তিনি তার নাটক সৃজনকে উদার প্রগতিশীল আধুনিক জীবনদৃষ্টিসম্পন্ন করে তুলেছেন।

মন্মথ রায় বাংলা নাট্যসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য একটি নাম। আজীবন নাট্যকার হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। শৈশবে নাটক দেখা ও নাটকে অভিনয় করার মধ্য দিয়ে নাটকের প্রতি ভালোবাসা জন্ম নেয়। পরবর্তীকালে অসংখ্য নাটক রচনা করেছেন। সৌখিন নাট্যকার হিসাবে নয় একজন সচেতন মানুষ হিসাবে নাট্যকারের দৃষ্টি দিয়ে অতীতের ঘটনা ও বর্তমানের নানাবিধ সমস্যাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন । এর ফলে তাঁর রচিত নাটক শুধু ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটকের গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি।

ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটকের বিষয়ের মধ্য দিয়ে সমসাময়িক পরাধীনতার যন্ত্রণা, স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা, ভিনদেশী ইংরেজদের বিতাড়ির করার দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে। মন্মথ রায় রচিত নাটকে কখনও বা প্রকাশ পেয়েছে আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্ব (দেবাসুর) যা পুরনো হলেও সমসাময়িক কালেও প্রাসঙ্গিক। কখনও বা আধুনিক চিন্তা চেতনায় সমৃদ্ধ নাট্যকারের রচিত পৌরাণিক নাটকে (সাবিত্রী) নারীর সতীত্বের রূপ বা নারীর পতিপ্রেম অপেক্ষা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বরূপই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। ঐতিহাসিক চরিত্র 'খনা'-নাট্যকারের দৃষ্টিতে বিংশ শতাব্দীর আত্মমর্যাদা সম্পন্ন একজন নারীর স্বরূপে ফুটে উঠেছে। 'অশোক' নাটকে একজন দোদণ্ড প্রতাপশালী রাজাকে নয় বরং আত্মদ্বন্দ্বে সংক্ষুদ্ধ একজন মানুষের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই মুখ্য হয়ে উঠেছে। 'মীরকাশিম'

নাটকে একজন দেশপ্রেমিক সম্রাটের আহবান পুরো নাটক জুড়ে ধ্বনিত হয়েছে। যিনি একা, নিঃসঙ্গ, চারদিকে লোভী, বিশ্বাসঘাতকদের ছলনা, চাতুরির কবলে পড়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও দেশকে পরধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে না দেয়ার উদাত্ত আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে।

ব্যক্তি মন্মথ রায় ও নাট্যকার মন্মথ রায় ছিলেন অভিন্ন। তিনি যা উপলব্ধি করতেন, যা বিশ্বাস করতে এবং যা প্রচার করতেন সে সবই তাঁর নাটকে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি মানুষের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। সেই স্বাধীনতা হল ব্যক্তিস্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। ব্যক্তি কখনও দেবদ্রোহী, কখনও সমাজদ্রোহী, কখনও রাজদ্রোহী, আবার কখনও ধনদ্রোহী। এই বিদ্রোহী বিরোধী চরিত্রের তিনি জয়গান করেছেন। চাঁদ সদাগর, বৃত্রাসুর, কংস হল দেবদ্রোহী চরিত্র। কারাগার-এর বসুদেব, কঙ্কণ ও অশুভ রাজশক্তির বিদ্রোহী চরিত্র, ‘একটি রাজকীয় মৃত্যু’ ও ‘এই হয়েছে আইন’-এর মধ্যে রাজার অপশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখানো হয়েছে।

সমাজের বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে অনেক জায়গায় প্রতিবাদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রচলিত সতীত্বের আদর্শ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে ‘লক্ষহীরা, ‘উপচার, ‘অসীমন্তিনী, ‘স্ট্যাচু’ ইত্যাদি নাটকে। সামাজিক নীতি লঙ্ঘন করা হয়েছে ‘বহুরূপী, ‘বিদ্যুৎপর্ণা, ‘পঞ্চভূত, ‘অপরাজিতা, ‘যজ্ঞফল’ ইত্যাদি নাটিকায়। নারীর মহিমময়ী মূর্তি ‘বন্দিতা, ‘উদ্ধার’ ইত্যাদি নাটকে ফুটে উঠেছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য, ধনতান্ত্রিক শক্তির শোষণ ও অত্যাচার, অসাধু উপায়ে ধন অর্জন প্রভৃতি বিষয় মন্মথ রায় রচিত পঞ্চাশ সালের পরবর্তী অধিকাংশ নাটকেই প্রতিফলিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নাম উল্লেখ করা হল,

যথা–'সূর্যমুখী, 'সাংঘাতিক লোক, 'মাসতুতো ভাইরা, 'সত্যমেব জয়তে, 'কষ্টিপাথর, 'বিবসনা, 'ভূতাহরণ করপোরেশন, 'শেষ সংবাদ' ইত্যাদি।

১৯৬১ সালে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মৃত্যুর পর নাট্য-আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতৃত্ব এসে পড়ে মন্মথ রায়ের উপরে। সরকারি কর্মের দায়িত্ব থেকে তখন তিনি মুক্ত। বড়ো সম্মেলনের সভাপতিত্ব, বড়ো সংগ্রামের নেতৃত্বের দায়িত্ব তাঁকেই গ্রহণ করতে হচ্ছে। গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের রাজ্য সম্মেলন স্মারক পত্রিকায় তিনি ১৯৮৫ সালের ১৭ এপ্রিল তারিখে যা বলেছিলেন তা বৈপ্লবিক চেতনার সঞ্চার করে। তিনি বললেন, ''লেখা ও রচনায় যাতে ধনতান্ত্রিক শ্বাস প্রশ্বাসে প্রাণবন্ত সংবিধান পরিবর্তিত হয়, গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রের অনুশাসনে।" অর্থাৎ এখানে সংবিধান পরিবর্তন করে গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রের অনুশাসন প্রবর্তন করার কথা বলেছেন।

উপরের আলোচনা ও নাট্যকারের নানা উক্তি থেকে মনে হতে পারে মন্মথ রায় বুঝি রাতারাতি কমিউনিস্ট হয়ে পড়েছিলেন। না, তিনি তা হননি। শুধু কয়েকটি বৈপ্লবিক কথা বললেই কেউ কমিউনিস্ট বলে স্বীকৃতি পান না। মার্কসবাদী রূপে স্বীকৃতি পেতে হলে ঐতিহাসিক শ্রেণিসংগ্রামে বিশ্বাস, ধনের উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে সম্মিলিত অধিকার চেতনা সহিংস সংগ্রাম-পদ্ধতি, অধ্যাত্মজীবন-বিরোধী বস্তুবাদী সমাজচেতনা প্রভৃতি থাকা দরকার। মার্কসবাদী মতবাদ ও কর্মপদ্ধতির এসব লক্ষণ তাঁর মধ্যে ছিল না। তাঁর সমাজতন্ত্রবাদ উদার সর্বাত্মক মানবিকতার

নামান্তর। ভাববাদী দৃষ্টি দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন সকল মানুষের মুক্তি, সকল মানুষের কল্যাণ। তিনি চিরাচরিত সামাজিক মূল্যবোধ এবং ধর্ম ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন।

এমনিভাবে একজন নাট্যকার তাঁর সমসাময়িক সমস্যাকে উপজীব্য করে বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। দর্শকশ্রেণিকে উদ্দীপনামূলক লেখনী দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন। নাট্যকার মন্মথ রায় সমসাময়িক রাজনৈতিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজের প্রকৃত উন্নতি করতে হলে তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করতে হবে। সকলের মাঝে সম্পদের সমবণ্টনের দ্বারা সমাজের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব। ব্যক্তিগত জীবনদর্শন অভিজ্ঞতা ও অর্জিত প্রজ্ঞার মিশ্রণে নাট্যকার মন্মথ রায় উদার মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনদর্শন ছিল সবার প্রতি স্নেহপূর্ণ ও শ্রদ্ধাশীল মনোভাব। দীর্ঘদেহী, সদা হাস্যোজ্জ্বল মানুষটি মানসিকতার দিক দিয়েও এমনটাই ছিলেন। বিভিন্ন পেশা, ধর্মের মানুষ তাঁর কাছে গিয়েছেন প্রয়োজনের তাগিদে কিন্তু তাদের মধ্যে যে স্নেহের বন্ধন রচিত হয়েছিল তা বাস্তব প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পরেও সেই স্নেহের বন্ধন অটুট ছিল। তাঁর দীর্ঘ নব্বই বছরের কর্মমুখর জীবনে বহু সম্মাননা ও পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। তেমনি নানাবিধ দায়িত্বশীল পদও অলঙ্কৃত করেছেন। মন্মথ রায় ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠা ও আন্তরিকতার কারণে কর্মক্ষেত্রের প্রতিটি দিকে সাফল্যের স্পর্শ রেখেছেন এবং বাংলা নাট্যসাহিত্য ও নাট্যজগৎকে সমৃদ্ধ করেছেন।

সহায়ক গ্রন্থ : বাংলা

সনাতন গোস্বামী সম্পা. নাট্যকার মন্মথ রায় স্মরণ ও মনন; (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ নাট্য: ২০০৮)

শিব শর্মা সম্পা. প্রসঙ্গ নাট্যকার মন্মথ রায় ;(কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ নাট্য: ২০০২)

জয়তী ঘোষ	মন্মথ রায় জীবন ও সৃজন; (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০০)
মানসী কীর্তনীয়া সম্পা:	কারুভাষ : নাট্যকার মন্মথ রায় স্মরণে; (কলকাতা: নীলাচল,বিরাটী,২০১২)
রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক ;(কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১১)
অজিতকুমার ঘোষ	মন্মথ রায় ;(কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ নাট্য: ২০১১)
_____	নাট্যতত্ত্ব পরিচয়; (কলকাতা:জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬০)
_____	নাটকের কথা; (কলকাতা: সুপ্রকাশ প্রাইভেট, ১৯৫৯)
_____	নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ; (কলকাতা: দে'জ, ১৯৯১)
_____	নাটক ও নাট্যকার ; (কলকাতা: দে'জ, ২০০০)
_____	বাংলা নাটকের ইতিহাস ;(কলকাতা: দে'জ, ২০০৫)
_____	বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস; (কলকাতা:সাহিত্য লোক, ১৯৮৮)
সুনীল দত্ত	নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর, (কলকাতা: জাতীয় সাহিত্য পরিষদ,১৯৭২)
তারক সেনগুপ্ত	রবীন্দ্র নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাব; (ঢাকা: ম্যাগনাম ওপাস, ২০১০)
স্বপন মজুমদার	সাত দশকের থিয়েটার ও অন্যান্য; (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৮)
_____	রঙ্গালয়ের ত্রিশ বছর (কলকাতা:প্যাপিরাস,১৯৯৮)
আশুতোষ মুখোপাধ্যয়	আধুনিক বাংলা নাটকের পরীক্ষা ও নিরীক্ষা, (কলকাতা: উর্বী প্রকাশন, ১৯৯১)
অতুলচন্দ্র চক্রবতী	মন্মথ রায়ের জীবনী ও নাট্য সাধনা (কলকাতা: নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন,১৯৯৪)
রথীন চক্রবর্তী সম্পা:	পলিটিক্যাল থিয়েটার ; (কলকাতা: নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন,২০০৩)
_____	বাংলা পেশাদারি থিয়েটার একটি ইতিহাস (কলকাতা: নাট্যচিন্তা, ২০০৯)
সুরভি বন্দ্যোপাধ্যয়	গবেষণা প্রকরণ ও পদ্ধতি; (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯০)
জয়ন্ত গোস্বামী	সাহিত্য গবেষণা পদ্ধতি ও প্রয়োগ, (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৯)
জগমোহন মুখোপাধ্যায	গবেষণা পত্র:অনুসন্ধান ও রচনা; (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স,১৯৯২)
এন এইচ এম আবু বকর সম্পা:	দর্শন গবেষণা পদ্ধতি, (ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ২০১১)
বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়	সাহিত্য বিচার: তত্ত্ব ও প্রয়োগ; (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৯)
দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়	নাট্যতত্ত্ব পরিচয় ;(কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী,১৯৮৪)
_____	নাট্যতত্ত্ব বিচার ;(কলকাতা: প্রমা প্রকাশনী,১৩৮৮)
পবিত্র সরকার	নাট্যমঞ্চ ও নাট্যরূপ (কলকাতা: প্রমা প্রকাশনী,১৩৮৮)
_____	নাটকের সন্ধানে(কলকাতা: প্রতিভাস,২০০৮)

Dhaka University Institutional Repository

সাধন কুমার ভট্টাচার্য	নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার (কলকাতা: বামা পুস্তকালয়,২০০০)
_____	নাটক লেখার মূলসূত্র; (কলকাতা:দে'জ, ১৯৯০)
_____	নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা (কলকাতা:করুণা, ২০০২)
_____	নাট্য প্রযোজনা ও পরিচালনা (কলকাতা:দে'জ, ১৯৮১)
_____	নাটকের রূপরীতি ও প্রয়োগ (কলকাতা:দে'জ, ১৯৬৪)
সুবীর রায় চৌধুরী সম্পা:	বিলিতি যাত্রা থেকে বিদেশী থিয়েটার (কলকাতা: দে'জ,১৯৭২)
আশুতোষ ভট্টাচার্য	বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (কলকাতা: এ মুখার্জী এ্যান্ড কো:,২০০২)
দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যয়	নাট্য চিন্তা (কলকাতা:ইম্প্রেশন সিন্ডিকেট,১৯৭৮)
প্রমথ নাথ বিশী	রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ (কলকাতা:ওরিয়েন্ট বুক কো:,১৯৬৬)
মনোমোহন ঘোষ সম্পা:	প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়,১৩৫২)
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর (কলকাতা: গ্রন্থণ, ১৯৭২)
আশুতোষ ভট্টাচার্য	শতবর্ষের নাট্যশালা (কলকাতা: জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৩)
সরোজমোহন মিত্র	একাঙ্ক নাটকের রূপরেখা(কলকাতা:পুস্তক বিপণি, ১৩৯১)
প্রদ্যোত সেনগুপ্ত	বাংলা নাটক, নাট্যতত্ত্ব ও রঙ্গমঞ্চ প্রসঙ্গ (কলকাতা: বর্ণালী, ১৯৯৭)
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা:	পুরাতন বাংলা নাটক;(কলকাতা: সাহিত্য লোক,১৯৯২)
শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী	নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা, (কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশিং, ১৯৭৪)
স্বাতী লাহিড়ী	গ্রুপ থিয়েটারের উৎস সন্ধানে, (কলকাতা: জাতীয় সাহিত্য পরিষদ,১৯৯৫)
সুধী প্রধান	গণ-নব-সৎ-নাট্যগোষ্ঠী-কথা, (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯২)
অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়	নাট্য সংলাপ : মঞ্চ ও পরিপ্রেক্ষিত, (কলকাতা: বুকস ওয়ে,২০০৯)
তন্দ্রা চক্রবর্তী সম্পা:	কলকাতায় আমি ও আমার থিয়েটার ;(কলকাতা: নাট্যচিন্তা,১৯৮৮)
সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পা:	সংসদ বাংলা চরিতাভিধান (১ম ও ২য় খণ্ড),(কলকাতা,সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৬)
বাংলা বিশ্বকোষ (১ম, ২য়)	খান বাহাদুর আবদুল হাকিম (সম্পা:) নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭২
গ্রুপ থিয়েটার (ত্রৈমাসিক)	নৃপেন্দ্র সাহা সম্পা:
থিয়েটার (ত্রৈমাসিক)	রামেন্দ্র মজুমদার সম্পা:
রঙ্গপট (নাট্যপত্রিকা)	বার্ষিক নাট্যপত্র, ২০০৬ কলকাতা

গণনাট্য (চৌত্রিশ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা), শারদ ১৯৯৮ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর)

শূদ্রক (নাট্যপত্রিকা) দেবাশীষ মজুমদার সম্পা: শরৎ ১৪০৪, কলকাতা

বহুরূপী (নাট্যপত্রিকা) কুমার রায় সম্পা: সংখ্যা ৯৪, কলকাতা

স্যাস:৫(নাট্যপত্রিকা) সত্য ভাদুড়ি সম্পা: ১৯৮৮, কলকাতা

বহুরূপী (নাট্যপত্রিকা) কুমার রায় সম্পা: সংখ্যা ৫৯, কলকাতা

শূদ্রক (নাট্যপত্রিকা) দেবাশীষ মজুমদার সম্পা: শরৎ ১৪০১, কলকাতা

বহুরূপী (নাট্যপত্রিকা) কুমার রায় সম্পা: সংখ্যা ৯৭, কলকাতা

শূদ্রক (নাট্যপত্রিকা) দেবাশীষ মজুমদার সম্পা: শরৎ ১৪০৭, কলকাতা

বহুরূপী (নাট্যপত্রিকা) কুমার রায় সম্পা: সংখ্যা ৯১, কলকাতা

নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ৬ নৃপেন্দ্র সাহা (সম্পা:) সংখ্যা ৯৯, কলকাতা

সহায়ক গ্রন্থ: ইংরেজি

Bentley, Eric ***The Theory of Drama.*** **(New York: Brentano,1937)**

_____ ***The Playwright as Thinker (New York ;Reynal,1946)***

Dawson. S.W ***Drama And the Dramatic*** **(London.Methuen,1970*)***

Duckory, Bernard ***Dramatic Theory and Criticism*****(New York ;Granta,1977)**

Guhathakurta, P ***Bengali Drama: Its Origin and Development*** **(London:Routeledge, 2013)**

Lyman. S. M.& Scott. M.B ***Drama of Social Reality*** **(Oxford University Press,1975)**

Nicoll, Alardice ***An Introduction to Dramatic Theory*** **(New York: Brentano,1900)**

Schlegel, A W ***A Lectures on Dramatic Art and Literature*** **(New York: Kessinger,2004)**

Sen, Priyaranjan ***Western Influence in Bengali Literature (*****U S A: Univ. of Michi, 1966)**